আগামীর স্মার্ট স্বদেশ

তথ্য অধিদফতর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

আগামীর স্মার্ট স্বদেশ

ফিচার সংকলন

আগামীর স্মার্ট স্বদেশ

তথ্য অধিদফতর

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

আগামীর স্মার্ট স্বদেশ

প্রকাশকাল

নভেম্বর ২০২৩

স্বত্ব © তথ্য অধিদফতর

প্রধান সম্পাদক

মো. শাহেনুর মিয়া, প্রধান তথ্য অফিসার

সম্পাদক

পরীক্ষিৎ চৌধুরী, সিনিয়র তথ্য অফিসার

সম্পাদনা পরিষদ

এ এম ইমদাদুল ইসলাম, সিনিয়র তথ্য অফিসার
মুহম্মদ জসীম উদ্দিন
সেলিনা আক্তার
মো. শাহীন শিকদার

সম্পাদনা সহকারী

মো. জামিন মিয়া
এহতেশামুল মুলক
মো. মাহবুব সরকার
মো. রোকনুজ্জামান
মো. রেদোয়ান আল করিম

প্রচ্ছদ

মোমেন উদ্দীন খালেদ

ব্যবস্থাপনা সহযোগী

মো. শাহ আলম সরকার

গ্রাফিক্স

মো. কামরুজ্জামান

মুদ্রণ

মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ৬০০.০০ টাকা

Agamir Smart Swadesh

Published by Press Information Department (PID)
Ministry of Information and Broadcasting
Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000, Phone: 55100811, 55100242,
Email: piddhaka@gmail.com

Price: TK. 600.00

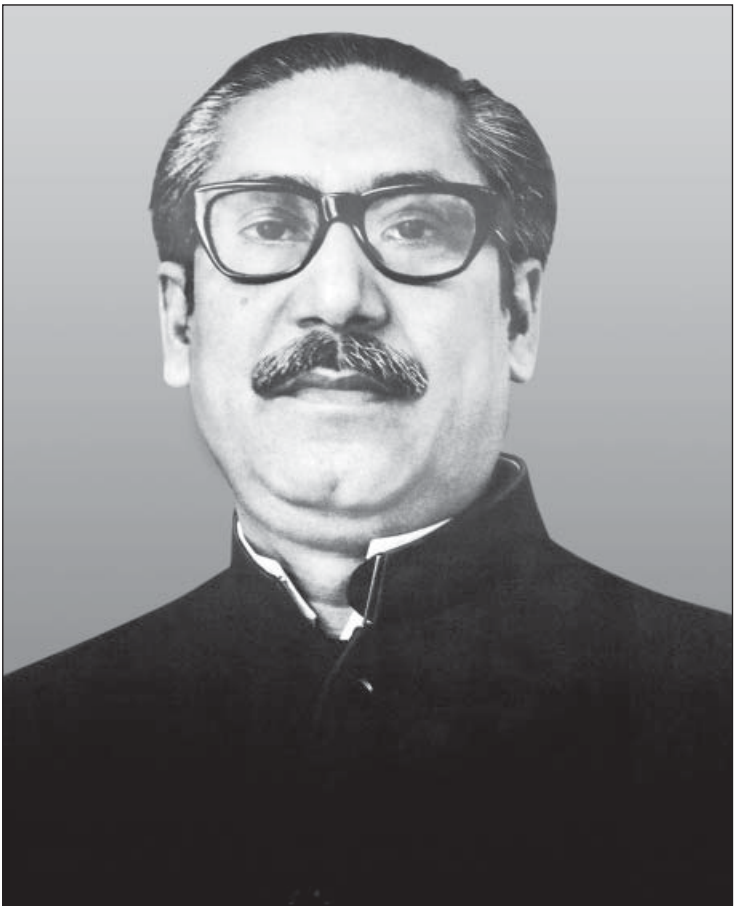

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ভূমিকা

এবছরের ২২ মে দোহায় কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত 'বাংলাদেশ: একটি উন্নয়ন মডেল: শেখ হাসিনার কাছ থেকে শেখা' শীর্ষক অধিবেশনে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'নেতৃত্বের উদাহরণ সৃষ্টি করুন এবং পরিবর্তনের কারিগর হোন। মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করুন, আপন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি মনোনিবেশ করুন এবং দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করুন। আপনার মাতৃচেতনাকে জাগ্রত করুন এবং নতুন ও ভবিষ্যৎকে আলিঙ্গন করুন।'

একথা অনস্বীকার্য, গত ১৫ বছর দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের উদাহরণ সৃষ্টি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশকে প্রস্তুত করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম অর্থনীতি। গত ১৫ বছরে দারিদ্র্যবিমোচন, খাদ্যনিরাপত্তা, বিনামূল্যে ও সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন, তৃণমূলে স্বাস্থ্যসেবা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, ডিজিটাল পরিষেবা, প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও জলবায়ু অভিযোজনে সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকারের সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। যা রূপকল্প-২০৪১-এর কৌশল বাস্তবায়নে গতির সঞ্চার করেছে।

সেই গতিপ্রবাহে বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল, বঙ্গবন্ধু টানেল, রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ সাম্প্রতিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন বদলে যাওয়া বাংলাদেশেরই ছবি। সে হিসেবে বলা যায় স্মার্ট বাংলাদেশ-এর যাত্রা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান প্রজন্ম তার সহযাত্রী। সেই অগ্রযাত্রার ফলস্বরূপ ২০৪১ সালের প্রজন্ম পাবে একটি সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ।

তার আগে জনগণ যাতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে অবদান রাখতে পারে, সেজন্য তাদেরকে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা এখন সরকারের লক্ষ্য। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সব ক্ষেত্রে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারে পারঙ্গমতা অর্জনই স্মার্ট বাংলাদেশের উদ্দেশ্য। তাই রূপকল্প-২০৪১ অনুযায়ী আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দক্ষতাভিত্তিক সমাজ গঠনে বাংলাদেশকে জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের হাত ধরে দেশকে এগিয়ে নিতে হলে বাংলাদেশকে প্রযুক্তি ব্যবহারে অনেক উন্নত হতে হবে এবং সেই উদ্যোগ সফল করতে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এ মুহূর্তে সবচেয়ে সময়োপযোগী এক কর্মপরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনার ছক এঁকে দিয়েছেন স্বয়ং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তাঁর তাত্ত্বিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকনোমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি-গড়ে তোলার মাধ্যমেই 'স্মার্ট বাংলাদেশ' রূপায়ণ করা সম্ভব। একটি জ্ঞান ভিত্তিক ও উদ্ভাবনী জাতি গড়ে তুলে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত করার বিশাল কর্মযজ্ঞের নাম স্মার্ট বাংলাদেশ।

আগামীর বাংলাদেশ হবে পরিবর্তনের বাংলাদেশ। যেখানে নতুন প্রজন্ম মূল্যবোধের জয়গান গাইতে পিছু হটবে না। দেশমাতৃকার চেতনাকে জাগ্রত রেখে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে নেতৃত্ব দিবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে জনগণের জন্য সবধরনের সেবা প্রক্রিয়াকে স্মার্ট করে তুলতে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

এবছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন পোর্টালে প্রকাশিত তথ্য অধিদফতরের ফিচারগুলোর মূলভাব স্মার্ট বাংলাদেশকে কেন্দ্র করেই। এগুলো থেকে বাছাই করা কিছু ফিচার নিয়ে এবারের সংকলন 'আগামীর স্মার্ট স্বদেশ'।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি এবং মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার মহোদয়ের পরামর্শ ও দিক নির্দেশনায় আমাদের এ প্রয়াস আলোর মুখ দেখেছে। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সকল বিশিষ্ট লেখককে, যাঁরা এই উদ্যোগকে সমৃদ্ধ ও সার্থক করেছেন। সম্পাদনা পরিষদসহ সংকলনটি প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সূচিপত্র

মুজিবনগরে স্বাধীনতার সূর্যোদয় ॥ ১৫
তোফায়েল আহমেদ

Shared Prosperity: A Vision for South Asia ॥ ২০
Dr. A K Abdul Momen, MP

গতিময় বাংলাদেশ ॥ ২৬
ড. আতিউর রহমান

বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ ॥ ৩৩
জাফর ওয়াজেদ

ডায়রিয়া : কারণ ও করণীয় ॥ ৩৯
ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ

বিকল্প ফসল উৎপাদন এনে দেবে সমৃদ্ধি ॥ ৪৫
শাহীন ইসলাম

স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য চাই স্মার্ট সিটিজেন ॥ ৪৯
জাহিদ ফারুক

Noise Pollution and its Probable Impacts on Public Health in Dhaka City ॥ ৫৩
Dr. Sharmeen Jahan

শিক্ষাব্যবস্থায় পরিকল্পিত উন্নয়ন ও গুণগত মান : সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ॥ ৫৮
মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

নিরাময় অযোগ্য রোগীদের জন্য প্যালিয়েটিভ কেয়ার ॥ ৬৩
অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ

নৌ অর্থনীতি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ॥ ৬৫
ড. মাধব চন্দ্র রায়

মানবাধিকার সুরক্ষা ও সমুন্নতকরণের পূর্বাপর : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ॥ ৬৯
ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি

Ensuring Public Access to Information ॥ ৭৮
Dr. Iman Ali

রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে জিআই পণ্যের ভূমিকা ॥ ৮০
মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ॥ ৮৩
ড. নাজনীন সিদ্দিকী

ভিশন-২০৪১ ॥ ৮৬
মোস্তফা মোর্শেদ

মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র ॥ ৮৯
অনুপম হায়াৎ

বিপন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছ চাষে সাফল্য ॥ ৯২
ড. রশিদ করিম

কিশোরী মায়ের স্বাস্থ্যঝুঁকি ও করণীয় ॥ ৯৫
সিরাজুম মুনিরা

জাগরণ এই ধাবমানকালে ॥ ৯৯
জাফর ওয়াজেদ

The Fourth Industrial Revolution and Our Actions ॥ ১০৩
Farhan Masuk

যে কারণে তিনি চিরস্মরণীয় ॥ ১০৭
মুহাম্মদ শামসুল হক

স্মার্ট এয়ারপোর্ট সার্ভিস ॥ ১১২
আবদুল মান্নান

বাংলাদেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেন? ॥ ১১৫
পরীক্ষিৎ চৌধুরী

গুজবসচেতন সন্তান চাই ॥ ১১৯
নাসরীন মুস্তাফা

একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ ॥ ১২৩
মাসুদ মনোয়ার

ভ্রমণে পছন্দের শীর্ষে রেলপথ ॥ ১২৬
মো. শরিফুল আলম

সবার মানবাধিকার রক্ষা করতে হবে ॥ ১৩০
ফারহানা সাত্তার

সুপার ফুড ॥ ১৩৩
নাফিসা শারমিন

Water Management in Delta Planning ॥ ১৩৬
Dr. Monirul Alam

Fuelling Innovation: The Rise of ICT Entrepreneurship in Bangladesh ॥ ১৩৯
A H M Masum Billah

তরুণদের হাত ধরেই স্মার্ট বাংলাদেশ ॥ ১৪২
ইমদাদ ইসলাম

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নারী উন্নয়নে রেশমশিল্পের অবদান ॥ ১৪৫
রাজীব আল মামুন

তৈরি পোশাক শিল্পে পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা ॥ ১৪৮
ফারুক রায়হান

স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নারীরা ॥ ১৫২
আফরোজা নাইচ রিমা

আকাশ কটাক্ষ নিয়ে ভাবনা ॥ ১৫৬
পরীক্ষিৎ চৌধুরী

Success of Cotton Cultivation in Poverty Alleviation ॥ ১৬০
Dr. Mahatab Kabir

খাজনা দেওয়া কত সহজ! ॥ ১৬৩
মুস্তাফা মাসুদ

Ensure Safe Food For All ॥ ১৬৬
Professor Tamanna Sarkar

পদ্মা সেতু ও রেল সড়কের দু'পাশে মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে 'সবুজ বলয়' ॥ ১৬৯
মোতাহার হোসেন

Corruption Must Be Stopped for Social Justice ॥ ১৭২
Sajal Mahmud

স্টেম : শিক্ষা ২০৪১-এর রূপকল্প উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণকে গতিশীল করবে ॥ ১৭৫
মো. রেজুয়ান খান

আশ্রয়ণ প্রকল্প কেন শেখ হাসিনার মেধাসম্পদ ॥ ১৭৮
মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

Nutrition Improvement with Zinc-Rich Rice in Bangladesh ॥ ১৮১
A H M Masum Billah

খাদ্য নিরাপত্তা : বাংলাদেশের প্রস্তুতি ॥ ১৮৩
কামাল হোসেন

ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের একমাত্র উপায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ॥ ১৮৭
রেজাউল করিম সিদ্দিকী

দারিদ্র্যমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়নে প্রযুক্তি ॥ ১৯০
ইমদাদ ইসলাম

বাল্যবিয়ে বন্ধে প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা ॥ ১৯৩
ফারিহা হোসেন

তাৎপর্যময় মার্চ মাস ॥ ১৯৬
মাহাফুজুর রহমান

কন্যাশিশুর অধিকার ॥ ১৯৯
গাজী শরীফা ইয়াছমিন

নদীদূষণ ॥ ২০২
কামরুন নাহার মুকুল

Bangladesh's Foreign Policy and Importance of FDI ॥ ২০৫
Dr. A K Abdul Momen

বিশ্ব শরণার্থী দিবস ও জলবায়ু শরণার্থী ॥ ২০৮
মো. জাহাঙ্গীর আলম

ক্যাশলেস যুগে বাংলাদেশ ॥ ২১২
এম জসীম উদ্দিন

'স্মার্ট বাংলাদেশ' হবে জ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র ॥ ২১৫
পাশা মোস্তফা কামাল

মুজিবনগরে স্বাধীনতার সূর্যোদয়

তোফায়েল আহমেদ

প্রতিবছর জাতীয় জীবনে 'মুজিবনগর দিবস' ফিরে আসে এবং এ বছর ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের ৫২তম বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। ১৭৫৭-এর ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে স্বাধীনতার যে সূর্য অস্তমিত হয়েছিল, মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১-এর ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগরের আম্রকাননে স্বাধীনতার সেই সূর্য উদিত হয়েছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের স্মৃতিকথা লিখতে বসে কত কথা আমার মানসপটে ভাসছে। পঁচিশে মার্চ দিনটির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। এদিন মণি ভাই এবং আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিই। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি বুকে টেনে আদর করে বলেছিলেন, 'ভালো থেকো। আমার দেশ স্বাধীন হবেই। তোমাদের যে নির্দেশ দিয়েছি, তা যথাযথভাবে পালন করো।'

পঁচিশে মার্চ রাতে আমরা ছিলাম মতিঝিলের আরামবাগে মণি ভাইয়ের বাসভবনে। রাত ১২টায়, অর্থাৎ জিরো আওয়ারে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্বপরিকল্পিত 'অপারেশন সার্চলাইট' নীলনকশা অনুযায়ী বাঙালি নিধনে গণহত্যা শুরু করে। চারদিকে প্রচণ্ড গোলাগুলি। এক রাতেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী লক্ষাধিক লোককে হত্যা করে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ছাব্বিশে মার্চ জাতির উদ্দেশে দেওয়া ইয়াহিয়া খানের ভাষণ শুনি। ভাষণে তিনি জাতির জনককে 'বিশ্বাসঘাতক' আখ্যায়িত করে বলেন, 'শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের আরো আগেই গ্রেফতার করা উচিত ছিল, আমি ভুল করেছি।' 'দিস টাইম হি উইল নট গো আনপানিস্‌ড।' তারপর কারফিউ জারি হয় এবং ছাব্বিশে মার্চেই চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত 'স্বাধীনতার ঘোষণা'র কথা বারবার প্রচার করে বলছেন, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'স্বাধীনতার ঘোষণা' প্রদান করে বলেছেন, 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারির মোকাবিলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে'।" এরপর দুই ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল হলে আমরা কেরানীগঞ্জে আমাদের সাবেক সংসদ সদস্য বোরহানউদ্দিন গগনের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করি। জাতীয় নেতা ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামান সাহেব; মণি ভাই, সিরাজ

ভাই, রাজ্জাক ভাই এবং (আমিসহ) স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধান্ত হলো মণি ভাই ও আমি, মনসুর আলী সাহেব এবং কামারুজ্জামান সাহেবকে নিয়ে ভারতের দিকে যাব। আমাদের এই যাত্রাপথ আগেই ঠিক করা ছিল। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে সিরাজগঞ্জের কাজিপুর থেকে নির্বাচিত এমসিএ (Member of Constituent Assembly) ডাক্তার আবু হেনাকে বঙ্গবন্ধু যে পথে কলকাতা পাঠিয়েছিলেন, সেই পথেই আবু হেনা আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের জন্য আগেই বাসস্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন। ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে ভুট্টো যখন টালবাহানা শুরু করেন তখন '৭১-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের বাসভবনে জাতির পিতা জাতীয় চার নেতার সামনে আমাদের এই ঠিকানা মুখস্থ করিয়েছিলেন, 'সানি ভিলা, ২১ নম্বর রাজেন্দ্র রোড, নর্দান পার্ক, ভবানীপুর, কলকাতা।' বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এখানে তোমরা থাকবে। তোমাদের জন্য সব ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।' ২৯ মার্চ কেরানীগঞ্জ থেকে দোহার-নবাবগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া হয়ে এপ্রিলের ৪ এপ্রিল আমরা ভারতের মাটি স্পর্শ করি এবং সানি ভিলায় আশ্রয় নিই। এখানে আমাদের সাথে দেখা করতে আসেন–পরে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী; জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমদ এবং ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম।

১০ এপ্রিল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নবনির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ গণপরিষদ' গঠন করে, মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলাকে 'মুজিবনগর' নামকরণ করে রাজধানী ঘোষণা করা হয় এবং জারি করা হয় 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' তথা 'Proclamation of Independence'। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাকে অনুমোদন করা হয়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আরো যা ঘোষিত হয় তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।' রাষ্ট্রপতিশাসিত এই ব্যবস্থায় 'ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা', 'একজন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রয়োজন মনে করিলে মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগের' ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত করার বিধান রাখা হয়। এ ছাড়া যেহেতু বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি, সেহেতু স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে এই মর্মে বিধান রাখা হয় যে, 'কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাজে যোগদান করিতে না পারেন অথবা তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অক্ষম হন, তবে রাষ্ট্রপ্রধান প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপরাষ্ট্রপ্রধান পালন করিবেন।' 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' মোতাবেক উপরাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন এবং জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় নেতা ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী অর্থমন্ত্রী, জাতীয় নেতা এ এইচ এম কামারুজ্জামান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করেন।

পরে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদের সভায় কর্নেল ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়। 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র'–এই সাংবিধানিক দলিলটির মহত্তর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা 'বাংলাদেশ গণপরিষদ' সদস্যগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম, 'আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ছাব্বিশে মার্চ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।' অর্থাৎ যেদিন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেছিলেন সেই দিন থেকে কার্যকর হবে। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অনুসারে প্রণীত 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' মোতাবেক স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ও সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগরে।

সে সময় তাজউদ্দীন ভাইয়ের সাথে সীমান্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেছি। একটি বিশেষ প্লেনে তাজউদ্দীন ভাই, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, মণি ভাই এবং আমি যখন শিলিগুড়ি পৌঁছাই, তখন ওখানে পূর্বাহ্নে ধারণকৃত তাজউদ্দীন ভাইয়ের বেতার ভাষণ শুনলাম। বাংলার মানুষ তখন মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে আপসহীন, এককাতারে দণ্ডায়মান। পরবর্তীতে ১৭ এপ্রিল যেদিন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণের তারিখ নির্ধারিত হয়, তার আগে ১৬ এপ্রিল গভীর রাতে মণি ভাই, সিরাজ ভাই, রাজ্জাক ভাই এবং (আমিসহ) আমরা মুজিব বাহিনীর চার প্রধান, একটা গাড়িতে করে রাত ৩টায় নবগঠিত সরকারের সফরসঙ্গী হিসেবে কলকাতা থেকে রওনা করি সীমান্ত সন্নিহিত মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলা তথা স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী মুজিবনগরের উদ্দেশে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে প্রবেশ করি প্রিয় মাতৃভূমির মুক্তাঞ্চল মেহেরপুরের আম্রকাননে। আমাদের সঙ্গে দেশি-বিদেশি অনেক সাংবাদিক ছিলেন। কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছিল। আশঙ্কা ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেখানে বোমা হামলা চালাতে পারে। মেহেরপুরসহ আশপাশের এলাকা থেকে প্রচুর লোকসমাগম হয়েছিল। মুহুর্মুহু 'জয় বাংলা' রণধ্বনিতে আকাশ-বাতাস তখন মুখরিত। আন্তর্জাতিক বিশ্ব বিস্ময়ের সাথে প্রত্যক্ষ করছিল নবীন এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব। দিনটি ছিল শনিবার। সকাল ১১টা ১০ মিনিটে পশ্চিম দিক থেকে শীর্ষ নেতৃবৃন্দ দৃপ্ত পদক্ষেপে মঞ্চের দিকে এলেন। দেশ স্বাধীন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সমবেত সংগ্রামী জনতা গগনবিদারী স্বরে 'জয় বাংলা' জয়ধ্বনি দিল। মুজিবনগরে শপথ অনুষ্ঠানস্থলে একটি ছোট্ট মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছিল। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রথমে মঞ্চে আরোহণ করেন। ঝিনাইদহের এসডিপিও মাহবুবউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সশস্ত্র দল রাষ্ট্রপ্রধানকে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করেন। এরপর মঞ্চে আসেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দ এবং প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী। উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবকগণ পুষ্পবৃষ্টি নিক্ষেপ করে নেতৃবৃন্দকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সরকারের মুখপত্র 'জয় বাংলা' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি আবদুল মান্নান, এমসিএর উপস্থাপনায় শপথ অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রথমেই নতুন রাষ্ট্রের

ঐতিহাসিক দলিল 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' পাঠ করেন চিফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়।

আকাশে তখন থোকা থোকা মেঘ। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে বাংলা মায়ের চারজন বীরসন্তান প্রাণ ঢেলে গাইলেন জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। উপস্থিত সকলেই তাঁদের সাথে কণ্ঠ মিলালাম। অপূর্ব এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তখন। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম ইংরেজিতে প্রদত্ত ভাষণের শুরুতে বলেন, 'ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমি তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেছি এবং তাঁর পরামর্শক্রমে আরো তিনজনকে মন্ত্রিরূপে নিয়োগ করেছি।' এরপর তিনি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দকে পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর ঘোষণা করেন প্রধান সেনাপতি পদে কর্নেল ওসমানী এবং সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ পদে কর্নেল আবদুর রবের নাম। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর আবেগময় ভাষণের শেষে দৃপ্তকণ্ঠে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, 'আমাদের রাষ্ট্রপতি জনগণনন্দিত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ নির্যাতিত মানুষের মূর্ত প্রতীক শেখ মুজিব বাংলার মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে আজ বন্দি। তাঁর নেতৃত্বে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়ী হবেই।' প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর তাজউদ্দীন আহমদ অভূতপূর্ব ও অবিস্মরণীয় বক্তৃতায় বলেন, 'পাকিস্তান আজ মৃত এবং অসংখ্য আদম সন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে। পূর্বপরিকল্পিত গণহত্যায় মত্ত হয়ে ওঠার আগে ইয়াহিয়ার ভাবা উচিত ছিল তিনি নিজেই পাকিস্তানের কবর রচনা করছেন।' মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বক্তৃতার শেষে তিনি বলেন, 'আমাদের এই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে আমরা কামনা করি বিশ্বের প্রতিটি ছোট-বড় জাতির বন্ধুত্ব।' 'বিশ্ববাসীর কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম। বিশ্বের আর কোনো জাতি আমাদের চেয়ে স্বীকৃতির বেশি দাবিদার হতে পারে না। কেননা, আর কোনো জাতি আমাদের চেয়ে কঠোরতর সংগ্রাম করেনি, অধিকতর সংগ্রাম করেনি। জয় বাংলা।' ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী উভয়েই তৎকালীন বাস্তবতায় যা বলার প্রয়োজন ছিল তা-ই তাঁরা বলেছেন। আমাদের শীর্ষ দুই নেতার এই দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ ছিল ঐতিহাসিক এবং অনন্য। জাতীয় নেতৃবৃন্দ, নির্বাচিত এমসিএ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিকগণ, পাবনার জেলা প্রশাসক জনাব নুরুল কাদের খান, মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক জনাব তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরীসহ আরো অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিনিধিদের ইচ্ছার শতভাগ প্রতিফলন ঘটিয়ে রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে, সাংবিধানিক বৈধতা অর্জন করে সেদিন রাষ্ট্র ও সরকার গঠিত হয়েছিল। আর এসব কিছুর বৈধ ভিত্তি ছিল

বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত 'স্বাধীনতার ঘোষণা'। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে তথা '৭১-এর এপ্রিলের ১০ ও ১৭ তারিখে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সরকারের শপথ অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রধানতম লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় সাংবিধানিক বৈধতা নিশ্চিত করে সমগ্র বিশ্বের সমর্থন নিয়ে জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করে সুমহান বিজয় ছিনিয়ে আনা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেরাদুনে মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্পে শপথের সময় আমরা সমস্বরে বলতাম, 'বঙ্গবন্ধু মুজিব, তুমি কোথায় আছ, কেমন আছ আমরা জানি না। কিন্তু যত দিন আমরা প্রিয় মাতৃভূমি এবং তোমাকে মুক্ত করতে না পারব, তত দিন আমরা মায়ের কোলে ফিরে যাব না।' মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী দিনগুলোতে বাঙালির চেতনায় বন্দি মুজিব মুক্ত মুজিবের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিলেন। যারা ষড়যন্ত্রকারী তাদের হোতা খুনি মুশতাক তখনই আমাদের কাছে প্রশ্ন তুলেছিল, 'জীবিত মুজিবকে চাও, না স্বাধীনতা চাও।' আমরা বলতাম, 'আমরা দুটোই চাই। স্বাধীনতাও চাই, বঙ্গবন্ধুকেও চাই।' ত্রিশ লক্ষ প্রাণ আর দুই লক্ষ মা-বোনের সুমহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলার স্বাধীনতা এবং বঙ্গবন্ধু মুজিবকে মুক্ত করতে পেরেছিলাম।

প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের এই মহান দিনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানের অমর স্মৃতি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। জাতীয় চার নেতা জীবনে-মরণে বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকেছেন। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে থেকেছেন, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন, কিন্তু বেঈমানি করেননি। ইতিহাসের পাতায় তাঁদের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য তাঁরা যে আত্মদান করেছেন সেই আত্মদানের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে জাতীয় নেতৃবৃন্দের বীরত্বপূর্ণ অবদানের কথা সর্বত্র স্মরণ করা উচিত। জাতীয় ইতিহাসের গৌরবময় দিনগুলো স্মরণ করে জাতীয় মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধিই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

লেখক : আওয়ামী লীগ নেতা, মাননীয় সংসদ সদস্য, সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

Shared Prosperity: A Vision for South Asia

Dr. A K Abdul Momen, MP

It cannot begin without recalling our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who provided our foreign policy dictum "Friendship to all, Malice towards None" which he later focused more on promoting relations with neighbours first. His able daughter Honourable Prime Minister Sheikh Hasina aptly picked up the philosophy and extended it and went for its implementation.

The vision of shared prosperity becomes more relevant when we compare the development trajectory of South Asian countries. Indeed, we have made substantial progress. Some South Asian countries have already graduated to middle income status while others are making their way. Yet, poverty is still high in the region.

One predominant characteristic is that our economies display greater interest in integrating with the global economy than with each other. Regional cooperation within the existing frameworks has made only limited progress being hostage to political and security considerations. The problems have their roots in the historical baggage as well as the existing disparity in the regional structure. In addition, there are a number of outstanding issues and bilateral discords. All these realities have left us a message that for survival, we need closer collaboration among neighbours setting aside our differences; we must have concerted efforts through sharing of experiences and learning from each other. In this backdrop, Bangladesh has been following a policy of shared prosperity as a vision for the friendly neighbours of South Asia. Guided by Prime Minister Sheikh Hasina, we are advocating for inclusive development in the region. Our development trajectory and ideological stance dove tail our vision of shared prosperity for South Asia.

In Bangladesh, human development is the pillar of sustainable development. Our Father of the Nation in his maiden speech at the UNGA in 1974 said, "There is an international responsibility ... to ensuring everyone the right to a standard living adequate for the health and the well-being of himself and his family." This vision remains relevant even today. In that spirit, we are pursuing inclusive and people-centric development in association with regional and global efforts.

In the last decade, we have achieved rapid economic growth ensuring social justice for all. Today, Bangladesh is acknowledged as one of the fastest growing economies in the world. We have reduced poverty from 41.5% to 20% in the last 14 years. Our per capita income has tripled in just a decade. Bangladesh has fulfilled all criterions for graduating from LDC to a developing country. Bangladesh is ranked as world's 5th best COVID resilient country, and South Asia's best performer. Last year, we inaugurated the self-funded 'Padma Multi-purpose Bridge'. A few days ago, we started the first ever Metro Rail service in our capital. Soon, we shall complete the 3.2 kilometer Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Tunnel under the river Karnaphuli in Chattogram, the first in South Asia. Several other mega-projects are in the pipeline which will bring about significant economic upliftment. Our aspiration is to transform Bangladesh into a knowledge-based 'Smart Bangladesh' by 2041 and a prosperous and climate-resilient delta by 2100. We hope to attain these goals by way of ensuring women empowerment, sustainable economic growth and creating opportunities for all.

The priorities of our Government are; First, provide food, Second, provide cloths, Third, shelter and accommodation to all and no one should be left behind, Fourth, Education and Fifth, Healthcare to all. To achieve these goals, our Prime Minister promoted vehicles like Digital Bangladesh, innovation, foreign entrepreneurs and private initiatives in an atmosphere of regional peace, stability and security, and through connectivity. Bangladesh has become a hub of connectivity and looking forward to become a 'Smart Bangladesh'.

When it comes to foreign policy, we have been pursuing neighbourhood diplomacy for amiable political relations with the South Asian neighbours alongside conducting a balancing act on strategic issues based on the philosophy of 'shared prosperity'.

Bangladesh, within its limited resources, is always ready to stand by its neighbours in times of emergency-be it natural calamity, or pandemic or economic crisis. We despatched essential medicines, medical equipment and technical assistance to the Maldives, Nepal, Bhutan and India during the peak period of Covid-19 pandemic. We had readily extended humanitarian assistance to Nepal when they faced the deadly earthquake back in 2015. Last year, we helped the earthquake victims of Afghanistan. Prior to that, we contributed to the fund raised by the United Nations for the people of Afghanistan. Our assistance for the people of Sri Lanka

with emergency medicines during the moment of crisis last year or the currency SWAP arrangement is the reflection of our commitment to our philosophy. These symbolic gestures were not about our capacity, pride or mere demonstration, rather it was purely about our sense of obligation to our neighbours. We strongly believe that shared prosperity comes with shared responsibility and development in a single country of a particular region may not sustain if others are not taken along.

In addition, we have resolved most of our critical issues with our neighbours peacefully through dialogue and discussion. For example, we have resolved our border demarcation problem with India, our maritime boundary with India and Myanmar, and also our water sharing with India peacefully.

For an emerging region like South Asia, we need to devise certain policies and implement those in a sustainable manner. I would like to share some of my thoughts which could be explored in quest for our shared prosperity and inclusive development:

First of all, without regional peace and stability we would not be able to grow as aspired for. To that effect, our leaders in the region have to work closely on priority basis. We may have issues between neighbours but we have to transcend that to leave a legacy of harmony for our future generation so that a culture of peace and stability prevails in the region. We can vouch for it from our own experience. In Bangladesh, we are sheltering 1.1 million forcibly displaced Myanmar nationals. If remains unresolved, it has the potential to jeopardise the entire security architecture of South Asia. So, here the neighbourhood should support us for their own interests.

Second, we need to revitalize our regional platforms and properly implement our initiatives taken under BIMSTEC and IORA. We are happy that BIMSTEC is progressing better, but we should endeavour to make it move always like a rolling machine.

Third, we need to focus on regional trade and investment. Countries in South Asia had implemented trade liberalization within the framework of SAFTA but in a limited scale. Bangladesh is in the process of concluding Preferential Trade Agreement/Free Trade Agreement with several of its South Asian peers. We have already concluded PTA with Bhutan; are at an advanced stage of negotiations for PTA with Sri Lanka and discussions for PTA with Nepal are on. In the same spirit, Bangladesh

is about to start negotiations on Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) with India.

Fourth, a well-connected region brings immense economic benefits and leads to greater regional integration. To maximize our intra- and extra-regional trade potentials and enhance people-to-people contacts, Bangladesh is committed to regional and sub regional connectivity initiatives. Bangladesh's geostrategic location is a big leverage which was rightly picked up by our Prime Minister. She benevolently offered connectivity in the form of transit and trans-shipment to our friendly neighbours for sustainable growth and collective prosperity of the region. As for Sri Lanka, if we can establish better shipping connectivity which our two countries are working on, the overall regional connectivity would be more robust.

Fifth, we live in a globalized world, highly interconnected and interdependent. Our region has gone through similar experience and history. Bangladesh believes and promotes religious harmony. We have been promoting 'Culture of Peace' across nations. The basic element of 'Culture of Peace' is to inculcate a mindset of tolerance, a mind set of respect towards others, irrespective of religion, ethnicity, colour, background or race. If we can develop such mindset by stopping venom of hatred towards others, we can hope to have sustainable peace and stability across nations, leading to end of violence, wars, and terrorism in nations and regions. There won't be millions of refugees or persecuted Rohingyas. Bangladesh takes special pride in it as even before Renaissance was started in Europe in the 17th century, even before America was discovered in 1492, in Bengal a campaign was started by Chandi Das as early as 1408 that says 'humanity is above all,' and we still try to promote it.

Sixth, we have to look beyond a traditional approach of development and challenges and revisit the non-traditional global crises of the recent time. We are experiencing food, fuel, fertilizer and energy shortages due to global politics and disruption of supply chain; as littoral and island countries we face similar challenges of natural disasters; we have vast maritime area which needs effective maritime governance; we need to curb marine pollution and ensure responsible use of marine resources. Our collective, sincere and bold efforts are required to minimize the impacts of climate change as well. In this context, I would like to share Bangladesh's understanding and position.

Ocean Governance:

Blue Economy: Bangladesh is an avid proponent of Blue Economy and responsible use of marine resources for the benefit of the entire region. We are keen to utilize the full potential of our marine resources and have developed an integrated maritime policy drawing on the inter-linkages between the different domains and functions of our seas, oceans and coastal areas. Bangladesh also values the importance of sound science, innovative management, effective enforcement, meaningful partnerships, and robust public participation as essential elements of Blue Economy. At this stage, we need support, technical expertise and investment for sustainable exploration and exploitation of marine resources. As the past and present chairs of IORA, Bangladesh and Sri Lanka should find out ways of bilateral collaboration particularly in Blue Economy in the Bay of Bengal.

- **Controlling of Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing:** IUU fishing in the maritime territory of Bangladesh needs to be monitored and controlled. Our present capability of marine law enforcement in this regard is limited. Here regional collaboration would be very useful.
- **Marine Pollution:** Marine pollution is a major concern for all littoral countries. Micro-plastic contamination poses serious threat to marine eco system. Responsible tourism and appropriate legal framework underpinned by regional collaboration would greatly help.

Climate Change and Climate Security in the Bay of Bengal: We have taken a whole-of-government and whole-of-society approach to make the country climate-resilient. Our Climate Change Strategy and Action Plan were formulated in 2009. Bangladesh has pioneered in establishing a climate fund entirely from our own resources in 2009. Nearly $443 million has been allocated to this fund since then. Moreover, we are going to implement the 'Mujib Climate Prosperity Plan' to achieve low carbon economic growth for optimised prosperity and partnership. Green growth, resilient infrastructure and renewable energy are key pillars of this prosperity plan. This is a paradigm shift from vulnerability to resilience and now from resilience to prosperity. As the immediate past Chair of the Climate Vulnerable Forum, we had promoted the interests of the climate vulnerable countries including Sri Lanka in the international

platforms. Bangladesh is globally acclaimed for its remarkable success in climate adaptation, in particular in locally-led adaptation efforts. The Global Center on Adaptation (GCA) South Asia regional office in Dhaka is disseminating local based innovative adaptation strategies to other climate vulnerable countries. To rehabilitate the climate displaced people, we have undertaken one of the world's largest housing projects which can shelter 4,500 climate displaced families. Under the "Ashrayan" project, a landmark initiative for the landless and homeless people, 450,000 families have been provided with houses. Keeping disaster resilience in mind, the project focuses on mitigation through afforestation, rainwater harvesting, solar home systems and improved cook stoves. In addition, the government has implemented river-bank protection, river excavation and dredging, building of embankment, excavation of irrigation canals and drainage canals in last 10 years at a massive scale. We feel, our national efforts need to be complemented by regional assistance.

As the chair of CVF and as a climate vulnerable country, our priority is to save this planet earth for our future generations. In order to save it, we need all countries, especially those that are major polluters, to come up with aggressive NDCs, so that global temperature remains below 1.5 degree Celsius, they should allocate more funds to climate change, they should share the burden of rehabilitation of 'climate migrants' that are uprooted from their sweet homes and traditional jobs due to erratic climatic changes, river erosion and additional salinity. We are happy that "loss and damage" has been introduced in COP-27.

Seventh, South Asia needs a collective voice in the international forum for optimizing their own interests.

Finally, and most importantly, South Asian leaders need similar political will for a better and prosperous region. We hope that Bangladesh and its neighbours in South Asia would be able to tap the potentials of each other's complementarities to further consolidate our relations to rise and shine as a region. May I conclude by reminding ourselves what a Bengali poet has said, 'Don't be afraid of the cloud, sunshine is sure to follow.'

Writer : Hon'ble Perliament Member and Foreign Minister of Bangladesh

গতিময় বাংলাদেশ

ড. আতিউর রহমান

নানা সংকট মোকাবিলা করে করেই এগিয়ে চলেছে গতিময় বাংলাদেশ। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আর্থ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ উতরে বাংলাদেশের এই সাহসী অভিযাত্রা নিঃসন্দেহে আশাজাগানিয়া। প্রথমে করোনা, আর তারপর সেই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই বিশ্ব অর্থনীতি আরো বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে। বিশ্বায়িত ব্যবস্থার কারণে বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশও যে এই সংকটের প্রভাব বলয়ের মধ্যে পড়েছে, তা সবার জানা। একই সঙ্গে এটাও সবার জানা এক যুগের বেশি সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে কল্যাণমুখী ও প্রবৃদ্ধি-সহায়ক নীতি গ্রহণের কারণে বাংলাদেশ করোনা সংকট মোকাবিলায় যেমন ভালো করেছে, একইভাবে চলমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রেও অন্য অধিকাংশ দেশের তুলনায় বেশ ভালো করছে। সাম্প্রতিক সংবাদে দেখা যাচ্ছে, চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম মাসে বাংলাদেশ প্রায় চার বিলিয়ন ডলারের সমমানের পণ্য ও সেবা রপ্তানি করেছে। অর্থাৎ এই ধারা ধরে রাখা গেলে বার্ষিক ৫৮ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। উল্লেখ্য, গত নভেম্বরে তা পাঁচ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। বিনিময় হার নমনীয় করায় এই সম্ভাবনা আরো বেড়ে গেছে। তবে রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ধারাটি যেকোনো মূল্যে অব্যাহত রাখতে হবে। একই রকম আশাব্যঞ্জক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রেও। জুলাই মাসের হিসাব বলছে, আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় এবারে ১২ শতাংশের বেশি প্রবাসী আয় দেশে ঢুকেছে। এরপর মাস দুয়েক প্রবৃদ্ধি স্লথ থাকলেও ডিসেম্বরে তা দুই বিলিয়ন ডলারের আশপাশেই থেকেছে। আশা করা যায়, প্রবাসী আয়ের এই ধারা অব্যাহত থাকবে। চলমান বৈশ্বিক সংকটকালে ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাই যখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সে সময় এ খবরগুলো নিশ্চয়ই আশাব্যঞ্জক। ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় আমাদের নীতিনির্ধারকদের আগের যে বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে তার ভিত্তিতে এবারে একেবারে শুরু থেকেই তাঁরা নানামুখী পদক্ষেপ নিয়ে আমাদের অর্থনীতির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন, আমদানি নিয়ন্ত্রণ, কম অগ্রাধিকারের ব্যয় কাটছাঁট করা–এমন নানামুখী উদ্যোগ তাঁরা নিয়েছেন। এর সুফল হিসেবেই আমরা অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে স্থিতিশীলতা দেখতে পাচ্ছি। অযথা আশঙ্কা ছড়ানোর ফলে মাঝখানে জনমনে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দেওয়ায় অনেকেই সঞ্চয় ভেঙে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন শুরু করেছিলেন। আস্থা ফেরাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু সময়োচিত পদক্ষেপ আমরা দেখেছি। আর তাই ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ এই প্রবণতায় ভাটা পড়েছে। এ কারণে ২০ ডিসেম্বর ২০২২–এই এক দিনেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে ফিরেছে ৯৩১ কোটি টাকা। তাই বিশ্বব্যাংকসহ অন্য উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আগে যেমনটি আশা

করেছিল, তা থেকে হয়তো কিছুটা কম হলেও আমাদের প্রবৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশের কম হবে না বলে সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। এই হার বিশ্বের অধিকাংশ দেশের তুলনায় অনেকখানি বেশি। এখন প্রবৃদ্ধি নিয়ে অতিরিক্ত মাথা না ঘামিয়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করাই বেশি দরকারি। সে বিচারে প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের ওপরে রাখতে পারাটিই হবে বড় অর্জন।

এটা আসলেই স্পষ্ট যে বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে বলেই একের পর এক বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেও এ দেশের অর্থনীতি সম্ভাবনাময় পথপরিক্রমা অব্যাহত রাখতে পারছে। এই প্রক্রিয়ার পেছনের শক্তির জায়গাগুলো বোঝা যেমন জরুরি, একইভাবে এর ফলস্বরূপ আগামী দুটি দশকে বাংলাদেশের জন্য যেসব সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, সেগুলোও অনুধাবন করা একই রকম দরকারি। মোটা দাগে বাংলাদেশের অর্থনীতির এই আশাসঞ্চারী পথপরিক্রমাকে আমরা দুটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। প্রথম পর্যায়টির শুরু ২০০৮-০৯ থেকে। ওই সময় আমরা সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি ও ভিশন এবং এগুলোর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন (বলা যায় 'প্যারাডাইম শিফট') লক্ষ করতে পারি। গতানুগতিক উন্নয়ন ভাবনা এবং পরনির্ভর প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক নীতি কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে ওই সময়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে যতটা সম্ভব কল্যাণমুখী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করাকে কেন্দ্রীয় নীতি বিবেচনার জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে। 'দিনবদলের সনদ' শিরোনামে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের যে রূপরেখা সে সময়টায় দেওয়া হয়েছিল তারই সুফল আমরা এখন বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি। একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং নিজস্ব উৎপাদন সম্ভাবনার মধ্যকার পরিপূরক সম্পর্কটির ওপর জোর দিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার পথনকশা দাঁড় করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে কৃষি, এমএসএমই, প্রবাসী আয় এবং রপ্তানিমুখী শিল্প–এই খাতগুলোর বিষয়ে নতুন করে ভাবা হয়েছে। ফলে কৃষির নতুন ধারার বিকাশের কারণে একদিকে কৃষিনির্ভর পরিবারগুলোর আয় বেড়েছে, অন্যদিকে বাড়ন্ত আয় তাদের ভোগে ইতিবাচক প্রভাব ফেলায় অভ্যন্তরীণ চাহিদা আরো বলশালী হয়েছে। বাড়ন্ত ও বহুমুখী আধুনিক কৃষি দেশের বর্ধিষ্ণু এমএসএমই এবং শিল্প খাতের জন্য উপকরণ এবং চাহিদা দুই-ই নিশ্চিত করেছে। মূলত দেশজ চাহিদার ওপর ভর করে বাড়তে থাকা এমএসএমই খাত কর্মসংস্থানে রেখেছে ব্যাপক ইতিবাচক ভূমিকা। কভিডকালে এই খাত বড় ধাক্কা খেয়েছিল; কিন্তু সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজ এবং পরিশ্রমী ছোটখাটো উদ্যোক্তাদের লেগে থাকার প্রচেষ্টা এই খাতকে ফের ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্বে ব্যাংকিং খাতও এসব উদ্যোক্তাকে অর্থ ও সাহস–দুইই জুগিয়েছে। অন্যদিকে রপ্তানিমুখী শিল্পগুলো তুলনামূলক তরুণ এবং সস্তা শ্রমশক্তির জোরে বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতা বাড়ার পরও আগের তুলনায় ভালোই করেছে। আর বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির চাহিদা মেটাতে আমদানি বাবদ ব্যাপক খরচ করতে হলেও প্রবাসী আয়ের প্রবাহ তা ব্যালেন্স করতে সহায়তা করেছে। নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক সংকটগুলোর কারণে এই ভারসাম্য কিছুটা

বিঘ্নিত হয়েছে। তবে আগেই যেমনটি বলেছি, সংকট শুরুর অনেক আগে থেকেই এই নতুন ধারার সামাষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে এগোনোয় একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করা গেছে। তাই সংকটও সামাল দেওয়া গেছে তুলনামূলক ভালোভাবেই। ধীরে হলেও বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনর্জাগরণের পথেই আছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির নব পথপরিক্রমার প্রথম পর্যায়ের সুফল তো খালি চোখেই দৃশ্যমান। এখনো বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। গত এক যুগের বেশি সময়ে গ্রামাঞ্চলের জীবনমানে নাটকীয় পরিবর্তন আমরা লক্ষ করেছি। দারিদ্র্যের হার আগের তুলনায় চার ভাগের এক ভাগে নামিয়ে আনা গিয়েছে (২০ শতাংশের আশপাশে)। কৃষি উৎপাদন বহুগুণে বেড়েছে। কৃষি শ্রমিকের মজুরি বেড়েছে পাঁচ থেকে দশ গুণ। বিদ্যুৎ সংযোগ, মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বেড়েছে আশাতীত হারে। ফলে গ্রামীণ জীবনমান বেড়েছে ঈর্ষণীয় মাত্রায়। আইসিটি ডিভিশন এবং কর্মসংস্থান ব্যাংক ও আনসার-ভিডিপি ব্যাংকগুলোর মতো উন্নয়নমুখী ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে নানাভাবে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্টার্ট-আপগুলোকে যে সহায়তা দিচ্ছে তার ফলে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে এবং তারা অন্য অনেকের জন্য কাজের ব্যবস্থা করছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের যে উদ্যোগগুলো নিচ্ছে সেগুলোও আলাদা করে উল্লেখ করার মতো। সর্বোপরি কৃষির বাইরে তবে সংশ্লিষ্ট অ-কৃষি খাতে গ্রামাঞ্চলেও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। গ্রামীণ আয়ের বড় অংশটিই এখন আসছে এই অ-কৃষি খাত থেকে। এই খাতের সাথে কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্প এবং অন্যান্য শিল্পের পণ্য বিকিকিনির গভীর সম্পর্ক লক্ষ করার মতো। সড়ক, সেতু এবং রেলের সংযোগ বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের প্রায় সব গ্রাম এখন নগরের সাথে যুক্ত হতে পেরেছে। একই সঙ্গে মানুষের নিজেদের উদ্যোগ, সামাজিক পুঁজির প্রয়োগ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্রিয়তার কথাও ভুললে চলবে না। রাষ্ট্র এদের বিকাশে বরাবরই সহায়ক থেকেছে। অংশগ্রহণমূলক কাজে তাদের সুযোগ করে দিয়েছে। ব্যক্তি খাতও কিন্তু পিছিয়ে নেই। গ্রামেও এখন সেবা খাতের তৎপরতা প্রায় সমান দৃশ্যমান। চায়ের দোকান, কফিশপ, রেস্তোরাঁ, সেলুন, বিউটি পার্লার, কিন্ডারগার্টেন স্কুল, কোচিং সেন্টার, হেলথ ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সাইবার ক্যাফের উপস্থিতি এখন গ্রামাঞ্চলেও খুব স্বাভাবিক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ কমেছে ঠিকই; তবে প্রযুক্তির কল্যাণে কৃষির উৎপাদনশীলতাও বেড়েছে। তা ছাড়া সেবা খাতের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে অ-কৃষি কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তা সামাল দেওয়া গেছে ভালোভাবেই। পরিসংখ্যান বলছে, এখন গ্রামীণ আয়ের ৬০ শতাংশ আসে অ-কৃষি খাত থেকে। নানামাত্রিক উদ্যোক্তারা এই অ-কৃষি খাতের সাথে যুক্ত। তরুণ শিক্ষিত উদ্যোক্তারা বিশেষ করে ডিজিটাল উদ্যোক্তারা এই খাতে এখন বেশি বেশি যুক্ত হচ্ছেন। বিশেষ করে কভিডকালে এদের অনেকেই গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে যুক্ত হয়েছেন। অ-কৃষি

খাতের এই উন্নতির পেছনে কৃষি খাতের ভূমিকাও কম নয়। উপকরণ সরবরাহ ও চাহিদার জোগান দিয়ে কৃষি ও অ-কৃষি খাতকে চাঙ্গা রাখছে। বলা যায়, চাঙ্গা গ্রামীণ অর্থনীতি এখন দু'পায়েই হাঁটছে।

তবে এখনো মোট শ্রমশক্তির ৪০ শতাংশ কৃষি খাতেই নিযুক্ত আছে। ভবিষ্যতেও এই খাতে শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যুক্ত থাকবে, তা বোঝা যায়। সরকারও তাই কৃষির দিকে নীতি মনোযোগ অব্যাহত রেখেছে। ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি বাজেটে কৃষি খাতে বাড়তি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য নীতিনির্ধারকরা বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিকায়নে। শিক্ষিত তরুণারও তাই আজকাল নতুন করে কৃষির দিকে ঝুঁকছেন। কৃষি গবেষণায় বেশি বেশি নীতি সমর্থন থাকায় নতুন নতুন জাতের ধান, গম, ভুট্টা ও সবজির উৎপাদন বেড়েছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ১৩টি জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে। তা ছাড়া ২০১৩ সালে বিশ্বে প্রথমবারের মতো জিংকসমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করেন আমাদের কৃষি গবেষকরা। এর বাইরে পাটের কয়েকটি নতুন জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি পাটের জীবন রহস্যও উন্মোচন করেছে বাংলাদেশ পাট গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কৃষিতে এমন বিপ্লবের ফল হিসেবেই ১৯৭২-এর তুলনায় আজ আমাদের মোট ফসলের উৎপাদন চার গুণেরও বেশি। আমরা জানি যে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে জীবনমানের যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে তার পেছনে কাজ করেছে কৃষির আধুনিকায়ন, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি, অ-কৃষি খাতের বিস্তার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার এবং সর্বোপরি প্রাবসী আয় বৃদ্ধি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় সরকারের বিনিয়োগ, দারিদ্র্য বিমোচন ছাড়াও রপ্তানি শিল্পে পর্যাপ্ত নারী শ্রমশক্তি সরবরাহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। তবে এই সব শক্তিকে এক সূত্রে গাঁথতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে সরকারের যথাযথ নীতি সহায়তা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্বে পরিচালিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তির গতিশীল অভিযান। এক দশক আগে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভিযান শুরু করেছিলাম তার পেছনে মূল ভাবনাটিই ছিল সামাজিক পিরামিডের পাটাতনে থাকা প্রান্তিক ও গ্রামীণ জনগণের কাছে আরো সহজে কী করে উপযোগী আর্থিক সেবা পৌঁছে দেওয়া যায়। বলা চলে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তির এই অভিযানে বদলে যাওয়া বাংলাদেশ আজ অনেকটাই সফল। মোবাইল আর্থিক সেবা, এজেন্ট ও ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের কল্যাণে বাংলাদেশের অতি সাধারণ মানুষও আজ তাদের মতো করে আর্থিক সেবার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে ছোটখাটো উদ্যোক্তাদের কর্মচাঞ্চল্য বেড়েছে। আর প্রবৃদ্ধি হতে পেড়েছে গতিময় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক।

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে নতুন ধারার উন্নয়ন চিন্তায় পরিচালিত বাংলাদেশের অর্জনগুলো সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলো থেকেই টের পাওয়া যায়। ২০০৮-০৯ থেকে এখন পর্যন্ত বর্তমান মূল্যে জিডিপি সাড়ে চার গুণের বেশি বেড়ে হয়েছে

৪৬৫ বিলিয়ন ডলার। এ সময়ের ব্যবধানে বার্ষিক রপ্তানি তিন গুণের বেশি বেড়ে হয়েছে ৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই অর্থবছর শেষে তা ৬০ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। প্রবাসী আয় প্রবাহ বেড়েছে দুই গুণেরও বেশি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আমদানিমূল্য বেশি হারে বাড়ায় লেনদেনে সাময়িক কিছু চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হলেও এই টানাপড়েন সামলে নেওয়ার সক্ষমতা বাংলাদেশের যে রয়েছে তার প্রমাণও মিলছে। অর্থনীতির গতি যেমন বেড়েছে, এটির ঘাতসহতাও বেড়েছে। তার প্রমাণ সঞ্চয়-জিডিপির অনুপাত ২৫ থেকে ৩১ শতাংশের মধ্যে থাকা। বেশি বেশি সঞ্চয় হয়েছে বলেই চলমান সংকটকালে সেই সঞ্চয় ব্যবহার করে সংকট মোকাবিলা করা যাচ্ছে। অন্যদিকে নানা রকম চ্যালেঞ্জ থাকার পরও বিনিয়োগ ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। তাই বিনিয়োগ-জিডিপির অনুপাত ২৬ থেকে বেড়ে ৩২ শতাংশ হয়েছে। বাস্তব কারণেই বহিঃস্থ উৎস থেকে ঋণ করতে হয়েছে। তবে টাকার অঙ্কে ঋণের পরিমাণ বাড়লেও জিডিপির শতাংশ হিসেবে বহিঃস্থ ঋণ ২৫ থেকে কমে ২১ শতাংশ হয়েছে। সরকারি বিদেশি ঋণ এখনো জিডিপির ১৫ শতাংশের নিচে। অর্থাৎ অর্থনীতির আকার যে হারে বেড়েছে সে তুলনায় বহিঃস্থ ঋণ বাড়েনি। এটি দেশজ অর্থনীতির স্বনির্ভরতার সূচক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এমন ট্র্যাক রেকর্ডের কারণেই চলমান বিশ্বসংকটকালে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে সহজ শর্তে সস্তা ঋণ পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী হওয়া যায়। ইতিমধ্যে আইএমএফ, এডিবি, বিশ্বব্যাংকসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়ার উপযুক্ত উদ্যোগ নিয়েছে।

উন্নয়নের এই নতুন পথপরিক্রমার প্রথম পর্যায়টি শেষের পথে। এই ধাপে বাংলাদেশ নিজের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থান সুসংহত করার পাশাপাশি নাগরিকদের জন্য মৌলিক সুরক্ষাগুলো নিশ্চিত করে এগিয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়টি হবে একটি বড় উল্লম্ফনের (বলা যায় 'কোয়ান্টাম্প জাম্প')। এক যুগের বেশি সময় ধরে যে সম্ভাবনাগুলো তৈরি করা গেছে, সেগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে এ পর্যায়ে। আর তা করা গেলেই আগামী দুই দশকে এ দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি এবং জনগণের জীবনমানের ক্ষেত্রে বড় উল্লম্ফন ঘটানো সম্ভব হবে। নতুন পথপরিক্রমায় যে ভিত্তি রচিত হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পর্যায়ের এই উল্লম্ফন ঘটবে। আর এ ক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত তো ভূমিকা রাখবেই। আর নেতৃত্ব নেবে আমাদের বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি খাত। তবে ব্যক্তি খাতের বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্বটি সরকারের। আর সেই পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে বড় অবদান রাখবে গত এক যুগের বেশি সময় ধরে অবকাঠামো খাতে সরকারের ধারাবাহিক বিনিয়োগ। আমরা লক্ষ করেছি, এ সময়কালে জাতীয় বাজেটে পরিবহন ও যোগাযোগ খাত গড়ে বাজেটের ১০ শতাংশের বেশি বরাদ্দ পেয়েছে এবং সব সময়ই প্রধান অগ্রাধিকার খাতগুলোর অন্যতম হিসেবে থেকেছে। সর্বশেষ চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতের জন্য প্রায় ১২ শতাংশ বরাদ্দ রাখা

হয়েছে। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের এই বরাদ্দ দেশের অভ্যন্তরে যোগাযোগ তো বটেই, দক্ষিণ এশিয়া (বিশেষ করে বিবিআইএন) অঞ্চলে যোগাযোগ বৃদ্ধিতেও বিশেষ সহায়ক হয়েছে এবং হবে। আর তাতে সুবিধা পাবে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের উদ্যোক্তারা। আর চূড়ান্ত সুফল ভোগ করবে এসব পণ্য ও সেবার ভোক্তা, যারা সেই সাধারণ নাগরিকরা। বিশেষ করে পদ্মা সেতু, কালনা সেতু, এসইজেড, এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রো রেলের মতো মেগাপ্রজেক্টগুলোর সরাসরি সুফল ভোগ করবে ৩৩ শতাংশ নাগরিক। পোর্ট হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি ৭০ শতাংশ বাড়বে। আর এর ফলে মালামাল খালাসের সময় অর্ধেকে নেমে আসবে (৪০ দিন থেকে কমে ১৬ দিন হবে)। বৃহৎ কানেক্টিভিটি প্রকল্পের প্রতিটি জিডিপিতে ১.২ শতাংশ যোগ করতে পারে।

সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড ৮০-৯০ দশকে মাথাপিছু আয় ২,৪০০ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার পর যে পথে এগিয়ে ওই মাথাপিছু আয়কে ৪,০০০ ডলারের ওপর নিয়ে গেছে, এই দশকে বাংলাদেশও সে পথে এগোনোর সম্ভাবনা তৈরি করেছে (বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২,৮০০ ডলার ছাড়িয়েছে)। এ পথে এগিয়ে যেতে পারলে ২০২৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ৪,০০০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতিগুলোতে মাথাপিছু আয় ২,৪০০ থেকে বেড়ে ৪,০০০ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় জিডিপির শতাংশ হিসাবে ভোগ বেড়েছিল ১২ শতাংশের মতো। বাংলাদেশে এখনই জিডিপির দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসছে ভোগ থেকে। কাজেই আশা করা যায়, ২০২৬ সালের মধ্যে জিডিপির শতাংশ হিসাবে ভোগের অংশ আরো ১০-১২ শতাংশ বাড়বে।

বাংলাদেশের এমন সম্ভাবনাগুলোর বিচারে আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা বোস্টন কনসালট্যান্সি গ্রুপ বলছে, প্রবৃদ্ধি দুই অঙ্কের ঘরে থাকলে ২০৩০-এর মধ্যে এ দেশের জিডিপির আকার ১ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়াবে। আর যদি প্রবৃদ্ধির হার ৫ শতাংশও হয়, তবু ২০৪০-এ অর্থনীতি ১ ট্রিলিয়ন ছাড়াবে। ২০২০ সালে মধ্যম ও উচ্চ আয়শ্রেণিতে থাকা নাগরিকের সংখ্যা ১৯ মিলিয়ন। ২০২৫ সালে বেড়ে হবে ৩৪ মিলিয়ন। উচ্চতর আয়শ্রেণিতে যাওয়া মানুষের সংখ্যা যত বাড়বে, তাদের চাহিদাও তত বাড়বে। ফলে বাজার হিসেবে বাংলাদেশের সম্ভাবনাও বাড়বে। আর এর ফলে ১০-১২ বছরে যে গতিতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে, আগামীতে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হারে বিনিয়োগ বাড়বে বলে আশা করা যায়। আর এই প্রত্যাশার ভিত্তি তৈরি করেছে সরকারের ধারাবাহিকতা এবং স্বপ্নসঞ্চারী নেতৃত্ব। এই নেতৃত্বেই বর্তমানে জলবায়ুসহিষ্ণু, দক্ষ জনশক্তিনির্ভর, অন্তর্ভুক্তিমূলক গতিময় এক স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্যপূরণে নিবেদিত। আশার ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করে আমরা তাই ২০৪১ সালের আগেই পৌঁছে যেতে চাই ১ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের মাইলফলকে। আর এই স্বপ্নযাত্রায় দক্ষ ও নিবেদিত নেতৃত্বের পরম্পরার কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের এই নতুন পথপরিক্রমার বর্তমান ও আগামী–দুটোই আশাসঞ্চারী–এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার চেয়েও বড় কথা, এই আশা-ভরসার ভিত্তি আমাদের নিজস্ব, পরনির্ভর নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে, বাংলাদেশ এগোচ্ছে 'আত্মশক্তি'র ওপর ভিত্তি করেই। তাই এই আশা-ভরসা আর সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার বিষয়ে আমরা আত্মবিশ্বাসী হতেই পারি। নিশ্চয়ই আগামী আলোকোজ্জ্বল দিন বাংলাদেশের।

লেখক : বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, জাতীয় অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর।

বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ

জাফর ওয়াজেদ

তথ্য-প্রযুক্তির এই বিকাশকালে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশকালে কেমন হবে বাংলা ভাষার অবস্থা ও অবস্থান, সে নিয়ে সংশ্লিষ্ট কারো ভাষ্য মেলে না। কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন ব্যবহারে ইংরেজি বা রোমান হরফের আধিক্যে বাংলা ভাষা পিছু হটে যাচ্ছে বলে মনে হতেই পারে। বর্ণমালা না চেনা গ্রামীণ মানুষটিও মোবাইলের বদৌলতে ইংরেজি ভাষাকে জানা শুধু নয়, রীতিমতো অবলীলায় ব্যবহারও করছেন। আবার এ ক্ষেত্রে যাঁরা বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন, তাঁরাও এই ভাষার বিশুদ্ধ রূপটি সম্পর্কে সর্বাত্মক অবহিত নন। তাই বাংলা ভাষায় ভুলের ছড়াছড়ি সব ক্ষেত্রেই ক্রমে বাড়ছে। ভুল বানান, ভুল বাক্য গঠন হরহামেশাই হচ্ছে। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধ রূপ যদি পাওয়া যেত, তাহলে ভুল বাংলা লেখার দায়ভার চাপত না কারো ওপর। ভুল বানান আর ভুল শব্দ প্রয়োগের কবল থেকে হওয়া যেত মুক্ত। অবশ্য প্রশ্ন ওঠে, সামাজিক মাধ্যমেও বাংলা ভাষার কি কোনো বিশুদ্ধ রূপ রয়েছে? যদি থাকে, তাহলে সেটি কী? আর যদি না-ই থাকে, তবে ভুল লেখা নিয়ে আপত্তিই বা কেন? একুশ শতকে এসে দেখা যায়, যেসব বিধি-বিধানের ব্যাপারে বাংলা ভাষা কঠোর, সেগুলোর কোনো কোনোটিকে মেনে চলার কোনো প্রয়োজন অনেকেই বোধ করেন না। বাংলা ভাষার যদি পাওয়া যেত বিশুদ্ধ রূপ, তবে বাংলা বাক্য গঠন ও বানানে যে স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রতিবিধানে শৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়োজনে আনুমানিক বিধান যে প্রয়োজন, তা বাংলা ভাষা চর্চাকারীই মাত্র উপলব্ধি করেন। বানানের বিশৃঙ্খলা যেমন কাম্য নয় মোটেও, তেমনি কাম্য নয় শব্দের অশুদ্ধ প্রয়োগ। আর এখন তো এফএম রেডিও আর স্যাটেলাইট টিভির কল্যাণে বাংলা-ইংরেজির মিশ্রণে জগাখিচুড়ি ভাষার বিশ্রী রকম বিস্তার ঘটছে। বাংলা শব্দের প্রয়োগ বৈচিত্র্য বোঝার ক্ষেত্র যদি না থাকে, তবে শুদ্ধতা দূরপরাহত। বাংলা ভাষা যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য হওয়ার সুযোগ না দিলে সমস্যা বাড়ে বৈকি। বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী, অর্থাৎ যাঁরা পড়ান বা পড়েন, কিংবা লেখালেখি করেন, তাঁদের হরেক রকম সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। কখনো তা উচ্চারণের, কখনো ঠিক শব্দ বাছাইয়ের কিংবা যথাযথ বাক্য গঠনের। লেখার ক্ষেত্রে ঝকমারি কম নয়। যতিচিহ্নের ব্যবহার বা সঠিক বানান প্রয়োগ–এসবের নিয়ম মানা কিংবা নিয়ম ভাঙার কাজটি করতে হয়। ব্যাকরণের নিয়মে গ্রাহ্য নয়, এমন বহু শব্দ বা বাক্যের প্রয়োগ প্রচলিত, তার অনেকেই ব্যবহার করা হয়েছে। আবার এমন প্রয়োগও দেখা যায়, যা ব্যাপকভাবে প্রচলিত, কিন্তু শুধু সেই কারণেই তাকে মেনে নেওয়া যায় না। সুতরাং কোনটি প্রচলনগ্রাহ্য এবং কোনটি প্রচলনগ্রাহ্য নয়, তা

নিয়ে লেখকের মতো পাঠককেও মাথা ঘামাতে হয়। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তো লিখেছেনই, 'আমরা লিখি এক আর পড়ি আরেক। অর্থাৎ আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায়, আর ঠিক সেটি পড়ি প্রাকৃত বাংলা ভাষায়।' বাংলা ভাষার ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যের কারণে বানান সমস্যা একটা গুরুতর ব্যাপার। আবার বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে যেসব শব্দ আছে, তারা সবাই এক জাতে নয়। অবশ্য প্রায় সব ভাষাতেই তাই; কিন্তু বাংলা ভাষার বিশেষভাবে যা আছে তা হচ্ছে বিভিন্ন জাতের শব্দের অস্তিত্ব। এমনকি জাত অনুসারে অনেক সময়ই তাদের বানানে নিয়মের ভিন্নতা রয়েছে। এক জাতের শব্দ, যেমন তৎসম শব্দ। তার মধ্যেও আছে আবার ব্যাকরণ সিদ্ধভাবেই বানানের বিকল্পের অস্তিত্ব বা অবস্থান। অ-তৎসম যেসব শব্দ আছে, তার মধ্যে বানানের নিয়মের মধ্যে রয়েছে শিথিলতা। ফলে তাতে আছে ব্যতিক্রম ও বিকল্পের অস্তিত্ব। দেখা যায়, বাংলা শব্দের বানানের ক্ষেত্রে একটি ঐক্যবদ্ধ নিয়মে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অনেকটি নিয়ম, যা কখনো কখনো স্ববিরোধী, তাকেও মেনে নিতে হয়। শুধু প্রচলনের কারণেই বহু তৎসম শব্দে নিয়ম লঙ্ঘন ধীরে ধীরে স্বীকৃত হয়ে গেছে। এ নিয়ে আর আপত্তি মেলে না। বাংলা ভাষা ব্যবহারে কিছু বেতার-টিভির বিকৃতি নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতও সংক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এসব পরিহারের জন্য বানানের ক্ষেত্রে নিয়ম চালুর জন্য কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ-প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়ে আদালত একটি কমিটিও করে দিয়েছিলেন; কিন্তু সেই কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে আর কোনো মাধ্যম থেকে জানা যায়নি।

বাংলা ভাষা যাঁরাই সচেতনভাবে ব্যবহার করেন, তাঁদেরই সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ে বাংলা ব্যবহারের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে একসঙ্গে কাজে লাগতে পারে, এমন একটি অভিধান। যাকে বলা হয় প্রয়োগ অভিধান। অথচ বাংলা ভাষায় প্রয়োগ অভিধান দূরে থাক, একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান বা শব্দকোষ আজও প্রণীত হয়নি। বাংলায় এযাবৎকালে যত অভিধান সংকলিত হয়েছে, তা মূলত ব্যাবহারিক অভিধান। আদর্শ তাত্ত্বিক অভিধান রচনার কাজটিও শ্লথ। যেমন হয়নি প্রয়োগ অভিধান প্রণয়ন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাংলা ভাষাকে চিনতে হবে ভালো করে। কোথায় তার শক্তি, কোথায় তার দুর্বলতা, দুই-ই আমাদের জানা চাই।' ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তির ভেতরে যে ভাষার শক্তি, তা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা ভাষা 'ভঙ্গিওয়ালা ভাষা।' বলেছেন, 'ভাব প্রকাশের এ রকম সাহিত্যিক রীতি অন্য কোনো ভাষায় আমার জানা নেই।' বাংলায় বাক্যবিন্যাসও মূলত বিচিত্রমুখী। আর শব্দের প্রায়োগিক লক্ষ্য অনুযায়ী শব্দার্থের প্রকারভেদও বহুমুখী। বাংলার মতো এতে ইডিয়োমেটিক ইমেজ পৃথিবীর আর কোনো ভাষায় নেই। তাই এই ইমেজ ভাষা ব্যবহারকারীর ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন স্বয়ংসম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ শব্দবোধক অভিধান, যে অভিধান অনুসরণ করে ব্যবহারকারী বা পাঠক শব্দটির যথার্থ প্রয়োগের দিকনির্দেশনামূলক সহায়তা পেতে পারে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় বাংলা ভাষার প্রয়োগ ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগের থেকে ভিন্নতর। কেননা সেখানে ভাষাকে অনেক বেশি শক্তিশালী, দৃঢ় ও অর্থবহ হতে হয়। আবার প্রয়োগের সমস্যা বাক্য গঠনের ক্ষেত্রেও অনেক। একসময় বাংলা বাক্যে আকাঁড়া সংস্কৃত বা ইংরেজির প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু মুখের ভাষাই ছিল বরাবরের প্রধান নির্ভর। যদিও এর সঙ্গে সংস্কৃত সমাসনির্ভর বাক্য গঠন বা ইংরেজি সিনটেক্সের আদল বাঙালির লেখায়, এমনকি কথোপকথনে মিশে গেছে অনেক আগেই এবং তা চলিত শিষ্ট; বাংলার একটা আদর্শ বা চাল তৈরি হয়ে গেছে। আর সেটাই এখন বাংলা ভাষার গড়ন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেনও 'কথার ভাষার বদল চলছে লেখার ভাষার মাপে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে চলতি ভাষায় যেসব কথা ব্যবহার করলে হাসির রোল উঠত, আজ মুখের বাক্যে তাদের চলাফেরা চলছে অনায়াসেই।' বিদেশি শব্দের উচ্চারণ ও বানানরীতি অনুসারে বাংলা ভাষায় তা গ্রহণ করতে হবে, নাকি বিদেশি শব্দসমূহকে বাংলা ভাষায় উচ্চারণ ও বানানরীতি অনুসারে লিখতে হবে, সে নিয়ে বিতর্ক অনেক দিনের। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, বিদেশি শব্দকে বিদেশি উচ্চারণ ও বানানরীতি মেনে লিখতে হলে বাংলায় নতুন নতুন বর্ণ তৈরি করা আবশ্যক। বাংলা ভাষায় বাক্য গঠনে শব্দ প্রয়োগ-অপপ্রয়োগের সীমারেখা জানা না থাকায় নিয়ত ভুল শব্দ, ভুল বাক্যের মুখোমুখি হতে হয়। অন্য ভাষায় যা-ই হোক, বাংলার মতো জীবন্ত ভাষাতে প্রয়োগের সমস্যার ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান। এমনটা পাই উনিশ শতকেও। ঢাকা নর্মাল স্কুলের পণ্ডিত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত প্রথম বাংলা অভিধানের ভূমিকায় লেখা হয়েছিল, 'দিন দিন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও তৎসঙ্গেই বিবিধ নূতন শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ ভাব প্রকাশক শব্দের অত্যন্ত অভাব আছে। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থপ্রণেতা মাত্রেই নূতন নূতন শব্দ প্রণয়ন ও অনেক অব্যবহৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই সমুদয় শব্দের অর্থ প্রায় কোনো অভিধানেই পাওয়া যায় না; তন্নিমিত্ত বাঙ্গালা পাঠকগণের নিকট এই ভাষা সময়ে সময়ে এক অভিনব ভাষা বলিয়া প্রতীয়মান হয়; আমি সেই অভাব পরিহারে কৃত সংকল্প হইয়া প্রথমতঃ নানাবিধ বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া বহুসংখ্যক নূতন শব্দ সংগ্রহ করিয়া ধাতু ও লিঙ্গ সহিত শব্দদীধিত নামে এই অভিধানখানি প্রচারিত করিলাম।' আর বিশ শতকের সূচনা সময় থেকে বাংলা ভাষা, সাহিত্যের দ্রুত ঋদ্ধি, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, আইন-আদালতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শনের বিতর্ক বিচারে, অর্থাৎ বাঙালি জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় তীব্রভাবে, ফলে সংগত কারণেই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান চর্চার ক্ষেত্রে সূচিত হয় এক নতুন অধ্যায়। কিন্তু ব্যবহারিক ব্যাকরণ বা ব্যবহারিক অভিধান পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি অদ্যাবধি।

এটা তো বাস্তবতা যে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয় জীবন্ত ভাষা, জীবনে এবং সাহিত্যে শব্দের অর্থান্তর, অর্থ সংকোচন কিংবা সম্প্রসারণ হয়ে ওঠে অবশ্যাম্ভাবী। ভাষার রীতিতে, বানানে, বাক্যবিন্যাসে, শব্দ যোজনার একাধিক পরিবর্তনে প্রয়োজন হয় নতুন যুগের নতুন অভিধান। ব্যাকরণ ও অভিধান মানবজাতির সকল জীবন্ত ভাষা ও সাহিত্যে অনুগামী হয়। জীবন্ত ভাষার রূপ পরিবর্তনে মৌখিক ভঙ্গির প্রভাব থাকে। এটি ধরা পড়ে বাক্যের অঙ্গসংগঠনে, শব্দের উচ্চারণে, বানানের রীতি বদলে। তথ্য-প্রযুক্তি তথা বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি ও বিকাশ এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও বিনিময় এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ভাষার অঙ্গরূপে আনে অভিনবত্ব এবং এভাবে ভাষার প্রয়োগ বৈচিত্র্য ও ব্যবহার উপযোগিতা বেড়ে যায়। প্রয়োগের পৌনঃপুনিকতাই অভিধানে ঘুমন্ত শব্দগুলোর জাগ্রত সত্তা ও উপযোগিতা। ব্যাবহারিক উপযোগিতাহীন শব্দটির বদ্ধ নিশ্চল মৃত। ব্যবহার না হতে হতে অনেক শব্দ স্মৃতিতেও লুপ্ত হয়ে যায়। গত পাঁচ দশকে আমাদেরই ব্যবহৃত অনেক শব্দ, বাক্য আর উচ্চারিত হয় না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা মুছে বা বদলে গেছে। শিক্ষা, সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমের ব্যাপক প্রসার এবং ভাষা ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বাড়ার কারণে ভাষার প্রয়োগ বৈচিত্র্যেরও রয়েছে বহুমাত্রিকতা।

বানানের বিশৃঙ্খলা যেমন কাম্য নয়, তেমনি কাম্য নয় শব্দের অশুদ্ধ প্রয়োগ। প্রয়োগ অভিধানই পারে এই সমস্যার সমাধান দিতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাংলা ভাষা পরিচয় গ্রন্থে বলেছেন, 'আমাদের দেহের মধ্যে নানা প্রকার শরীর যন্ত্র মিলে বিচিত্র কর্মপ্রণালীর যোগে শক্তি পাচ্ছে প্রাণ সমগ্রভাবে। আমরা তাদের বহন করে চলেছি কিন্তু কিছুই চিন্তা না করে। তাদের কোনো জায়গায় বিকাশ ঘটলে তবেই তার দুঃখবোধে দেহব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ করে চেতনা জেগে ওঠে। আমাদের ভাষাকেও আমরা তেমনি দিবারাত্রি বহন করে নিয়ে চলেছি। শব্দপুঞ্জেও বিশেষ্য বিশেষণে সর্বনামে বচনে লিঙ্গে সন্ধি প্রত্যয়ে এই ভাষা অত্যন্ত বিপুল ও জটিল। অথচ তার কোনো ভার নেই আমাদের মনে। বিশেষ কোনো চিন্তা নেই। তার নিয়মগুলো কোথাও সঙ্গত কোথাও অসঙ্গত; তা নিয়ে পদে পদে বিচার করে চলতে হয় না। আমাদের প্রাণশক্তি যেমন প্রতিনিয়ত বর্ণে গন্ধে রূপে রসে বোধের জাল বিস্তার করে চলেছে, আমাদের ভাষায় তেমনি সৃষ্টি করেছে কত ছবি কত রস–তার ছন্দে, তার শব্দে। কত রকমের জাদুশক্তি।' বাংলাদেশে দেখা যায়, পদ্যের শব্দ গদ্যে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হচ্ছে। 'সাথে' আর 'সঙ্গে'র পার্থক্য যে আছে, তা-ও মানা হয় না। রবীন্দ্রনাথ 'সবার সাথে যোগে যেথায় বিহারো' এবং 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ' কেন লিখেছিলেন, সেটাই স্পষ্ট নয় অনেকের কাছে। 'অনবরত' বা 'অবিরাম'-এর মতো সুন্দর শব্দ থাকা সত্ত্বেও 'লাগাতার' শব্দ ব্যবহার করা হয়

সংবাদপত্রে। আরো দেখা গেছে, বাঙালি চেঁচামেচির ভাষা হিসেবে বাংলার চেয়ে ইংরেজি পছন্দ করে।

বাংলা বানানের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। যুক্তাক্ষরকে ভাঙ্গা, ই, ঈ-কারের সংস্কার সাধন, 'র' ফলা, ব ফলা, অনুস্বর বিসর্গ ইত্যাদির ব্যবহার নানাভাবে করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে সম্ভবত প্রয়োজন বাংলা বানানের বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ ও তৎসম, তদ্ভব শব্দের সংস্কার সাধন। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের চাপটা একুশ শতকে কিছুটা হলেও কমেছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। কম্পিউটার তথা তথ্য-প্রযুক্তির কারণে বানানরীতিতে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। নানা বিধিও তাই স্বাভাবিক কারণে পরিবর্তিত হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা আর রবীন্দ্রনাথের বাংলা কিংবা বিদ্যাসাগরের বাংলা আর শরৎচন্দ্রের বাংলা কিংবা একালে হাসান আজিজুল হক আর হুমায়ূন আহমেদের বাংলা এক নয়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য ভাষা ঠাঁই পেয়েছে। বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীরা এই একুশ শতকে এসেও সাধু ও চলিতের ফারাক টানায় শ্রমবিমুখ। সাধু-চলিতের গুরুচ-ালী এখনো মেলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ দফতরেও। 'বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বঙ্গভাষা রাজভাষা নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা নহে, সম্মান লাভের ভাষা নহে, কেবলমাত্র মাতৃভাষা।' বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখন তো ব্যাকরণ ধরাশায়ী। ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ অযত্নলালিত। কোথাও বিশেষণের ভারে জর্জরিত। ষাটের দশকের মাঝামাঝি বাংলা একাডেমির বাংলা ভাষা সমীক্ষায় অপপ্রয়োগের আধিক্য দেখে ভাষাবিদ মুনীর চৌধুরী 'বাংলা গদ্যরীতি' প্রবন্ধে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'যদি উচ্চশিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানীর বাঙলা এত গুরুতর রূপে অশুদ্ধ হয়; তাহলে স্বল্পশিক্ষিতদের লেখা সম্ভবত আদ্যোপান্ত প্রমাদপূর্ণ। ... সমগ্র ভাষার স্বকীয় প্রবণতা আজকের অপটু রচনার আলোকে নিরূপিত হতে পারে না। এমনকি প্রতিষ্ঠিত লেখকের অযত্ন লালিত আঞ্চলিকপুষ্ট, শিরভ্রষ্ট অশুদ্ধ প্রয়োগেও ভাষার পূর্ণ তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যরূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য নয়।' অনেক ক্ষেত্রে অনাবশ্যক শব্দও প্রচলিত হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে নতুন মাত্রা ও দ্যোতনা পায়। বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীরা এমননিতেই শব্দবাহুল্য পছন্দ করে। কানকে পীড়িত করে, এমন শব্দও ব্যবহার হয়। শব্দের ফাঁক ফাঁক বসা আর জড়াজড়ি করে বসার ক্ষেত্রে আছে ভ্রান্তি। একেকজন একেকভাবে ব্যবহার করে। বাংলায় যতিচিহ্ন ঐতিহাসিক ক্রমে ইংরেজির যতিচিহ্নের অনুসারী। কিন্তু এ ভাষায় যতিচিহ্নের ব্যবহারকালেও অতিনির্দিষ্টতা নেই, ইংরেজির তুলনায় এমনকি বিরামচিহ্নও বাংলায় সন্ধি বা বাংলায় বিভক্তি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন। বাংলা ভাষায় এদের স্বতন্ত্র ধরন থাকা প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় সহজিয়া সাধনায় জোয়ার বইছে। টানা বাংলা বেশ কয়েক ছত্র লিখবেন, এমন লেখকের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। 'বাংলা ভাষার

প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ' নামে গত শতকের আশির দশকে বাংলা একাডেমি থেকে বেরিয়েছিল একটি গ্রন্থ। কিন্তু তাকে প্রয়োগ অভিধান বলা যায় না। ভাষার পরিবর্তন ঘটে। বানানেরও কিন্তু তাতেও থাকা দরকার একটি শৃঙ্খলা। বাংলা ভাষায় চলছে বিশৃঙ্খল অবস্থা। নির্জীবতার লক্ষণ সর্বত্র। মুদ্রণ নির্ভুল করার সযত্ন প্রয়াস দেখা যায় না। মুদ্রণ প্রমাদ যে রসাপকর্ষ ঘটায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথম শ্রেণির পত্রপত্রিকাতে এ বিষয়ে তেমন সতর্কতা দেখা যায় না। মুদ্রণের ঔদাসীন্যের জন্য নর্মদা হয়ে যায় নর্দমা। বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ বাড়বেই। ডিজিটাল দেশে বাংলা ভাষা বিপন্ন হয়ে উঠবে, তা কাম্য হতে পারে না। জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, 'মানুষের ভাষা তবু অনুভূতি দেশ থেকে আসে/ না পেলে নিছক ক্রিয়া, বিশেষণ, এলোমেলো নিরাশ্রয়/শব্দের কংকাল।' বাঙালি বাংলা ভাষায় জন্য রক্ত ঢেলেছে। ভাষার জন্য আন্দোলনকে সে স্বাধীনতা আন্দোলন ও যুদ্ধে পরিণত করে ভাষাভিত্তিক নতুন রাষ্ট্র গড়েছে। কিন্তু সেই বাংলা ভাষাকে সর্বজনসম্মত ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলা থেকে ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশে কার্যকর উদ্যোগ ও অবদান দৃশ্যমান নয়। একুশ শতকে এসেও শুদ্ধভাবে বাংলা লেখা না গেলে 'সকলি বৃথা, সকলি গরল ভেল' যেন।

লেখক : একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক এবং মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

ডায়রিয়া : কারণ ও করণীয়

ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ

বাংলাদেশের রোগগুলোর মধ্যে ডায়রিয়া অন্যতম একটি। প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ এতে আক্রান্ত হয়, বিশেষ করে শিশুদের ডায়রিয়ায় আক্রান্তের হার অনেক বেশি। রাজধানীর মহাখালীর আইসিডিডিআরবিতে প্রতিদিন গড়ে এক হাজারের বেশি রোগী ভর্তি হচ্ছে। জায়গা সংকুলান না হওয়ায় রোগী সামলাতে হাসপাতালের বাইরে অস্থায়ী তাঁবু টানিয়ে চিকিৎসা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। হাসপাতালে ভর্তি রোগীর অনেকেই আবার কলেরায় আক্রান্ত। প্রতিষ্ঠানের ৬০ বছরের ইতিহাসে এত রোগীর চাপ আগে দেখা যায়নি। তবে বর্তমানে সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, গ্রামগঞ্জে ব্যাপক হারে ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়ছে।

ডায়রিয়া কাকে বলে? মনে রাখতে হবে, পায়খানা নরম বা পাতলা হওয়া মানেই যে ডায়রিয়া হয়েছে, তা নয়। সারা দিনে তিনবার বা তার বেশি নরম বা পাতলা পায়খানা হলে তাকেই সাধারণত ডায়রিয়া বলা হয়। তবে কিছু কিছু রোগীর পানির মতো পাতলা পায়খানার সাথে রক্ত কিংবা মিউকাছ বা আম মিশ্রিত পায়খানাও হতে পারে।

ডায়রিয়ার কারণ : ডায়রিয়া সংক্রমণের মূল কারণ সাধারণত বিশুদ্ধ পানি পান না করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবার না খাওয়া। তাই সঠিকভাবে ব্যক্তিগত এবং পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চলাই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার জন্য দায়ী। গত দুই বছরের বেশি হলো করোনা ভাইরাসের তাণ্ডবে জনগণ বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত। এমনকি তারা ঘরে বন্দি জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছিল। করোনা ভাইরাস মহামারি শুরুর পর থেকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধসহ জনগণের চলাচল ও জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে, প্রচুর মানুষ শহর থেকে গ্রামে চলে গিয়েছিল। বর্তমানে করোনার সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে, জনগণের ভয়-ভীতি কেটে গেছে। এর সাথে স্বাস্থ্যবিধি পুরো শিথিল হয়ে যাওয়ায় জীবনযাত্রার অনেক কিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। এখন সব কিছু পুরোদমে চালু হয়ে গেছে। ফলে জনগণের বিরাট অংশ আর স্বাস্থ্যবিধি মানছে না। এটাও হঠাৎ ডায়রিয়া বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। এবারে হঠাৎ করেই গরমের মাত্রাটা একটু বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেই জনগণকে বাইরে বের হতে হচ্ছে, সর্বস্তরের লোকজন অর্থনৈতিক কারণে বা পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। গরমের কারণে প্রচুর ঘাম হয় এবং শরীর থেকে পানি লবণ বের হয়ে যায়, দেহের ভেতরে পানির চাহিদা বেড়ে যায়। স্বাভাবিক কারণেই মানুষ তৃষ্ণার্ত বা পিপাসার্ত হয়। তাই অনেকেই রাস্তাঘাটের তৈরি শরবত পান করে, যেমন গুড়ের বা আখের বা লেবুর শরবত এবং অন্যান্য পানীয়,

যা মোটেই বিশুদ্ধ নয়। এগুলো পান করেই মানুষ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে, এমনকি এর থেকে ফুড পয়জনিংও হচ্ছে। অনেকেই আবার রাস্তাঘাটের বা ফুটপাতের খাবার খেয়ে থাকে। এই খাবারগুলো প্রায়ই উন্মুক্ত বা খোলা থাকে। এগুলোতে মাছি, পোকামাকড় পড়ে, এমনকি ধুলাবালিসহ অন্যান্য দূষিত পদার্থও মিশ্রিত হয়। এ সমস্ত খাবার খেয়েও অনেকেই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে।

নিজের ঘরের খাবারও যদি ৬-৭ ঘণ্টার বেশি ফ্রিজের বাইরে থাকে, তাহলে সেগুলো অনেকক্ষণ গরমে থাকার ফলে নষ্ট হয়ে যায় এবং ব্যাকটেরিয়া ও অন্য রোগজীবাণুর দ্বারা সংক্রামিত হয়, তা খেয়েও ডায়রিয়া হতে পারে। করোনাকালে জনগণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলত। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কমে আসা এবং স্বাস্থ্যবিধি শিথিল হওয়ার সাথে সাথে জনগণের মাঝে ঘনঘন হাত ধোয়া এবং স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করার প্রবণতা কমে গেছে। এর ফলেও ডায়রিয়ার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। অনেক এলাকায় বিশেষ করে বস্তিতে, রেললাইনের ধারে বা বাসাবাড়িতে নিম্ন আয়ের শ্রমিক শ্রেণির যারা বাস করে, তারা অনেকেই বিশুদ্ধ পানির অভাব বোধ করে। এমনকি টিউবওয়েলের পানিও দূষিত, অনেক এলাকায় পানির পাইপ ফুটো হয়ে সুয়ারেজ লাইনের সাথে মিশে গেছে। অনেকেই আবার পানি ফুটিয়ে পান করে না। এ সমস্ত দূষিত পানি পান করেই ডায়রিয়া বেড়ে যাচ্ছে। বাসাবাড়ির পানির ট্যাংক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না করলেও রোগজীবাণু সংক্রমিত হয়ে যাওয়া পানি পান ডায়রিয়ার অন্যতম কারণ।

বাসি খাবার, পচা খাবার, অস্বাস্থ্যকর জীবাণুযুক্ত খাবার, অনেকক্ষণ গরমে থাকার ফলে নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবার খেলে ফুড পয়জনিং হওয়ার কারণে ডায়রিয়া হতে পারে। খাবার আগে হাত ভালোভাবে না ধোয়া এবং খাবারের জন্য ব্যবহৃত থ ালাবাটি ভালোভাবে না ধোয়ার ফলেও এ সমস্যা হতে পারে। ডায়রিয়ার অন্যতম কারণ খাদ্যে নানা ধরনের পানিবাহিত ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ। অনেক ডায়রিয়া রোগীর পায়খানা পরীক্ষা করে কলেরার জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে। পাতলা পায়খানা হলে যদি তা চাল ধোয়া পানির মতো হয়, তবে সেটা কলেরার লক্ষণ। এর সঙ্গে তলপেটে ব্যথা হওয়া, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, ঘন ঘন পায়খানায় যাওয়া এবং শরীর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যাওয়া এ রোগের উপসর্গ। শিশুদের ডায়রিয়া সাধারণত রোটা নামক ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে।

ডায়রিয়ার লক্ষণ : ঘনঘন পানির মতো পাতলা পায়খানা হওয়া, পায়খানা লাগলে দ্রুত টয়লেটে যাওয়া বা অপেক্ষা করতে না পারা, পায়খানা নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারা। এমনকি অনেক সময় পোশাকে পায়খানা লেগে যেতে পারে। তলপেটে কামড় বা তীব্র ব্যথা, বমি বমি ভাব–এমনকি অনেক সময় বমিও হতে পারে এবং আস্তে আস্তে পানিশূন্যতার কারণে শরীর দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে যেতে পারে।

ব্যাকটেরিয়া বা অন্য কোনো রোগজীবাণুর কারণে ডায়রিয়া হলে আরো কিছু লক্ষণ থাকতে পারে, যেমন পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া, জ্বর হওয়া, শরীর ব্যথা এবং

প্রচণ্ড দুর্বল অনুভব করা, বমি হওয়া বা বমি বমি ভাব থাকা ইত্যাদি। তীব্র ডায়রিয়া হলে দেহ থেকে খুব দ্রুত প্রচুর পানি এবং ইলেকট্রোলাইট বেরিয়ে যায়। ফলে পানিশূন্যতা দেখা দেয়। আর এই পানিশূন্যতা মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে চলে গেলে এবং সময়মতো এই ঘাটতি পূরণ করা না হলে বা দ্রুত চিকিৎসা না করলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই ডায়রিয়ার প্রথম চিকিৎসা হলো পানিশূন্যতা পূরণ করা।

পানিশূন্যতার লক্ষণ : পানিশূন্যতার প্রধান লক্ষণগুলো হচ্ছে মুখ শুকিয়ে আসা, পিপাসা লাগা, চোখ কোটরাগত, চামড়া শুষ্ক হয়ে যাওয়া, মাথা ব্যথা, তৃষ্ণা বৃদ্ধি, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া। এক পর্যায়ে ব্লাড প্রেসার কমে যায়, হৃদ্‌স্পন্দন বৃদ্ধি এবং খুব দুর্বল নাড়ি পরিলক্ষিত হয়। প্রচণ্ড ক্লান্তি এবং রোগী নিস্তেজ হয়ে শকে চলে যেতে পারে।

ডায়রিয়ার চিকিৎসা : ডায়রিয়ার গুরুতর জটিলতা হলো পানিশূন্যতা, তাই শরীর থেকে বের হয় যাওয়া পানি ও লবণ দ্রুততম সময়ে পূরণ করতে হবে। রোগীকে খাওয়ার স্যালাইনের পাশাপাশি বেশি বেশি তরল খাবার, যেমন–ডাবের পানি, চিড়ার পানি, স্যুপ ইত্যাদি খাওয়াতে হবে এবং স্বাভাবিক খাবার দিতে হবে। এক প্যাকেট স্যালাইন আধা লিটার পানিতে গুলিয়ে খেতে হবে। বড়দের (১০ বছরের বেশি বয়সী) ডায়রিয়া হলে প্রতিবার পায়খানার পর এক গ্লাস (২৫০ মিলি) খাওয়ার স্যালাইন খেতে হবে। শিশুদের ডায়রিয়া হলে প্রতিবার পায়খানার পর শিশুর যত কেজি ওজন, তত চা চামচ বা যতটুকু পায়খানা হয়েছে আনুমানিক সেই পরিমাণ খাওয়ার স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

শিশু বমি করলে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে খাওয়াতে হবে, যেমন–চার-পাঁচ মিনিট পর পর এক চা চামচ করে খেতে দিন। খাওয়ার স্যালাইনের পাশাপাশি অবশ্যই মায়ের বুকের দুধ খাবে এবং শিশুকে কোনো অবস্থায়ই বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যাবে না। ছয় মাসের অধিক বয়সী বাচ্চাকে খাওয়ার স্যালাইনের পাশাপাশি সব ধরনের স্বাভাবিক খাবার খাবে। ডায়রিয়ার শুরুতেই কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া একদমই উচিত নয়। আবার অনেকে দ্রুত ডায়রিয়া বন্ধ হওয়ার জন্য ওষুধ খায়, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক, মেট্রোনিডাজল বা বমির ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে, তবে তা খেতে হবে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী।

কখন হাসপাতালে নিতে হবে : রোগীর অবস্থার উন্নতি না হলে বা বেশি খারাপ হলে, বেশি মাত্রায় বমি হলে, মুখে খেতে না পারলে, প্রচণ্ড পেটে ব্যথা ও পায়খানার সাথে রক্ত গেলে এবং ব্লাড প্রেশার কম ও প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। কলেরায় খুব দ্রুত শরীরে পানিশূন্যতা তৈরি হয়। সে ক্ষেত্রে রোগী দ্রুত নিস্তেজ হয়ে এবং শকে চলে যেতে পারে। তাই কলেরার রোগীকে হাসপাতালে নিতে কোনোভাবেই দেরি করা যাবে না।

ডায়রিয়া প্রতিরোধে করণীয় ও সতর্কতা : অবশ্যই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, নিরাপদ ও ফুটানো পানি পান করতে হবে। অত্যধিক গরম আবহাওয়ার কারণে অধিক পিপাসা লাগাই স্বাভাবিক। চেষ্টা করতে হবে নিরাপদ পানি সাথে বহন করা। পানি টগবগ করে ফুটিয়ে সেই পানি পান করতে হবে এবং ফোটানোর ব্যবস্থা না থাকলে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হবে।

রাস্তার পাশে অনেক খোলা পরিবেশে লেবুর শরবত, গুড়ের শরবত, আখের রস, জুস বা ফল কেটে বিক্রি করা হয়। এগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। রাস্তার পাশে, ফুটপাতে বিভিন্ন ধরনের খাবার বিক্রি করা হয়, এগুলো প্রায়ই খোলামেলা থাকে। কীটপতঙ্গসহ ধুলাবালি এই খাবারগুলোকে দূষিত করে। উন্মুক্ত ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পরিবেশন করা, এমন খাবার পরিহার করতে হবে। খাদ্যগ্রহণের আগে ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে। তৈরি করা খাদ্যসামগ্রী এবং পান করার নির্ধারিত পানি ঢেকে রাখতে হবে। নয়তো বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ খাবারে বসে জীবাণু ছড়াতে পারে।

পরিষ্কার পানিতে আহারের বাসনপত্র, গৃহস্থালি ও রান্নার জিনিস এবং কাপড়চোপড় ধোয়া সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রয়োজনে সাবান ব্যবহার করতে হবে। ডায়রিয়া প্রতিরোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটি হচ্ছে খাবার প্রস্তুত, স্পর্শ করা, পরিবেশন করা ও খাবার খাওয়ার আগে, বাইরে থেকে ফিরে এসে হাত ধুয়ে নেওয়া। কারণ হাত দিয়েই মানুষ সব কিছু স্পর্শ করে এবং সবচেয়ে বেশি জীবাণু বহন করে।

অবশ্যই টাটকা এবং ভেজালমুক্ত খাবার খেতে হবে। অনেক দিন ফ্রিজে রাখা খাবার খাওয়াও ঠিক নয়। দুধ, কলা, ফলমূল বেশিদিন পুরনো হয়ে গেলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সেগুলো না খাওয়াই ভালো। পিতামাতা বা যেসব অভিভাবক শিশুকে খাওয়ান, তাঁরা শিশুকে খাওয়ানোর আগে এবং শিশুর মলত্যাগের অথবা পায়খানা পরিষ্কার করার পর সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে। ফিডারে দুধ খাওয়ালে ফোটানো পানি ও সাবান দিয়ে ভালোভাবে ফিডারটি ধুয়ে নিতে হবে এবং ফিডারের নিপলের ছিদ্রটি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। শিশুদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে, শিশুরা বাইরে খেলাধুলা করে, যেকোনো জিনিস হাতে নিয়ে মুখে দেয়। তাই মাঝে মাঝে তাদের হাত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

পায়খানার জন্য সব সময় স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করা উচিত। মলত্যাগের পরে টয়লেট থেকে বের হয়ে, নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে। রান্নাঘর ও বাথরুমের পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা যেন স্বাস্থ্যসম্মত হয়। যদি পানিসংক্রান্ত কোনো সমস্যা যেমন–পানিতে দুর্গন্ধ, ময়লা পানি আসা ইত্যাদি দেখা দেয়, তবে ওয়াসা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে যোগাযোগ করে পানির বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে। ছোট-বড় সবার ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখাসহ হাতের নখ কেটে সব সময় ছোট রাখা উচিত। যারা গ্রামে বসবাস করে, তাদের যেখানে-সেখানে বা

পুকুর-নদীর ধারে মলত্যাগের অভ্যাস পরিহার করতে হবে। খালি পায়ে বাথরুমে বা মলত্যাগ করতে না গিয়ে স্যান্ডেল বা জুতা ব্যবহার করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

ডায়রিয়া নিয়ে কিছু ভুল ধারণা ও করণীয় : মূলত গরমকালে ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা খুবই সাধারণ একটি সমস্যা। ঠিকভাবে পানি ও লবণ পূরণ করা হলে এটি কখনো গুরুতর আকার ধারণ করে না। বেশির ভাগ ডায়রিয়া এমনিতেই সেরে যায়। কিন্তু ডায়রিয়া হলে ওরস্যালাইন, খাওয়া এমনকি এর চিকিৎসা নিয়ে এখনো রয়ে গেছে কিছু ভুল ধারণা :

১. যাঁদের উচ্চ রক্তচাপ, তাঁরা ওরস্যালাইন খেতে পারবেন কি না? উচ্চ রক্তচাপ আছে, এমন রোগীরা ডায়রিয়ার আক্রান্ত হলে ওরস্যালাইন খেতে বিভ্রান্তিতে ভোগেন। কেননা স্যালাইনে লবণ আছে, তাঁদের আশঙ্কা, ওরস্যালাইন খেলে রক্তচাপ বাড়তে পারে। এটি গুরুতর ভুল ধারণা। প্রতিবার পাতলা পায়খানার সঙ্গে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি ও লবণ বের হয়ে যায় এবং তা যথাযথভাবে পূরণ করা না হলে রোগীর পানিশূন্যতা, লবণশূন্যতা–এমনকি রক্তচাপ কমে গিয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে মৃত্যুও হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের ক্ষেত্রে ওরস্যালাইন খেতে নিষেধ নেই।

২. ডায়াবেটিসের রোগীরা কী ওরস্যালাইন খেতে পারবেন না? ওরস্যালাইনে চিনি বা গ্লুকোজ থাকে, তাই ডায়াবেটিস রোগীরা ওরস্যালাইন খেতে ভয় পান। মনে করেন, ওরস্যালাইন খেলে ডায়াবেটিস বাড়তে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ওরস্যালাইনে যে সামান্য চিনি বা গ্লুকোজ আছে, তা অন্ত্রে লবণ শোষণের কাজে ব্যয়িত হয়। সুতরাং ডায়রিয়ার সময় ডায়াবেটিস রোগীরা নির্দ্বিধায় ওরস্যালাইন খেতে পারবেন।

৩. কিডনি রোগীরা কি ডায়রিয়া হলেও মেপে পানি খাবেন? যাঁরা কিডনির জটিলতায় ভোগেন তাঁরা অনেকেই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন, কারণ স্বাভাবিকভাবে তাঁদের নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি মেপে খেতে বলা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ডায়রিয়ার অধিক পরিমাণ পানি শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, ফলে পানিশূন্যতার ফলে কিডনি রোগ আরো বাড়তে পারে। সুতরাং প্রয়োজনে অতিরিক্ত তরল গ্রহণ করতে হবে।

৪. ডায়রিয়ার রোগীরা কি স্বাভাবিক খাবার খাবেন? অনেকেই বিভ্রান্তিতে ভোগেন, ডায়রিয়া হলে স্বাভাবিক খাবার খেতে পারবেন কি না? আসলে ঘরে তৈরি পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত সব ধরনের স্বাভাবিক খাবারই খেতে মানা নেই। ভাত, মাছ, সবজি ইত্যাদি স্বাভাবিক ও সহজপাচ্য খাবার খেতে কোনো বাধা নেই। তবে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য না খাওয়াই ভালো। স্তন্যপানরত শিশুরা কোনো অবস্থাতেই বুকের দুধ খাওয়া বন্ধ করবে না। সারা দিনে এক প্যাকেট স্যালাইন খেলেই চলবে?

স্যালাইন কতটুকু খেতে হবে তা নির্ভর করবে কতবার পাতলা পায়খানা হচ্ছে বা কতটুকু পানি হারাচ্ছেন, তার ওপর। ডায়রিয়ার কারণে একজন মানুষ মাত্র কয়েক ঘণ্টায় এক-দেড় লিটারের বেশি পানি হারাতে পারেন। সবচেয়ে সহজ হিসাব হলো, প্রতিবার পায়খানা হওয়ার পর স্যালাইন খাওয়া এবং অল্প অল্প করে সারা দিন বার বার খাওয়া। এর বাইরে সারা দিন পানি ও তরল খাবার যেমন–স্যুপ, ডাবের পানি ইত্যাদি খেতে হবে।

৫. বমি বা পাতলা পায়খানা দ্রুত বন্ধের জন্য ওষুধ সেবন প্রয়োজন কি না? অনেক সময় ফুড পয়জনিংয়ের কারণে বমি বা পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে। মানুষ স্বভাবতই ফার্মেসি থেকে বমি বা পাতলা পায়খানা দ্রুত বন্ধের জন্য ওষুধ খান, যা একেবারেই ঠিক নয়। অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ওষুধ খাওয়া ঠিক হবে না, কারণ পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রে বরং কিছু সময় বমি ও পাতলা পায়খানার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পয়জন বের হয়ে যায়।

৬. অ্যান্টিবায়োটিক কি জরুরি? সব ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক জরুরি নয়। প্রয়োজন হলো, দেহের লবণ ও পানিশূন্যতা পূরণ। দরকার হলে চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া যেতে পারে।

৭. শিরায় স্যালাইন নিতেই হবে? অনেকে শিরায় স্যালাইন নিতে ভয় পান; কিন্তু ডায়রিয়ার মাত্রা যদি তীব্র হয় তাহলে শুধু মুখে স্যালাইন পান করে শরীরে সৃষ্ট পানিশূন্যতা পূরণ করা সম্ভব না। তাই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে প্রয়োজনে শিরায় স্যালাইন নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, ডায়রিয়া থেকে বাঁচার মূলমন্ত্র–প্রতিকার এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসহ সচেতন থাকা।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক

বিকল্প ফসল উৎপাদন এনে দেবে সমৃদ্ধি

শাহীন ইসলাম

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের ৭৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। এ দেশের গ্রাম এলাকায় কমবেশি ৬০ শতাংশ এবং শহর এলাকায় কমবেশি ১১ শতাংশ মানুষের কৃষি খামার রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১১.৫ শতাংশ এবং কৃষি খাতের মাধ্যমে ৪২.৬২ শতাংশ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সনাতন পদ্ধতিতে চাষের বদলে বর্তমানে কৃষিকাজে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এ খাতে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ধান, গম, ভুট্টা, আলুসহ নানা ধরনের শস্য উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি অগ্রসরমাণ কৃষকরা নানা রকম সবজি ও ফুল চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন কৃষক পরিবারগুলো লাভবান হচ্ছে, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও মজবুত হচ্ছে। অনেক ধরনের প্রতিকূলতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করেও বাংলাদেশ বিগত ৫০ বছরে খাদ্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করছে। ক্রমহ্রাসমান কৃষিজমি, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা চাপ ও চাহিদা বিবেচনায় কৃষকরাই আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

পতিত জমির ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টার পাশাপাশি মৌসুমি পতিত জমিকে আবাদের আওতায় এনে উৎপাদন বৃদ্ধি, বসতবাড়িসহ অন্যান্য পতিত জায়গায় অনেকেই সবজি ও ফলের বাগান করছে। শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণে এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য শহরে এবং গ্রামে এখন অনেকেই ছাদবাগান বা বাড়ির আঙিনায় চাষাবাদ শুরু করেছে। এসব কাজে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষি কর্মকর্তা সব ধরনের সহায়তা করে থাকেন।

ছাদবাগান বা বাড়ির আঙিনায় টবে ড্রাগন ফলের চাষ এখন খুব জনপ্রিয়। ড্রাগন ফলটি মূলত আমেরিকার প্রসিদ্ধ একটি ফল, যা বর্তমানে আমাদের দেশেও জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। ২০০৭ সালে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং আমেরিকা থেকে এই ফলের বিভিন্ন জাত পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করার জন্য আনা হয়। নরম শাঁস ও মিষ্টি গন্ধযুক্ত গোলাপি এবং লাল বর্ণের এই ফল খেতে খুব সুস্বাদু। এই ফল ভিটামিন সি, মিনারেল পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ এবং ফাইবারের উৎকৃষ্ট উৎস। ড্রাগন ফল সারা বছরই চাষ করা যায়। তবে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে চারা রোপণ করলে বেশি ভালো ফল পাওয়া যায়। সব মাটিতেই ড্রাগন ফলের চাষ করা যায়। চারা রোপণে এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে ফল পাওয়া যায়। গাছে ফুল ফোটার

মাত্র ৩৫-৪০ দিনের মধ্যেই ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়। ড্রাগন ফলের বাজারমূল্য অন্যান্য ফলের তুলনায় বেশি। তাই যে কেউ এই ফলের চাষ করে খুব সহজেই লাভবান হতে পারে।

বাড়ির ছাদে টবে বা বাড়ির আঙিনার যেকোনো জায়গায় খুব সহজেই পুদিনা পাতা চাষ করা যায়। প্রায় সব ধরনের মাটিতেই পুদিনা চাষ করা যায়। টবে পুদিনা পাতা চাষ করলে অন্তত ১০ থেকে ১২ ইঞ্চি সাইজের মাটির টব বা ট্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। টবের মাটি রোদে কিছুটা শুকিয়ে গেলে এর ওপর পুদিনা পাতার কাটিং একটা একটা করে নির্দিষ্ট দূরত্বে লাগিয়ে দিতে হবে। ছায়াযুক্ত স্থানে বা ঘরের ভেতর ও টবে পুদিনা চাষ করা যায়। পুদিনা গাছের জন্য খুব বেশি আলোর প্রয়োজন হয় না। মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে পুদিনা পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে কুলি করলে উপকার পাওয়া যায়। গরমের সময় খুশকির সমস্যা নিরসনে পুদিনা পাতা চটকে গোসলের পানিতে মিশিয়ে গোসল করলে উপকার পাওয়া যায়। পুদিনার পাতা হজমশক্তি বৃদ্ধিতে কাজ করে, গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দূর করে। কোনো কারণে পেটে গ্যাস জমে গেলে পুদিনা পাতার দুই চামচ রস সামান্য লবণ ও লেবুর রসের সাথে হালকা পানি মিশিয়ে খেলে পেটে বদহজম বা গ্যাসের সমস্যা দূর হয়। পুদিনার অ্যান্টিবায়োটিক উপাদান ত্বকের যেকোনো রকম সংক্রমণ ঠেকাতে ভূমিকা রাখতে পারে। এগুলো ছাড়াও হার্টের অসুখ দূর করতে পুদিনা পাতা অনেক উপকারী, এটি রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে রাখতে সহায়তা করে। পুদিনা চাষ লাভজনক।

চুইঝাল লতাজাতীয় ভেষজ গুণসম্পন্ন গাছ। চুইয়ের বোটানিক্যাল নাম পেপার চাবা (Piper Chaba)। লতা সুযোগ পেলে ৪০ থেকে ৫০ ফুট পর্যন্ত বাড়ে। পাতা ২ থেকে ৩ ইঞ্চি লম্বা হয়। হার্টের মতো আকার। নতুন অনেকেই চুইপাতা গোলমরিচ পাতার সাথে বা পানপাতার সাথে মিলিয়ে ফেলেন। কেননা দেখতে তাদেরই মতো। পুরুষ-স্ত্রী ফুল আলাদা লতায় জন্মে। পরাগায়ন প্রাকৃতিকভাবেই সম্পন্ন হয়। ফুল লাল লম্বাটে দূর থেকে দেখতে অনেকটা মরিচের মতো। এর কাণ্ড, শিকড়, শাখা-প্রশাখা সবই মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চুই সাধারণত দুই প্রকার। একটির কাণ্ড আকারে বেশ মোটা ২০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার, অন্যটির কাণ্ড চিকন, আকারে ২.৫ থেকে ৫ সেন্টিমিটার। চুইগাছ ১০ থেকে ১৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। চুইঝাল গ্রীষ্ম অঞ্চলের লতাজাতীয় বনজ ফসল হলেও দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সব দেশে খুব ভালোভাবে জন্মে। বিশেষ করে ভারত, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড চুই চাষের জন্য উপযোগী। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, সাতক্ষীরায় চুইঝাল বেশ জনপ্রিয় এবং দেশের সিংহভাগ চুইঝাল সেখানেই আবাদ হয়। এসব এলাকায় চুইঝালের কাণ্ড, শিকড় পাতার বোঁটা রান্নার সাথে ব্যঞ্জন হিসেবে এবং ঔষধি পথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে মাংস, মাছ, ডালের সাথে মিশিয়ে রান্না করা হয়। আমাদের দেশে ফল খাওয়া হয় না। চুইঝাল ব্যবহার করলে তরকারিতে

মরিচ ব্যবহার করতে হয় না। মরিচের বিকল্প হিসেবে চুইকে ব্যবহার করা যায় অনায়াসে। এটি তরকারিতে ব্যবহার করলে তরকারির স্বাদ বেড়ে যায়। কাঁচা অবস্থায় চিবিয়েও চুই খাওয়া যায়। চুইয়ের লতাকে শুকিয়ে গুঁড়া করেও দীর্ঘদিন রাখা যায় এবং প্রয়োজনীয় বা সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যবহার করা যায়। চুই লতার শিকড়, কাণ্ড, পাতা, ফুল-ফল সব অংশই ভেষজ গুণসম্পন্ন এবং গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ পুরো গাছ উপকারী। অন্য গাছের আশ্রয় নিয়ে এরা বেড়ে ওঠে। তা ছাড়া মাটিতে লতানো ফসল হিসেবেও বেড়ে তাদের বৃদ্ধি ঘটায়। ১০ থেকে ১২ মাসের মধ্যেই লতা কাটা যায়। সাধারণ যত্নেই চুই বেড়ে ওঠে। খুব বেশি ব্যবস্থাপনা, যত্ন-আত্তির প্রয়োজন হয় না। অতি সাধারণভাবে বলতে গেলে খরচবিহীন এদের চাষ করা যায় এবং আশাতীত লাভ পাওয়া যায়। পাহাড়ি এলাকায় চুই প্রাকৃতিকভাবেই জন্মে। শুকনো এবং কাঁচা উভয় অবস্থায় চুই বিক্রি করা হয়। বর্তমানে প্রতি কেজি কাঁচা চুইঝাল অঞ্চলভেদে ৭০০ থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করা হয়।

মৌ চাষ খুব সহজেই করা যায়। এটি খুব লাভজনক। মৌ চাষের মাধ্যমে মধু আহরণে সমৃদ্ধি ও শস্য বা মধুভিত্তিক কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে সরিষা, ধনিয়া, তিল, কালিজিরা, লিচুসহ আবাদ হয় কমবেশি সাত লাখ হেক্টর জমিতে বা বাগানে। এর মাত্র ১০ শতাংশ জায়গায় মৌ বাক্স বসিয়ে মধু আহরণ করা হয়। কমবেশি ২৫ হাজার মৌ চাষিসহ মধুশিল্পে জড়িত প্রায় দুই লাখ মানুষ। উৎপাদন হয় প্রায় ছয় হাজার টন মধু। ফসলের এই পুরো সেক্টরটিকে মধু আহরণের আওতায় আনতে পারলে ফসলের উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি হবে। দেশে এখন প্রায় সাড়ে ছয় লাখ হেক্টর জমিতে সরিষা আবাদ হয়। পুরো সরিষার মাঠ মধু সংগ্রহের আওতায় আনা গেলে উৎপাদন যেমন বাড়বে, তেমনি ভোজ্য তেলের আমদানিনির্ভরতাও কমবে। মধু এখন রফতানি পণ্য তালিকায় নাম লিখিয়েছে। জাপানে আমাদের মধু রপ্তানি হচ্ছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকাই জলাবদ্ধপ্রবণ। যেখানে সাধারণত কোনো ধরনের ফসল ফলানো যায় না, এমন এলাকার জন্য সবচেয়ে ভালো হলো ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ। ভাসমান এ পদ্ধতিকে স্থানীয় ভাষায় বলে ধাপ পদ্ধতি বা বেড় পদ্ধতি। পানিতে ভাসমান বলে ভাসমান পদ্ধতি। আর কচুরিপানা টেপাপানা দিয়ে ধাপে ধাপে এ কাজটি সাজানো হয় বলে ধাপ পদ্ধতিও। বর্ষায় এসব এলাকার হাজার হাজার হেক্টর নিচু জমি জলে বন্দি থাকে। জলাবদ্ধতা আর কচুরিপানা অভিশাপ কৌশলের কারণে পরিণত হলো আশীর্বাদে। ধারণা করা হয়, পদ্ধতিটি প্রথম শুরু হয় বরিশাল অঞ্চলে। ভাসমান বীজতলায় পেঁপে, লাউ, কুমড়া, শিম, বরবটি টমেটো, বেগুন, করলা, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, সবুজ ফুলকপি, শসার চারা উৎপাদন এবং লাউ শাক, লাল শাক, পালং শাক, ডাঁটা শাক বা সাদা শাকের চাষও করা হয়। শুকনো মৌসুমে পানি সরে গেলে সেসব কচুরিপানার ধাপ জমিতে মিশে জৈব পদার্থের অতিরিক্ত জোগান দেয়। জমি হয় উর্বর। শুকনো

মৌসুমে এখানকার মানুষরা চাষ করে বোরো ফসল।

পৃথিবীর অপূর্ব সুন্দর গাছের মধ্যে নারিকেল একটি। এ গাছের ফলসহ প্রতিটি অঙ্গ ছোট-বড় শিল্পের মাধ্যমে বা সরাসরি জনজীবনে কাজে লাগে। আমাদের দেশে নারিকেলের যেসব জাতের প্রচলন আছে, তা মূলত লম্বা ও কম উৎপাদনশীল। এসব গাছে ফলন আসতে ৮ থেকে ৯ বছর সময় লাগে। পক্ষান্তরে উচ্চ ফলনশীল ওপি (খাটো) জাতের নারিকেলের ফলন আসতে সময় লাগে মাত্র ৩ থেকে ৪ বছর। ভিয়েতনাম থেকে আনা উচ্চ ফলনশীল এ নারিকেলের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। শেরপুরের নকলা উপজেলার কৃষকরা এ নারিকেল গাছ রোপণ করে বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়েছেন। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এ নারিকেল চাষ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

স্ট্রবেরি একটি সুস্বাদু ফল। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এই ফলের চাষ হয়। এখন বাংলাদেশে এই ফলের জনপ্রিয়তা ও চাষ দুটোই দিন দিন বাড়ছে। রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও পার্বত্য অঞ্চলে এ ফলের চাষ হয়। ১৯৯৬ সালে স্ট্রবেরি আগমন ঘটে বাংলাদেশে এবং ২০০৭ সাল থেকে বাণিজ্যিকি ভিত্তিতে শুরু হয়েছে এর চাষ। রাবি-১, রাবি-২ এবং রাবি-৩ নামে তিনটি স্ট্রবেরি জাত ২০০৭ সালে উদ্ভাবন করা হয়। পরে ওই বছরই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে স্ট্রবেরি চাষ শুরু হয়।

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি সেক্টর। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে পুরুষ-মহিলাদের সম্মিলিত বিনিয়োগে চলছে কৃষিকাজ। আর এর মাধ্যমে সৃষ্টি হচ্ছে দেশের এক প্রতিশ্রুত ইতিহাস আর সমৃদ্ধির হাতছানি। আমাদের জমি অনেক ভালো। আমরা সারা বছর ধরে উৎপাদন করতে পারি। আমাদের দেশের মানুষের আয় কম। একটু বেশি উৎপাদন হলে চাষি দাম পায় না। কৃষিকে প্রকৃত বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর, বাজারজাতকরণ এবং রপ্তানি এখন সময়ের দাবি। বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশ এবং সে সাথে একটি সম্ভাবনাময় বড় বাজার আছে আমাদের। অভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাময় বাজারের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতেও বাংলাদেশের প্রবেশের বিশাল সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। আর সেই সম্ভাবনা ও সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

লেখক : কৃষিবিদ

স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য চাই স্মার্ট সিটিজেন

জাহিদ ফারুক

ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছেন। এগুলো হলো স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি। সরকার বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তুলতে চায়, যেখানে প্রতিটি নাগরিকই হবে স্মার্ট। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার ধাপে ধাপে দেশের মানুষকে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে যেমন সচেতন করছে, ঠিক তেমনিভাবে বিভিন্ন সরকারি সেবাকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করে তা জনসাধারণকে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে তাদের অভ্যস্ত করে তুলছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের পর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া এবং ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করে। এ সময় সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এমডিজি এবং প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৪ সালে তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের পর দেশের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্তি, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করে। একই সাথে জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো, নারীর ক্ষমতায়ন বাস্তবায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মোট ১০টি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির সামনে চারটি মাইলফলক দিয়েছেন। এর প্রথমটি হলো, ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প, যা ইতিমধ্যে অনেকাংশে অর্জিত হয়েছে, দ্বিতীয়টি ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, তৃতীয়টি ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং চতুর্থটি হচ্ছে, ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়ন। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত একটি উন্নত বাংলাদেশ। নাগরিকদের মাথাপিছু আয় হবে ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলারেরও বেশি। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগামী দুই দশকে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ, ব্যবসায়িক চর্চা এবং কর্মক্ষমতা অর্জনের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসবে। এই ধারাবাহিক পরিবর্তনের সুফল সমাজের সকল স্তরের মানুষ পাবে।

আগামী দুই দশকে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে ৯.০২ শতাংশ। প্রবৃদ্ধির এই পথ অনুসরণ করে বাংলাদেশ ২০৩১ সালে হবে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ। ২০৪১

সালে বাংলাদেশের সম্ভব্য জনসংখ্যা হবে ২১৩ মিলিয়ন। সবচেয়ে দারিদ্র্য মানুষ যাদের দৈনিক আয় হবে ৩.২ ডলার। আপাতদৃষ্টিতে এগুলোকে অসম্ভব মনে হতে পারে। কিন্তু এই অসম্ভব কাজটিকে সম্ভব করার জন্য সরকার একটি রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে। রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শহরের সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গ্রামে পৌঁছনো, দক্ষ জ্বালানি ও অবকাঠামো, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি ইত্যাদি কৌশলগত কাজ ধাপে ধাপে পরিকল্পনামাফিক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সুশাসনের চারটি স্তম্ভ, গণতন্ত্রীকরণ, বিকেন্দ্রীকরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির রূপকল্প-২০৪১ অর্জনের প্রধান এজেন্ডা হবে। ভিশন-২০৪১ বর্তমান থেকে দুই দশকেরও কম দূরে। আমরা অনেক কিছু অর্জন করেছি কিন্তু আমরা এখনো আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে অনেক দূরে। আমাদের সেখানে সফলভাবে পৌঁছানোর আগে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। এই চলার পথে আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি সহজীকরণ থেকে শুরু করে, ডিজিটাল অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা, ডিজিটাল অনুশীলনকে উৎসাহিত করা এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে প্রযুক্তির আলোর আওতায় আনার মাধ্যমে তাদের জীবনকে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে a2r প্রোগ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। এ কাজটি সহজ ছিল না। বছরের পর বছর এবং বহু দশক ধরে চলা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিগুলোর জায়গায় নতুন পদ্ধতিগুলো জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে নানা ধরনের সচেতনতামূলক প্রচার করতে হয়েছে। জনগণকে পুরাতন অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করার জন্য সরকার নানাভাবে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তাদের সুবিধা-অসুবিধাগুলো তুলে ধরে প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে জনগণের মাইন্ড সেট পরিবর্তন ছিল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরিতে প্রথম প্রয়োজন স্মার্ট সিটিজেন। স্মার্ট সিটিজেনকে প্রথমেই সরকারি-বেসরকারি সকল ডিজিটাল সেবায় অভ্যস্ত হতে হবে। চলমান প্রযুক্তি এবং ভবিষ্যতে যেসব প্রযুক্তি আমাদের সামনে আসবে, যদিও সেগুলো সম্পর্কে আমাদের তেমন ধারণা নেই। সেগুলোও সাদরে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের এই পৃথিবীর সব কিছুই দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ তথ্য-উপাত্তে সব সময় আপগ্রেড থাকতে হবে। নতুবা পিছিয়ে পড়তে হবে। আমাদের অবশ্যই সমৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিতে দক্ষ হতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না সব সময় নতুন প্রযুক্তির সাথে নতুন চ্যালেঞ্জও আসে। এসব চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে নাগরিকদের। এককথায় বলতে গেলে স্মার্ট সিটিজেন অর্থ হলো আইসিটি সক্ষম সিটিজেন, যারা উন্নত মানবসম্পদ। সরকার স্মার্ট সিটিজেন তৈরির লক্ষ্যে দেশে শতভাগ দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত

করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকার ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে 'ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে'তে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। সরকার দক্ষ ও ডিজিটাল কর্মী বাহিনী এবং প্রযুক্তি সমর্থিত ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিবছর পাঁচ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী স্নাতক পাস করছে, যার মধ্যে পঁচাত্তর হাজারেরও বেশি তথ্য-প্রযুক্তি সক্ষম পেশাদার হিসেবে প্রশিক্ষিত।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যপূরণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। সরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট, ভার্চুয়াল বাস্তবতা, রোবোটিকস অ্যান্ড বিগ ডাটা সমর্থিত ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে কাজ করছে। শিল্পাঞ্চলে ফাইভ-জি সেবা প্রদান করার পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করছে সরকার। ২০২৪-এর মধ্যে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করতে যাচ্ছে সরকার। ইতিমধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সুবিধা দেশবাসী পাচ্ছে। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত 3.4 K GBPS ব্যান্ডউইথ ক্ষমতা অর্জন করছে। এ বছরের জুন-জুলাই মাস নাগাদ ব্যান্ডউইথের ক্ষমতা 7.2K GBPS-এ উন্নীত করার চেষ্টা করছে সরকার। তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করা হলে এটি 13.2 GBPS-এ উন্নীত হবে। সরকার ইতিমধ্যে সৌদি আরব, ফ্রান্স, মালয়েশিয়া ও ভারতকে ব্যান্ডউইথ লিজ দেওয়ার মাধ্যমে ৪.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বহুমুখী কার্যক্ষমতাসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সারা দেশে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ৯ লাখ ৫৬ হাজার ২৯৮ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে, যা জনগণ ও সরকারি অফিসগুলোতে উচ্চগতির ইন্টারনেট সরবরাহ করছে। প্রতিটি ইউনিয়নে ১০ গিগাবাইট ক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

উচ্চ অর্থনৈতিক ঘনত্বের কারণে শহরমুখী মানুষের শ্রোতকে ঠেকানোর জন্য শহরের সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'আমার গ্রাম আমার শহর' নীতি গ্রহণ করেছে। উন্নত দেশগুলোর মতো ২০৪১ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ শহরে বসবাস করবে। সরকার ঢাকাকেন্দ্রিক নগরায়ণের পরিবর্তে অনেক নগরকেন্দ্রের সুষম উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে একটি অবিশ্বাস্য পদ্ধতিগত মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রচলিত ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তরের পথ ধরেই এই পরিবর্তন ঘটছে।

আমরা এখন ২০২০ থেকে ২০৩০-এর দশকে দিকে এগিয়ে চলছি। এই দশকের প্রথম দুই বছরে করোনা অতিমারি মোকাবিলা করে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে যখন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছি ঠিক তখনই অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের সামনে এলো ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। এই যুদ্ধ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের অগ্রসরমাণ অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তবে আসার কথা হলো, পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে অনেক ভালো আছে। এ সব

কিছু মোকাবিলা করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। দক্ষ নেতৃত্বে এক দশকের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ এখন ডিজিটাল জাতিতে পরিণত হয়েছে, যা বিশ্ববাসীর কাছে এক বিস্ময় এবং রোল মডেল। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী দুই দশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। এটা কোনো দূরবর্তী স্বপ্ন নয়, এটাই আমাদের লক্ষ্য। আর লক্ষ্য বাস্তবায়নে ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে, হচ্ছে, এবং হবে স্মার্ট সিটিজেন। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। আমাদের স্মার্ট প্রজন্মের হাত ধরেই তৈরি হবে ২০৪১-এর ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত স্মার্ট বাংলাদেশ।

লেখক : সাবেক শিক্ষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Noise Pollution and its Probable Impacts on Public Health in Dhaka City

Dr. Sharmeen Jahan

Noise is a "loud and unpleasant" sound that exceeds the acceptable level and creates Annoyance. With urbanization and increasing human activities, the problem of noise pollution in Dhaka, the capital city of Bangladesh, is worsening day by day. Along with water and air pollution, noise pollution has also become a hazard to the quality of life. Noise pollution is a subtle killer. Even a relatively low noise level affects human health adversely. In Dhaka, the average sound level is 80-110dB in prime areas such as Farmgate, Karwan Bazar, Shahbagh, Gabtoli, and Mohakhali Bus Terminal, says the study report. This is almost twice the maximum noise level that can be tolerated by humans – 60dB – without suffering a gradual loss of hearing, according to the World Health Organization (*WHO*).

UN Environment Program (*UNEP, 2022*) report declared Dhaka the world's noisiest city. Against the permissible limits of 55 decibels as set by the WHO, the noise levels in Dhaka were found to be at least twice that, at 110-132 decibels.75% of noise pollution in Dhaka originates from vehicles. According to the WHO, around 5% of the world's population is facing several kinds of health hazards due to complexities related to noise pollution. Around 11.7% of the population in Bangladesh has lost their hearing due to noise pollution, says the Department of Environment (DoE) study, which was conducted in order to check noise pollution, the government has introduced Bangladesh Sound Pollution (Control) Rules, 2006. According to the guidelines, exceeding the maximum noise level in a certain area is a punishable offense.

Also, using a stone breaker machine in a residential area is prohibited, and a permit from the DoE is required to organize any social or religious event that could generate loud noise in a residential area. However, the rules have never been properly implemented anywhere in the country, the study has found. The department of environment occasionally monitors traffic and industrial noise pollution. The major sources of noise pollution in urban areas are traffic and loud horns. The DoE found that in Dhaka, 500-1,000 vehicles honk at the same time when stuck in traffic. Other causes of noise pollution include loud music during social, political, and religious programs, construction work, and factory noise.

It may cause hypertension, disrupt sleep, and/or hinder cognitive development in children. The effects of excessive noise could be so severe that either there is a permanent loss of hearing and memory or a psychiatric disorder. Besides, World Health Organization identified many other adverse effects of long exposure to moderate-level noise or sudden exposure to excessive noise. Due to the environmentalist 17th International Congress on Sound and Vibration (ICSV17), Cairo, Egypt, 18-22 July 2010 movements in different countries, some remarkable initiatives have been taken to check the noise level. For example, the USA has established sites where human-caused noise pollution is not tolerated. Similarly, the European Union prepared 'noise maps' of big cities. The laws of the Netherlands do not permit the construction of houses in areas where 24-hour average noise levels exceed 50dB. In Great Britain and India, the Noise Act empowers the local authorities to confiscate noisy equipment and take legal action against people who create excessive noise at night. Several countries are also investing in newer technology, which can curtail noise pollution. It is reported that most of the dwellers of Dhaka city are not aware of the ill effects of noise pollution. They even do not consider noise a pollutant and take it as a part of routine life. The environmentalist movements here are also not much serious about noise pollution. However, it has been recognized as a pollutant in some recent studies. In Bangladesh, a set of guidelines for regulation and control of noise and for establishing "silent zones" around educational and medical institutions has been formulated in Bangladesh Environment Conservation Act, of 1995. Bangladesh High Court gave a ruling on 27 March 2002 banning hydraulic and all sorts of excessively noisy horns in vehicles. In a gazette notification in 2006, the ministry of environment and forest affairs empowered the authorities to confiscate noisy equipment or vehicle and fine people guilty of causing noise pollution.

Maximum noise levels in different areas

Areas	**Maximum noise level (dB)**
Sensitive areas (Education, Hospital, Mosque)	40-50
Residential Zones	45-55
Mixed areas	60-70
Commercial areas	65-70
Industrial areas	70-75

Source: Bangladesh Noise Pollution (Control) Rules, 2006.

Measured Noise Levels in Some Sensitive Areas of Dhaka

Location (Inside the facility)	Measured noise level average (dB)	
	Morning	Afternoon
Eden Mohila College	69	67
Udayan School	57	55
Willes Little Flower School and College	66	69
Motijheel Ideal School and College	77	72
Curzon Hall (Dhaka University)	87	77
Dhaka medical college hospital	89	91
Bangabandhu Sheikh Mojib Medical College Hospital	90	95
Ever care Hospital	55	53
Ramna park	57	54

Source: Field survey, 2022

According to table, it can be observed that the sensitive areas have a maximum sound level of 95 dB in Bangabandhu Sheikh Mojib Medical College Hospital followed by Dhaka medical college hospital, Curzon Hall (Dhaka University), Motijheel Ideal School and College, Willes Little Flower School and College, Eden Mohila College, Udayan School, Ever care Hospital, Ramna park. A significantly high amount can cause health issues such as hearing and sleeping problems, and cardiovascular problems/ heart problems.

Effects of noise pollution on Traffic police, Driver

Sex	**Traffic police**			**Driver**		
Age, Yrs.	Below 30	30-40	40-50	Below 30	30-40	40-50
Respondent (total) 297	25	73	52	35	77	35
Loses of attention and performance	10 (40%)	23(32%)	7(13%)	14(40%)	23(29%)	8(23%)
Insomnia. Stress-related illness	3(12%)	11(15%)	15(29%)	7(20%)	11(14%)	5(14%)
High blood pressure	2(8%)	12(16%)	10(19%)	3(8%)	16(21%)	7(20%)

Sex	Traffic police			Driver		
Hearing and Sleeping disturbance	6(24%)	17(23%)	7(13%)	8(23%)	19(25%)	8(23%)
Annoyance and Aggression	3(12%)	7(10%)	8(16%)	2(6%)	6(8%)	3(8%)
Cardiovascular problems/ Heart problems	1(4%)	3(4%)	5(10%)	1(3%)	2(3%)	4(12%)

Source: Field survey, 2022

The World Health Organization (*WHO)* has documented seven categories of adverse health effects of noise pollution on humans which are: hearing loss, interference in speech communication, sleep disturbance, cardiovascular and physiological effects, mental health disturbance, impaired task performance, negative social behavior and, annoyance. These are grouped into 6 groups as shown in these Tables. The respondents are asked to choose the kind of problem he/she is facing due to noise pollution. The identified most dominant problems caused by noise pollution are loss of attention and performance in study or job and bad temper/annoyance, hearing, and sleeping disturbance. Both are, in fact, interrelated. It is difficult for a disturbed mind to concentrate on a job and perform properly.

Significantly, among the traffic police, drivers interviewed, almost all of both said that hearing loss, interference in speech communication, sleep disturbance, mental health disturbance, negative social behavior and annoyance. They face a family crisis. About 9% of traffic police are at risk of permanent hearing loss, while 20% are suffering from temporary hearing problems due to acute noise pollution. About 10 % of drivers are at risk of permanent hearing loss, 17% are suffering from temporary hearing problems, 7% high blood pressure due to acute noise

The survey indicates that the noise pollution level is perceived to be high all day long and the principal source of noise pollution is vehicle horns. It also reveals that noise results in reduced efficiency and causes annoyance or bad temper, interference in speech communication, sleeplessness, etc. Nowadays people are becoming more aware of noise pollution's bad impacts and the significance of noise pollution control. However, this much awareness is not enough to make them proactive in taking steps to abate the problem.

Recommendations

* Make a conscious effort, and/or instruct your drivers, to honk as little as possible. *Work with others in your neighborhood (home/ office) to control noise pollution. Post a sign banning honking, and ask those who work outside to help enforce it. If a special source of noise is present-such as a shop selling music, or a brick-breaking machine –approach the owner as a group, and demand that the noise be reduced. *Ban industrial activity in urban areas. This would have a double benefit: reduce both noise and air pollution.*Visit neighborhood schools, and give the teachers and students leaflets about noise pollution and the need to reduce it.*Work with media, or personally write a letter or article, about noise pollution. Stress the damages it causes, the need to reduce it through our own actions, and the importance of having strong noise pollution laws, to make Dhaka a more livable city.*Try to get a local camera or cable TV station to air ads for free or with minimal cost, on the importance of action to reduce noise pollution.

Writer: (Ph.D. in Air Quality in Bangladesh), Assistant Prof., Department of Geography & Environment, Eden Mohila College, Dhaka

শিক্ষাব্যবস্থায় পরিকল্পিত উন্নয়ন ও গুণগত মান : সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

১৯৭১ সালের আগ পর্যন্ত আমরা কোনো জাতীয় শিক্ষানীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সুযোগ পাইনি। পাকিস্তান সরকার প্রাথমিক শিক্ষারও দায়িত্ব নেয়নি। প্রাথমিক শিক্ষকরা অতিসামান্য সরকারি অনুদান পেত। যা কোনো শিক্ষকের বেঁচে থাকার জন্য মোটেও বিবেচনা করা যায় না। তখন পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বেশির ভাগ কলেজই ছিল বেসরকারি। সরকারি অনুদান সেগুলোতেও তেমন একটা ছিল না। এমনকি মাদ্রাসা শিক্ষাতেও সরকারের আর্থিক বরাদ্দ উল্লেখ করার মতো ছিল না।

মুক্তিযুদ্ধের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে প্রায় ৩৮ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল সরকারি করেন। তখন আমাদের দেশটি ছিল একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। রাষ্ট্র পুনর্গঠনে যে অর্থের প্রয়োজন ছিল তা আমাদের হাতে ছিল না। তার পরও বঙ্গবন্ধু একটি জাতি-রাষ্ট্র গঠনে শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যে তিনি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে দেন। কমিশনের সদস্যবৃন্দ ছিলেন দেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদ। তাঁরা বিশ্ববাস্তবতার অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে বাংলাদেশকে একটি জাতিরাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে একটি সুদূরপ্রসারী শিক্ষা, পরিকল্পনা বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় শিক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করেন, যা আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে অন্যতম সেরা মেধার স্বাক্ষর বহন করে। সেই শিক্ষানীতি অনুযায়ী আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারলে আমাদের সকল শিশু-কিশোর অন্তত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক স্কুল শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেত, আমাদের জনগোষ্ঠীর বড় অংশ দক্ষ, কারিগরি জ্ঞানের শিক্ষা লাভ করতে পারত। শিক্ষানীতিতে জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করার সুপারিশ ছিল, দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুপারিশও ছিল। দেশপ্রেম, দক্ষতা এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সক্ষম জাতিগোষ্ঠী গঠনের ব্যবস্থা তৈরির সুচিন্তিত পরামর্শ উক্ত শিক্ষানীতিতে দেওয়া ছিল। শিক্ষানীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়নে বিশ্বের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ কীভাবে দ্রুত আধুনিক শিক্ষা লাভে সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে–তার যৌক্তিকতা ও করণীয় নির্দেশনাও প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা ছিল। বঙ্গবন্ধু উক্ত শিক্ষানীতির পরিকল্পনাকে অত্যন্ত ইতিবাচক দৃষ্টিতে নিয়ে জাতি গঠনে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশ রাষ্ট্র বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দকে যেমন হারিয়েছিল, ১৯৭২-এর সংবিধান, প্রথম

পঞ্চবার্ষিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং জাতীয় শিক্ষানীতিও বাস্তবায়নের আর সুযোগ পায়নি।

এরপর বাংলাদেশে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষা নিয়েও শুরু হয়েছে 'যার যা খুশি তাই-ই করার' নীতি। অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠতে থাকে যত্রতত্র নানা ধারার এবং ধরনের নামধারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আর কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি করা হয়নি, ফলে বেশির ভাগ অঞ্চলের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা লাভের সুযোগ রাষ্ট্রের চিন্তার বাইরে চলে যায়। আমাদের মতো দেশে জাতীয় আয়ের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ যদি প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় না করা হয় তাহলে হতদরিদ্র এবং সাধারণ পরিবারের শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব নেওয়ার মতো সক্ষমতা বেশির ভাগ পরিবারেরই থাকে না। ফলে অনেক শিশুই বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়নি, আমাদের বিরাটসংখ্যক শিশু-কিশোর শিক্ষাবঞ্চিত থেকে গেছে। কোথাও কোথাও ব্যক্তি উদ্যোগে নানা ধরনের মানহীন বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলোতে প্রশিক্ষিত শিক্ষক ছিল না। শিক্ষার দেখভাল করারও কেউ ছিল না। সেগুলোকে তখন নাম দেওয়া হয়েছিল রেজিস্টার্ড, নন-রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামগঞ্জে তখন নানা ধরনের মাদ্রাসাও গড়ে উঠতে থাকে, যেগুলোর আয়-ব্যয়ের কোনো স্থায়ী উৎস বা নীতিমালা ছিল না। শহরাঞ্চলে উঠতি ধনিকদের শিশুদের জন্য কিছু কেজি স্কুল এবং বাহারি নামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাও অনেকটাই একইভাবে অবহেলিত ছিল। ৯ জানুয়ারি ২০১৩ ২৬ হাজার ১৯৩টি নন-রেজিস্টার্ড, রেজিস্টার্ড এবং বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের ঘোষণা প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্বাধীনতার ৪২ বছর পর দ্বিতীয় বারের মতো প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৬৫ হাজার ৬২০টি প্রাথমিক সরকারি বিদ্যালয় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারই এই ব্যবস্থাটি কার্যকর করেছে। পূর্ববর্তী অন্য কোনো সরকারই প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে বিবেচনা করেনি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রতিটি উপজেলায় একাধিক মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ সরকারি করা হয়েছে, বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং অনুমোদিত আলিয়া মাদ্রাসাগুলোকে এমপিওভুক্ত করার ক্ষেত্রেও সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন প্রায় ৩০ হাজারের কাছাকাছি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হওয়ায় শিক্ষার উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক। তবে '৭৫-এর পর শিক্ষার প্রতি রাষ্ট্রের চরম অবহেলার যে অবস্থা দীর্ঘদিন বিরাজ করেছিল তার ফলে দেশে অনুমোদনহীন নানা ধারার ও মাধ্যমের, নানা ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। এটি এখন গ্রামেও প্রসারিত হয়েছে। কোনো নিয়ন্ত্রণ কোথাও প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না, তেমন উদ্যোগ জনগণের দিক থেকে পাওয়ার অবস্থানও দেশে খুব একটা নেই। শিক্ষাব্যবস্থায় দীর্ঘদিন চলে এসেছে একটি হ-য-ব-র-ল অবস্থা,

প্রায় ১৩টি উপধারার শিক্ষা গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত সর্বত্র বিরাজ করছে। শিক্ষা অনেকের কাছেই একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। আবার অনেকেই এটিকে নিয়েছে নিতান্তই তাদের চাকরি তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ হিসেবে। কোথায়, কী ধরনের, কতটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন সেটি বিবেচনায় না নিয়েই স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাবশালী অনেকেই বাহারি নামধারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য প্রচার-প্রচারণা, তদবির এবং নানা ধরনের প্রলোভন দেওয়ার বিষয়ও চলছে। অথচ প্রয়োজন ছিল দেশব্যাপী ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। যেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে সেখানেই কেবল চাহিদা মোতাবেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে চালুর ব্যবস্থা করা। কিন্তু তেমন পরিকল্পিত ব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যকর করতে দেখা যাচ্ছে না। ফলে অনেক জায়গায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, আবার অনেক জায়গায় প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকায় স্বার্থান্বেষী মহল অনুমোদনহীনভাবে নানা ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে নিজেদের আয়-উপার্জনের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার মানের কোনো বালাই থাকে না। ওই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মেধার বিকাশ নিয়ে বের হয়ে আসা শিক্ষার্থীও তেমন একটা পাওয়া যায় না। অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার কারণে মানসম্মত শিক্ষার ঘাটতি নিয়ে বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নামমাত্র চলছে। সচেতন অভিভাবকগণ নামিদামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পেছনে ছুটছেন। কিন্তু বেশির ভাগ শহরেও প্রত্যাশিত মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সে কারণে অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের চাপ বাড়ছে কতিপয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর। বাকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থী হারাচ্ছে। শিক্ষার্থীরাও মানসম্মত শিক্ষার অভাবের কারণে নিজেদের মেধার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পাচ্ছে না। বাংলাদেশে এই ধরনের আপাত পরস্পরবিরোধী একটি অবস্থা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিরাজ করতে দেখা যাচ্ছে। এমনটি গড়ে উঠেছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে, যা নিয়ন্ত্রণ করার মতো পরিবীক্ষণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো অধিদপ্তরেরই নীতি, কৌশল এবং কার্যক্রমের মধ্যে ছিল না। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনার যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা এখন বহুমাত্রিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, গোষ্ঠী এবং মহল নানাভাবে জড়িত রয়েছে। তাদের ব্যক্তিগত, ব্যাবসায়িক এবং রাজনৈতিক নানা স্বার্থও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো ধরনের পরিকল্পনা, নীতিকৌশল বাস্তবায়ন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। নানা ধরনের অপপ্রচার, গুজব, ধর্মীয় অনুভূতির অভিযোগ তুলে অনেকেই মানসম্মত শিক্ষার যেকোনো আয়োজনে বাধা প্রদানে তৎপর হতে দেখা যাচ্ছে। এটি প্রমাণ করে যে আমাদের সমাজে দীর্ঘদিন জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর না হওয়ার কারণে যে ধরনের অবাধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ ও দর্শনের মোটেও মিল নেই। শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরে এখন জেঁকে বসেছে শিক্ষার আদর্শ প্যাডাগোগি এবং জাতি গঠনে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে

তোলার বিরুদ্ধ নানা শক্তি, যারা শিক্ষাব্যবস্থায় বাণিজ্য এবং জাতি ও ধর্মীয় নানা সূক্ষ্ম ও স্থূল বিভাজন সৃষ্টিতে তৎপর। এর ফলে জাতি হিসেবে আমরা বর্তমান যুগের চাহিদা মোতাবেক শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে নিজেরাই নিজেদের বঞ্চিত করছি, পিছিয়ে পড়ছি অন্য উন্নত দেশগুলোর শিক্ষার মানের অবস্থান থেকে। আমাদের প্রতিবছর হারাতে হচ্ছে প্রচুর মেধাবী শিক্ষার্থীকে, যারা মানসম্মত শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে পাড়ি জমাতে বাধ্য হচ্ছে। দেশে এখন ইংরেজি শিক্ষার প্রতাপ এতটাই বেড়েছে যে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকার পরও শহরগুলোতে জাতীয় শিক্ষাক্রম অধিভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সমান্তরালভাবে ইংরেজি ভার্সন চালু করতে দেখা যাচ্ছে। অথচ ইংরেজি ভাষায় পাঠদানে দক্ষ শিক্ষকের অভাব সর্বত্র প্রকট হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও মানের সংকট সবর্ত্র দৃশ্যমান। এ ধরনের একটি বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা এখন দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থার অর্জন এবং সমস্যা হাত ধরাধরি করেই চলছে। জাতীয় শিক্ষানীতির অভাব এর জন্য অনেকটাই দায়ী। আমরা পরিকল্পিতভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন গড়ে তুলতে পারিনি, একইভাবে দক্ষ এবং উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগেরও ব্যবস্থা সর্বত্র দীর্ঘদিন করতে পারিনি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়ন করতেই দুই দশক পার হয়ে গিয়েছিল। গৃহীত নীতিমালাও মানসম্মত পাঠদানের জন্য মোটেও সুবিবেচিত ছিল না। সে কারণে বারবার নীতিমালায় পরিবর্তন আনতে হয়েছে। এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরে শিখন পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব সর্বত্র প্রকট হতে থাকে। শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে নানা ধরনের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা চলে এসেছে। সেসবেরও পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে। কিন্তু তাতেও খুব বেশি সুফল অর্জন করা যায়নি। শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরে কোচিং বাণিজ্য, নোটবই, গাইড বইয়ের ব্যবসা এতটাই বিস্তার লাভ করেছে যে সরকারের কোনো বাধা-নিষেধই কার্যকর করতে দেওয়া হয়নি ফলে সুফলও দেয়নি। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদগুলো নিয়ে দেশে স্বস্তির কোনো অবস্থা তৈরি করা যায়নি। এর ফলে দেশে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার চাহিদা পূরণে সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যে ধরনের ইতিবাচক ভূমিকা রাখার প্রত্যাশা করা হয়েছিল সেটিও এখন পর্যন্ত খুব বেশি অর্জন করা যায়নি। এর বাইরে রয়েছে দেশে নানা ধরনের, নানা ধারার অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেগুলো শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নানা উপসর্গ তৈরি করে রেখেছে।

এমন বাস্তবতায় মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ব্যতীত আগামী দিনের চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রতিযোগিতায় আমরা জাতিগতভাবে টিকে থাকতে পারার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। কারণ আমাদের বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই একদিকে মানহীন, অন্যদিকে সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের জন্য যে ধরনের শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন তা থেকে বেশ দূরেই আমরা অবস্থান করছি বললে

অত্যুক্তি করা হবে না। আমাদের এমনকি উচ্চশিক্ষার জন্য যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেশে রয়েছে সেগুলোরও অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। সংখ্যার দিক থেকে অনেক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও খ্যাতি অর্জনের দিকে আমাদের এসব প্রতিষ্ঠানের অবস্থান তলানিতে পড়ে গেছে। দেশে প্রয়োজনীয় গবেষণার সুযোগ বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। ফলে আমাদের উচ্চশিক্ষা অনেকটাই নামসর্বস্ব এবং বেকার বাহিনী সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। কিন্তু উন্নত দুনিয়ার মতো কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে মানসম্মত গবেষণা দ্বারা পরিচালিত করা হলে দেশে প্রতিটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই অসংখ্য গবেষক তৈরি হতে পারতেন, যাঁরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনেক বেশি ভূমিকা রাখতে পারতেন। তবে সরকারের দিক থেকে কয়েকবারই শিক্ষাক্রম, কারিগরি শিক্ষা, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতিও গৃহীত হয়েছে। সেই সময় সৃজনশীল পদ্ধতির শিক্ষাক্রম স্কুল ও মাদ্রাসা পর্যায়ে চালু হয়েছিল। তাতে কিছুটা শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা গেলেও এর গতি খুব মন্থর পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতি সরকার নতুন, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের একটি বড় ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় এবং বাস্তব দক্ষতানির্ভর শক্তি বাস্তবায়নের জন্য যুগোপযোগী বলে বিশেষজ্ঞগণ দাবি করছেন। গত বছর থেকে এর পাইলটিং শুরু হয়েছে। এ বছর এর আরো বিস্তার ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে মনে রাখার বিষয় হচ্ছে, একটি নতুন শিক্ষাক্রম দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করা মোটেও সহজ কাজ নয়। এর জন্য প্রচুর প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতার বিতরণ, শিক্ষকদের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে জরুরি। নানা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই এ ধরনের শিক্ষাক্রম পরিমার্জিত আকারে সাফল্য নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজে শিক্ষাকে প্যাডাগোগির শিক্ষণ থেকে দেখা, জানা ও বোঝার ব্যাপক ঘাটতি সংশ্লিষ্টজনদের মধ্যে রয়েছে। সে কারণে তাদের দিক থেকে নানা ধরনের বাধা প্রদান এবং সমালোচনারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এসবকে অতিক্রম করেই শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী আধুনিক এবং মানসম্মত করার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সরকার এবং জনগণকে দেশের সামগ্রিক শিক্ষার বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে গৃহীত উদ্যোগকে বাস্তবে রূপদানের জন্য একাত্ম হয়ে কাজ করতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

লেখক : শিক্ষাবিদ ও গবেষক

নিরাময় অযোগ্য রোগীদের জন্য প্যালিয়েটিভ কেয়ার

অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ

মানুষের জন্মের পর জীবনের শেষ পরিণতি হচ্ছে অবধারিত মৃত্যু। মৃত্যু অবধারিত হলেও সকল মানুষের প্রত্যাশা থাকে সে মৃত্যু যেন বেদনাহীন, যন্ত্রণাহীন, মর্যাদাপূর্ণ এবং নিরাপদ হয়। কিন্তু অনেক সময় সেটা হয়ে ওঠে না, নিরাময় অযোগ্য রোগে আক্রান্ত হয় মানুষ। ফলে শারীরিক এবং মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে মানুষ। চিকিৎসাব্যবস্থায় নিরাময় অযোগ্য জীবন সীমিত হয়ে আসা রোগীদের সর্বাত্মক পরিচর্যা প্রদানের জন্য তৈরি হয়েছে এক বিশেষ ব্যবস্থা। যার নাম প্যালিয়েটিভ কেয়ার। আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটি।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার বা প্রশমনমূলক সেবা হলো সর্বাত্মক, বহুমুখী নিয়মানুবর্তিতামূলক চিকিৎসাব্যবস্থা, যেখানে গুরুতর অসুস্থ মানুষের জন্য বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করা হয়। ক্যান্সার, ফুসফুসের যন্ত্রণা, কিডনি বৈকল্য ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা, যকৃতের রোগ বা অন্য কোনো দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য প্রশমন সেবার প্রয়োজন হয়। প্রশমনমূলক সেবা হচ্ছে নিরাময় অযোগ্য রোগীদের সবচেয়ে বড় ওষুধ। এই সেবায় রোগীদের অসহ্য যন্ত্রণার অনেকাংশে প্রশমিত হয়। নিরাময় অযোগ্য রোগীদের বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যা বা উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন–প্রচণ্ড মাথা ব্যথা বা অসহ্য যন্ত্রণা। চিকিৎসার পাশাপাশি এই সেবার মূল উদ্দেশ্য জীবনের মান বাড়ানো।

আমাদের দেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ার শব্দটি এখনো অপরিচিত। চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে যারা জড়িত, তারা ছাড়া অনেকেই এই শব্দটির সাথে অপরিচিত। প্যালিয়েটিভ মেজর পার্ট হলো ব্যথা নিরাময় করা। এর সঙ্গে আরো অনেক কিছু রয়েছে। যেমন–শ্বাসকষ্ট, খেতে না পারা এবং মানসিক সমস্যা। একজন মানুষের শেষ সময়ে এটা খুবই প্রয়োজন। এর পরও যদি রোগী মারা যায়, সেই পরিবারের জন্য যে সাপোর্ট সেটাও কিন্তু প্যালেয়েটিভ কেয়ারের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বাংলাদেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ার শুরু হয় ২০০৬ সালে। বাচ্চাদের প্যালিয়েটিভ কেয়ার দিয়ে শুরু হয়। এরপর বড় আকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যালিয়েটিভ কেয়ার শুরু হয়। এর পর থেকে সবাই এই সম্পর্কে ধারণা নিতে শুরু করে। উল্লেখ্য, শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্যালিয়েটিভ মেডিসিন বিভাগ, হোমকেয়ার ও কমিউনিটিভিত্তিক তিন ধরনের প্যালিয়েটিভ সেবা দিয়ে আসছে। ২০০৮ সাল থেকে হোম বেইসড প্যালিয়েটিভ সেবা প্রদান করা হয়। প্যালিয়েটিভ কেয়ার দল চিকিৎসা ও নার্সদের সহায়তায় বিএসএমএমইউয়ের

২০ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী নিরাময় অযোগ্য রোগীদের বাড়িতে গিয়ে হোম বেইসড প্যালিয়েটিভ সেবা প্রদান করে থাকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের এক গবেষণা দেখা গেছে, নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনা কম, এমন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে থাকাদের মধ্যে ৬০ শতাংশেরও বেশি রোগীই ক্যান্সারে আক্রান্ত। এর মাঝে বেশির ভাগ রোগীরই প্রধান লক্ষণ ছিল ব্যথা। জীবন সীমিত ও নিরাময় অযোগ্য রোগী এবং তার পরিবারের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক সেবা প্রদানের একটি সার্বিক প্রচেষ্টা প্যালিয়েটিভ কেয়ার বা প্রশমন সেবা। এটি গুরুতর বা নিরাময় অযোগ্য অসুস্থ রোগীদের জন্য এক ধরনের বিশেষ সেবা। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৬ লাখ নিরাময় অযোগ্য বা দীর্ঘমেয়াদি নানা রোগে আক্রান্ত রোগীর প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয় গবেষণায়। গবেষণায় জানানো হয়, প্যালিয়েটিভ কেয়ারে থাকাদের মধ্যে ৬২ শতাংশ রোগী চিকিৎসা বা হাসপাতাল দ্বারা রেফার হয়ে হোম কেয়ারের জন্য এসেছে। আর তাদের মধ্যে বেশির ভাগ রোগীর ক্ষেত্রেই লিম্ফিডিমা কেয়ার প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া এই রোগীদের মধ্যে মানসিক সমস্যা ও দুশ্চিন্তার লক্ষণ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। তাদের মধ্যে ১৮ শতাংশ রোগী মনোসামাজিক ও আধ্যাত্মিক সেবা পেয়েছে। গবেষণা ফলাফলে আরো বলা হয়, রোগীদের অর্ধেকেরও বেশির বয়স ৫০-৮০ বছরের মধ্যে ছিল। ৮৭ শতাংশ রোগী মহিলা। ৮৩ শতাংশ রোগী বিবাহিত। ৬৬ শতাংশ রোগী গৃহিণী/গৃহকর্তা। ৫২ শতাংশ রোগীদের জন্য চিকিৎসার খবর নিজের এবং বন্ধুদের ও পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে অর্থায়ন করা হয়।

যে কারো পরিবারে যেকোনো সদস্যেরও সেবা যেকোনো সময়ে প্রয়োজন হতে পারে। দেশের সরকার স্বাস্থ্য খাতে যথেষ্ট উন্নয়ন অর্জন করেছে। যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও মিলেছে। তথাপি প্যালিয়েটিভ কেয়ারের মতো স্বল্প ব্যয়বহুল চিকিৎসাসেবা সর্বস্তরে নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। যা করা খুবই জরুরি।

লেখক : উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

নৌ অর্থনীতি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ড. মাধব চন্দ্র রায়

জাতির পিতার জন্ম ও শৈশব কেটেছিল বাইগার নদীর তীরবর্তী তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) পাটগাতী ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। পৈতৃক বসতবাড়ি নদীর সন্নিকটবর্তী হওয়ার কারণে পারিবারিক চলাচলের অন্যতম মাধ্যম ছিল নৌপথ। সেজন্য জলজ যানবাহন বঙ্গবন্ধু পছন্দ করতেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু তদানীন্তন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় নিজ দায়িত্বে রেখেছিলেন। তিনি ভবিষ্যতে নৌ বাণিজ্য এবং এর সাথে বিশাল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সমুদ্রবন্দরগুলোর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। সদ্য স্বাধীন দেশের চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের চ্যানেলকে মাইনমুক্ত করার জন্য তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তা নিয়েছিলেন। উল্লেখ, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় চট্টগ্রাম বন্দরকে অকেজো করার জন্য এর চ্যানেলে মাইন পুঁতে রেখেছিল।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নৌ সেক্টর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নৌপথকে নিরাপদ, যাত্রীবান্ধব, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থাকে ঠেলে সাজানো হয়েছে। এ লক্ষ্যে নৌ বন্দরসমূহের আধুনিকায়ন, নৌপথ সংরক্ষণ, নৌ সহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন, নৌপথে নৌযান উদ্ধারকারী আধুনিক যন্ত্রপাতি সংবলিত জাহাজ সংগ্রহ, নৌপথের আধুনিকায়ন, দেশব্যাপী নদীর তীরভূমি রক্ষা, তীরভূমিতে পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনে মানসম্মত যাত্রীসেবা এবং নিরাপদ পণ্য পরিবহন নিশ্চিত করতে সরকারি বেসরকারি সকল কর্তৃপক্ষ আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে। আমাদের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাতের সাথে জড়িত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব এখন সকলেই অনুধাবন করতে পারছেন। সরকার উপকূলীয় সার্ভিসের সক্ষমতা বাড়াতে ইতিমধ্যে দুটি অত্যাধুনিক যাত্রীবাহী জাহাজ 'এমভি তাজউদ্দীন আহমদ' এবং 'এমভি আইভি রহমান' নৌবহরে যুক্ত করেছে। এ ছাড়া নির্মাণাধীন আরো ৩৫টি জাহাজ, যা দ্রুতই এ বহরে যুক্ত হবে। এ জাহাজগুলো চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ-হাতিয়া-বরিশাল রুটে পরিচালনার মাধ্যমে বন্ধ থাকা এ রুটটি পুনরায় চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ তো গেল সরকারি উদ্যোগ। এর পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেশে-বিদেশে নির্মিত অত্যাধুনিক নৌযান সংগ্রহ করে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পদ্মা সেতু জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের বিশেষ করে বরিশাল বিভাগের জেলাগুলোতে মানুষের দীর্ঘদিনের নৌযানে চলাচলের যে অভ্যাস গড়ে উঠেছিল, তা পরিবর্তন হয়েছে। ওই অঞ্চলের

মানুষ এখন নদীপথে যাতায়াতের চেয়ে সড়কপথে যাতায়াতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। ওই অঞ্চলে চলাচলকারী বেশ কিছু নৌযান রুট পরিবর্তন করে অন্য রুটে চলাচল করছে। অভ্যন্তরীণ যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে প্রায় ৩১৬ কিলোমিটার নৌপথ খনন করা হয়েছে। বিদ্যমান নদীসমূহের নাব্যতা রক্ষায় ২২৬ লক্ষ ঘনমিটার নৌপথ সংরক্ষণ খননকাজ করা হয়েছে। নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানীগঞ্জ, সোনাগাজী, বেতুয়া, পটুয়াখালী, গাজীপুর নতুন নদীবন্দর ঘোষণা করা হয়েছে। ৪৫৭টি ঘাট পয়েন্ট ইজারার মাধ্যমে ১০৬ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। দেশে মোট নদ-নদীর দৈর্ঘ্য কমবেশি ২৪ হাজার কিলোমিটার। এর মধ্যে ৬ হাজার কিলোমিটারে নৌযান চলাচল করতে পারে। তবে শুষ্ক মৌসুমে কমবেশি সাড়ে চার হাজার কিলোমিটারে নৌযান চলাচলের সুযোগ থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমবেশি ৩১.৫ কোটি যাত্রী এবং ৫৫৯.৪৫ লাখ মেট্রিক টন পণ্য অভ্যন্তরীণ নৌপথে পরিবহন করা হয়েছে। ২০১৯ সালে দেশে সড়ক, রেল ও নৌপথে মোট ৬ হাজার ২০১টি দুর্ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে সড়কপথে ৫ হাজার ৫১৬টি এবং নৌপথে ২০৩টি দুর্ঘটনা ঘটে। সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় ৭ হাজার ৮৫৫ জন এবং নৌ দুর্ঘটনায় মারা যায় ২০৩ জন। নৌ দুর্ঘটনায় প্রধান কারণ অন্য নৌযানের সাথে সংঘর্ষ (৫৪%), এরপর বৈরী আবহাওয়া (২৩%) বাকি ২৩ শতাংশ দুর্ঘটনার কারণ অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন, আগুন, বিস্ফোরণ এবং নৌযানে তলা ফেটে যাওয়া। এ থেকে প্রমাণিত হয় সড়কের তুলনায় নৌপথ অপেক্ষাকৃত বেশি নিরাপদ।

প্রতিবছর কমবেশি ছয় হাজার পণ্যবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ পণ্য পরিবহনে দেশের সমুদ্রবন্দরগুলোতে আসে। এসব সমুদ্রগামী জাহাজের কমবেশি ৯২ শতাংশ চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে থাকে। তবে কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে সমুদ্রগামী জাহাজগুলোর মোংলা বন্দর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর এ বন্দরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। অপেক্ষাকৃত কম সময়ে নিরাপদে পণ্য পরিবহনসহ অন্যান্য সুযোগ বৃদ্ধি এবং খরচ কম হওয়ার কারণে ব্যবসায়ীরা মোংলা বন্দর ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন। যার ফলে এ বন্দরে জাহাজের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দর ১৩৪ বছরের রেকর্ড ভেঙে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৫৮ টিই ইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও ১১ কোটি ৮১ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৬০ মেট্রিক টন কার্গো হ্যান্ডলিং করছে। এ সময়ে ৪ হাজার ২৩১টি ভেসেলস চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছে। চট্টগ্রাম বন্দরের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ। ইতিমধ্যে এ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে। টার্মিনালটি বার্ষিক ৪.৫ লাখ টিই ইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করতে সক্ষম। চট্টগ্রাম বন্দরের ইয়ার্ডসমূহের ধারণক্ষমতা ইতিমধ্যে ৪৯ হাজার ১৮ টিই ইউএস থেকে ৫৩ হাজার ৫১৮ টিই

ইউএসে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমান ও ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এবং কন্টেইনার ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৯০ হাজার ৫২১ বর্গমিটার ও ৪ হাজার টিই ইউএস ধারণক্ষমতাসম্পন্ন নিউমুরিং ওভারফ্লো কন্টেইনার ইয়ার্ড চালু হয়েছে। করোনা অতিমারির সময় বিশ্বের অনেক সমুদ্রবন্দরের হ্যান্ডলিং কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও চট্টগ্রাম বন্দর এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ ছিল না। বন্দরে কোনো জাহাজ জট ছিল না। চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবস্থাপনাগত আধুনিকায়নের ফলে বর্তমানে কন্টেইনার ডুয়েল টাইম গড়ে কমবেশি ৯ দিন এবং জাহাজের গড় অবস্থানকাল ২.৪৩ দিনে নেমে এসেছে। জেটিতে অবস্থানরত জাহাজসমূহ পর্যবেক্ষণ, নৌযানসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ এড়ানো, নিরাপদ পাইলটেজ, নিরাপত্তা নজরদারি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ৪৬.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ইতিমধ্যে ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩ হাজার ৭৫ কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে। লয়েডসের সেরা বন্দরের তালিকায় শীর্ষ ১০০ কন্টেইনার হ্যান্ডলিংকারী বন্দরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান ৬৪তম, ইতিপূর্বে এটি ছিল ৬৭তম।

বে টার্মিনাল, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরে টার্মিনাল নির্মাণের পাশাপাশি চলমান প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম বন্দর সিঙ্গাপুর বা কলম্বোর মতো ট্রানজিট পোর্ট হিসেবে সেবা দিতে সক্ষম হবে। সর্বোচ্চ আকারের মাদার ভেসেল ভিড়তে পারবে চট্টগ্রাম বন্দরে। প্রতিবেশী ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সাত অঙ্গরাজ্য, ভুটান, নেপাল, চীনের কুনমিং এবং প্রতিবেশী অন্য দেশগুলোকে সার্ভিস দেওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ বিষয়ে কাজ করছে সরকার। এসব বাস্তবায়িত হলে দেশের অর্থনীতি, জীবন-জীবিকা যেমন উপকৃত হবে, তেমনিভাবে বহির্বিশ্বে দেশের সুনামও বৃদ্ধি পাবে।

মোংলা বন্দরকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আধুনিক বন্দরে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। বর্তমানে বন্দরের নিজস্ব ৬টি জেটি, ব্যক্তিমালিকানাধীন ১১টি জেটি, ৩টি মুরিং এবং ২২টি অ্যাংকোরেজের মাধ্যমে মোট ৪২টি জাহাজ একসাথে হ্যান্ডেল করার সক্ষমতা রয়েছে। মোংলা বন্দরে বার্ষিক ১.৫ কোটি মেট্রিক টন কার্গো এবং এক লাখ টিইউজ কন্টেইনার এবং ২০ হাজার গাড়ি হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতা রয়েছে। মোংলা বন্দরের উন্নয়নের জন্য আরো ৬ হাজার ১৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। ২০২৭ সালের মধ্যে এ উন্নয়ন কার্যক্রম শেষ হবে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ৪৪০টি বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজ এ বন্দরে হ্যান্ডলিং করেছে। বন্দরটি ইতিমধ্যে লোকসান কাটিয়ে লাভের ধারায় ফিরেছে। বাংলাদেশে সমুদ্রগামী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ্যিক চাপ মোকাবিলার জন্য পায়রা বন্দর দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর হিসেবে ২০১৩ সালে যাত্রা শুরু করেছিল। এ বন্দরের আধুনিকায়নে অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। পায়রা বন্দরে এ পর্যন্ত ২৬০টিরও বেশি জাহাজ এসেছে এবং রাজস্ব আদায় হয়েছে ৬০০ কোটি টাকারও বেশি।

দেশের তিনটি সমুদ্রবন্দর দিয়ে বছরে কমবেশি ১২ কোটি মেট্রিক টন আমদানি-রপ্তানি পণ্য পরিবহন হয় সমুদ্রপথে। এসব পণ্যের সামান্য অংশই দেশীয় পতাকাবাহী জাহাজে পরিবহন করা হয়। বর্তমান অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে অর্থাৎ জুলাই, ২২ থেকে নভেম্বর, ২২ পর্যন্ত ৫ কোটি ৬৫ লাখ টন পণ্য আমদানি হয়েছে। আর এই আমদানিতে ব্যয় হয়েছে ৩ হাজার ৫৪৯ কোটি মার্কিন ডলার। ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে দেশীয় বেসরকারি খাতের কর্ণফুলী লিমিটেডের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এইচ আর লাইনসের দুটি জাহাজে ৬৬ হাজার ৩৯৬টি কন্টেইনার পরিবহন করা হয়েছে। এর বিপরীতে ভাড়া বাবদ আয় হয়েছে ১ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে কন্টেইনার পরিবহনের মাত্র ৪ শতাংশ দেশীয় জাহাজের মাধ্যমে পরিবহন করা হয় আর বাকি ৯৬ শতাংশ বিদেশি জাহাজের মাধ্যমে পরিবহন করা হয়। দেশের সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ খাতে পরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগের মাধ্যমে এ ব্যবসায় সুযোগ নিতে পারে। এতে দেশের অর্থনীতি মজবুত হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের আমদানি-রপ্তানির ৫০ শতাংশ দেশের পতাকাবাহী জাহাজে পরিবহন করা গেলে এ খাতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে, যা দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে এবং দেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাবে।

চট্টগ্রামমুখী আমদানি-রপ্তানির পণ্যবাহী মাদার ভেসেলগুলো অনেক সময় আমাদের চট্টগ্রাম বন্দরে না এসে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া বা কলম্বো বন্দরে কন্টেইনারগুলো খালাস করে, তারপর সেগুলো ফিডার জাহাজে করে বাংলাদেশের বন্দরগুলোতে আনা হয়। আবার একইভাবে দেশের বন্দর থেকে পণ্যবাহী কন্টেইনার প্রথমে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া বা কলম্বো বন্দরে নেওয়া হয়, সেখান থেকে মাদার ভেসেলে ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়। বাংলাদেশের পতাকাবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ আছে মোট ৯০টি। যার অধিকাংশই বেসরকারি কোম্পানির। এ খাতে দক্ষ জনবলের খুব অভাব রয়েছে। এই ঘাটতি পূরণ করে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যে নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে বরিশাল, রংপুর, পাবনা ও সিলেটে নির্মাণ করা হয়েছে ৪টি নতুন মেরিন একাডেমি। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দক্ষ জনবলের অভাব অনেকাংশে পূরণ হবে।

বিশ্ব নৌ বাণিজ্য অর্থনীতিতে অবদান রাখা এবং নৌ শিক্ষার প্রসারে বর্তমান সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাস্তবায়ন শুরু করেছে। বর্তমান দেশের বিশাল নৌ অর্থনীতিতে সরকারি-বেসরকারি খাতের অংশ যৎসামান্য। এই বাণিজ্যে আরো বেশি আবদান রাখার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০৪১-এর মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে সরকার বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আরো বেশি সক্রিয় করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

লেখক : উপ-সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়

মানবাধিকার সুরক্ষা ও সমুন্নতকরণের পূর্বাপর : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ড. এ কে আব্দুল মোমেন

বাংলাদেশ সম্ভবত পুরো বিশ্বেই অতুলনীয় এই অর্থে যে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে যখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নতুন সরকার গঠনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করে (২৯৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭ প্লাস ৩২ = ১৯৯টি আসন পেয়েছিল, পিপিপি পেয়েছিল ৮৬টি) তখন পাকিস্তানি সামরিক জান্তা সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের (পিপিপি) সাথে ষড়যন্ত্র শুরু করে জনগণের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ ও তাদের সিদ্ধান্তকে অবদমিত করে রাখার জন্য। পরবর্তীকালে যখন বাঙালি জাতি ন্যায়বিচার এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম শুরু করে, তখন পাকিস্তানি নিপীড়ক শাসকগোষ্ঠী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অসহায় নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শুরু করে নির্বিচার গণহত্যা। যদি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের অধিকারের কোনো মূল্য থেকে থাকে, তাহলে বাঙালি জাতিকে ৩০ লাখ শহিদ, ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি আর ১ কোটি অসহায় মানুষের শরণার্থীর জীবন বরণের মাধ্যমে সে মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে। অধিকন্তু, মোট সাড়ে সাত কোটি জনগণের ৩ কোটি মানুষকেই হতে হয়েছিল ঘরছাড়া। এ পরিমাণ চড়া মূল্য পরিশোধ করেই তবে গণতন্ত্র, ন্যায়নীতি, মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তাই আমি যখন দেখি, এই দেশের প্রত্যেকটি মানুষ মানবাধিকার, ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতার নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী তখন আমি অবাক হই না। যখন অনেকে আমাদেরকে মানবাধিকার শেখানোর জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তখন বরং আমার করুণা বোধ হয়, কারণ তাদের মধ্যে অনেকেরই রয়েছে ক্রীতদাস ব্যবসা, বর্ণবাদ, শোষণ, অত্যাচার আর নিপীড়নের সুদীর্ঘ কালো ইতিহাস।

বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার আগে ইতিহাসের পাতায় একটু ঘুরে আসা যাক। স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের যাত্রার শুরু থেকেই আওয়ামী লীগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। স্বাধীনতার ১০ মাসের মধ্যে তারা ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মতো মৌলিক নীতিসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করে। পাশাপাশি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের সাথে জড়িত

অপরাধী ও সহযোগীদেরও বিচার কার্যক্রম শুরু করে। এ সময় প্রায় ২৬ হাজার সন্দেহভাজন অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে দ্রুত বিচার কার্যক্রম শুরু করা হয়। হত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, লুটতরাজ এবং এজাতীয় অন্যান্য ঘৃণ্য অপরাধের সাথে জড়িত প্রায় ৮০০ অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করে কারাগারে পাঠানো হয়। আওয়ামী লীগ যখন দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, বাঙালি জাতির ভাগ্যে নেমে আসে '৭৫-এর ১৫ই আগস্টের কালরাত। সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যা করে। অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, অরাজকতা আর সন্ত্রাস গ্রাস করে নেয় সমগ্র জাতিকে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আর মানবাধিকার সমুন্নত রাখার দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে সদ্য স্বাধীন বাঙালি জাতিকে এরপর একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থানের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা আর মানবাধিকার সমুন্নতকরণের যে স্বপ্ন নিয়ে এই দেশ স্বাধীন হয়, বাঙালি জাতির সেই স্বপ্ন ক্রমে বিলীয়মান হতে থাকে। এই অস্থির আর অনিশ্চিত সময়কালে আমাদেরকে সামরিক, ছদ্ম-সামরিক এবং টেকনোক্র্যাট সরকারের শাসনকালের দুঃসহ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছিল। এ সময় স্বাধীন বাংলাদেশে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগের সকল অর্জন আর প্রচেষ্টাকে ভূলুণ্ঠন করা হয়। সামরিক সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া বাতিল করে সকল বন্দিকে ছেড়ে দেয়। সংবিধানকে ইচ্ছামতো সংশোধন করে এর মূলনীতিতে পরিবর্তন আনা হয়। এমনকি জাতির পিতা এবং তাঁর পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যার সাথে জড়িতদের দায়মুক্তি দিয়ে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ নামে একটি আইন প্রবর্তন করা হয়। এভাবে বহু বছর ধরে বাঙালি জাতিকে আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়। সৌভাগ্যক্রমে দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তৎকালীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী সরকার গঠন করেন। নবগঠিত সরকার ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। আওয়ামী লীগ সব সময় স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিশ্বাসী। তাই ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ হেরে গেলে তারা বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোটের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। কিন্তু বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশে সূচনা হয় সন্ত্রাস, মৌলবাদ, হত্যা, নৃশংসতা ও নিপীড়নের নতুন এক অধ্যায়। ব্রিটিশ সাংবাদিক বার্টিল লিন্টার Far Eastern Economic Review-এর ২০০২ সালের ৪ এপ্রিলে প্রকাশিত সংখ্যায় 'Bangladesh: A Cocoon of Terrorism' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। একইভাবে আরেকজন সাংবাদিক অ্যালেক্স ফেরি ২১ অক্টোবর, ২০০২ সালে টাইমস এশিয়া ম্যাগাজিনে 'Reigning the Radicals of Time' নামক নিবন্ধ লেখেন। এরপর ২০০৫ সালের ২৩ জানুয়ারি নিউ ইয়র্ক

টাইমসে প্রকাশিত হয় এলিজা গ্রিসোল্ডের 'The Next Islamic Revolution'। অধিকন্তু সুধারামাচাঁদরাম (Mixing Terror with Aid, এশিয়া টাইমস, অক্টোবর ২, ২০০৫) এবং সেলিগ হ্যারিসন (Bangladesh in a new hub of Terrorism, ওয়াশিংটন পোস্ট, ২ আগস্ট, ২০০৬) দেশে চরমপন্থার উত্থানের বর্ণনা দেন। এসব নিবন্ধে একটি বিষয়ই বারবার ফুটে উঠেছিল–জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসাম্প্রদায়িকতা, ইসলামিক মধ্যপন্থা, মানবাধিকার আর ধর্মীয় সম্প্রীতির যে নীতিসমূহকে ধারণ ও লালন করতেন, তা হতে দূরে সরে গিয়ে ক্রমেই মৌলবাদের দিকে বাংলাদেশের ঝুঁকে পড়া। আমার স্মরণে আছে 'M.B. Mecca' শিরোনামে একটি নিবন্ধের কথা। এই নিবন্ধে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়, কীভাবে বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ ছড়িয়ে পড়ছিল। নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছিল আফগানিস্তানফেরত ১০০ জন আল-কায়েদা জঙ্গি চট্টগ্রামে অবতরণ করে। বিএনপি-জামায়াত সরকারের নীরব সমর্থনে সারা দেশে ১৭০টিরও বেশি জিহাদি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ওয়াশিংটনভিত্তিক একজন সাংবাদিক আর্নল্ড ডি বোরচগ্রেভ ২০০৩ সালের মে মাসে 'Cry for Bangladesh' নামে একটি নিবন্ধ রচনা করেন, যেখানে তিনি বাংলাদেশে গড়ে ওঠা একটি 'ওসামা ফ্যান ক্লাব'-এর কথা উল্লেখ করেন, যার সদস্যরা স্লোগান দিত 'বাংলা হবে আফগান, আমরা হব তালেবান'। আমরা সেই দুঃসহ শাসনামলে অনেক জঙ্গি সন্ত্রাসীর উত্থান দেখেছি। এমনই একজন জঙ্গি সন্ত্রাসী ছিলেন সিদ্দিকুর রহমান, যিনি 'বাংলা ভাই' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বৃহত্তর রাজশাহীর অনেক জায়গায় প্রকাশ্যে পিটিয়ে মানুষকে হত্যা করে গাছ থেকে লাশ ঝুলিয়ে দিতেন। পুরো দেশব্যাপী জঙ্গিবাদ ছত্রাকের মতো মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। আদালতকক্ষে সেশন চলাকালে বোমা হামলা করে দুই বিচারপতিকে হত্যা করা হয়। জঙ্গিরা এমনকি তৎকালীন ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালায়। তিনি নিজে ভাগ্যক্রমে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর একজন সহযোগী এই হামলায় নিহত হন। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদদের নিয়মিতই আক্রমণের শিকার হতে হতো। এক দিনে বাংলাদেশের ৬৩টি জেলায় একযোগে ৪৯৫টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় জঙ্গিরা। এমনকি ও ২০০৪ সালের ২১ শে আগস্ট উগ্রবাদ ও ব্যাপক দুর্নীতির উত্থানের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের আয়োজিত সমাবেশে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য চলাকালে তাঁকে লক্ষ্য করে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মৃত্যুর মুখ থেকে ভাগ্যক্রমে ফিরে এলেও এই গ্রেনেড হামলায় ২৪ জন আওয়ামী লীগ নেতা নিহত হন এবং দলের আরো ৩৭৪ জন সদস্য গুরুতরভাবে আহত হন, যাঁদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে শারীরিক প্রতিবন্ধিতার শিকার হন।

আমি ৯/১১-এর পাঁচ বছর আগে, ৯/১১-এর পাঁচ বছর পরে–এই ১০ বছরের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ঘটনা ও এতদফলে মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে তথ্যানুসন্ধান করি।

সারণি-১ হতে দেখা যায়, ১৯৯৬-২০০১ সাল (আওয়ামী লীগ আমলে)-এ সময়ে কেবলমাত্র ৭টি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলেও ২০০১-২০০৬ সালের বিএনপি-জামায়াত আমলে এই সন্ত্রাসী ঘটনার সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৫৫৩-এ। একইভাবে ১৯৯৬-২০০১-এ সন্ত্রাসী ঘটনার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা ৫৮ থাকলেও তা ২০০১-২০০৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৭০-এ। সন্ত্রাসী কার্যকলাপের এই পরিমাণ প্রবৃদ্ধি, শুধু অত্র অঞ্চলে নয়, সমগ্র বিশ্বেই ছিল বিরল।

তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ২০০১-২০০৬ সালের বিএনপি-জামায়াত শাসনকালীন সময়কে 'সন্ত্রাস, অরাজকতা ও জঙ্গিবাদের স্বর্ণযুগ' বলা হতো। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, জঙ্গি সন্ত্রাসীদের নিন্দা করার পরিবর্তে ঢাকাস্থ মার্কিন কর্মকর্তারা সেই সময় জঙ্গিবাদ এবং জামায়াতে ইসলামী দলটির মধ্যে যেকোনো সম্পর্কের অভিযোগকে দ্রুত খারিজ করে দেয়। যাই হোক, এই ধরনের জঙ্গিবাদের ঘটনার বারবার পুনরাবৃত্তির ফলে অবশেষে মার্কিন কর্মকর্তারা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং জামায়াতে ইসলামী পার্টির অঙ্গসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

সারণি-০১

সন্ত্রাসী ঘটনা ও প্রাণহানি বৃদ্ধি

৯/১১-এর আগে এবং পরে

অঞ্চল	সন্ত্রাসী ঘটনা		মৃত্যু	
	১-২৭-১৯৯৬ হতে ৯- ১১-২০০১	৯-১২-২০০১ হতে ৭-২৭-২০০৬	১-২৭-১৯৯৬ হতে ৯- ১১-২০০১	৯-১২-২০০১ হতে ৭-২৭-২০০৬
দক্ষিণ এশিয়া	৪৬০	৪১৩৮	১৪১৬	৪৯১৯
উত্তর আমেরিকা	৬১	৬৪	২৯৮৮	৮
মধ্যপ্রাচ্য	১২৪১	৮১৮৩	৬৬০	১৫৩০৮
বাংলাদেশ	৭	৫৫৩	৫৮	৫৭০*

(তথ্যসূত্র : MIPT Terrorism Knowledge Base, ওকলাহোমা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

মানবাধিকার :

আমাদের জাতির পিতা সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের, যেখানে খাদ্যের অধিকার, বস্ত্রের অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, শিক্ষার অধিকার এবং স্বাস্থ্যসেবার অধিকার

আর ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা হবে। আপামর জনসাধারণের জন্য এই অধিকারসমূহকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ এসব লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে। এখন বাংলাদেশে কেউ অনাহারে মারা যায় না। একসময় যে মঙ্গায় উত্তরবঙ্গের কোটি কোটি মানুষ ক্ষুধার কষ্টে পীড়িত হতো, সে মঙ্গা শব্দটিকেই আমরা জাদুঘরে পাঠাতে সক্ষম হয়েছি। শেখ হাসিনার সরকার সকলের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে। ভোটার জালিয়াতি বন্ধ করতে তিনি ভোটারদের জন্য বায়োমেট্রিক নিবন্ধনসহ পিকচার আইডেন্টিফিকেশন কার্ড এবং স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ভোট প্রদান ব্যবস্থা চালু করেছে। হয়তো আমাদের অল্প কিছু ভোটকেন্দ্রে সীমিত পরিসরে সহিংসতা এবং অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন মনে করলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে নতুন করে আবার ভোট গ্রহণ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের কোথাও শতভাগ নির্ভুল ভোটগ্রহণ ব্যবস্থা নেই। তবে আমরা নির্ভুল ভোটগ্রহণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই; আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছি সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র প্রক্রিয়াটাই 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর'-এর মাধ্যমে অগ্রসর হয়। বিএনপির আমলে তারা ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার সৃষ্টি করেছিল। আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে তারা ১৯৯৬ সালে ভোটারবিহীন নির্বাচন পরিচালনা করেছে। আমাদের সৌভাগ্য যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় পদক্ষেপের কারণে সেই কালো দিনগুলো এখন অতীত। যাহোক এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও, যেখানে তারা ২৫০ বছরেরও অধিক সময় ধরে আইনের শাসন আর গণতন্ত্রের চর্চা করে আসছে, সেখানে ৭৭% রিপাবলিকান ভোটার মনে করেন যে সর্বশেষ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন 'ভোটার জালিয়াতি'-এর মাধ্যমে 'চুরি' হয়েছিল (তথ্যসূত্র : মনমাউথ ইউনিভার্সিটি পোল) এবং ৬৪% আমেরিকান বিশ্বাস করে যে মার্কিন গণতন্ত্র ব্যবস্থা 'সংকট এবং ব্যর্থতার ঝুঁকিতে রয়েছে' (তথ্যসূত্র : এনপিআর/আইপিএসওএস পোল)। তারা এটাও মনে করে যে আমেরিকান গণতন্ত্র মূলত অর্থের দ্বারা পরিচালিত হয়। বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, দেশটির আইন প্রণেতাদের ৯১%-কে বিভিন্ন ওয়াল স্ট্রিট কোম্পানি কোনো না কোনোভাবে অর্থায়ন করেছিল। এই অবস্থার তুলনায় আমরা অনেক ভালো করছি। তবে আমরা আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে চাই না। বরং আমরা আরো ভালো কিছু করতে চাই। আমরা আমাদের শাসনব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে জনসাধারণের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে চাই, যা বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বিরল।

মানবাধিকারের নীতিতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, অন্য অনেক দেশের মতো কেবলমাত্র মুখের বুলি আওড়ানোতেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের নীতি ও গৃহীত পদক্ষেপে তা প্রতিফলিত হয়। নির্বিচার গণহত্যা, নৃশংসতা ও নিপীড়নের মুখে যখন ১১ লাখ

রোহিঙ্গা নিজভূম মিয়ানমার হতে প্রাণভয়ে পালাতে বাধ্য হয়, তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এগিয়ে এসে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান করে পুরো বিশ্বকে বড় ধরনের মানবিক বিপর্যয় হতে রক্ষা করেন। যাহোক, আমি বন্ধুপ্রতিম সকল দেশের প্রতি কৃতজ্ঞ, যারা এই মানবিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে সমর্থন করে আসছে। অসহায়, নিপীড়িত রোহিঙ্গাদের জন্য অবিরাম সহায়তা প্রদান করার জন্য আমি বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করতে চাই। এই অসহায় রোহিঙ্গাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য তাদেরকে স্ব স্ব দেশে স্থানান্তর করার জন্য আমি বিশ্বের সকল দেশকে উদাত্ত আহ্বান জানাই। আমি শুনেছি, কিছু মার্কিন আইন প্রণেতা রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য অধিকতর ভালো শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আমি আপনাদের অনুভূতিকে পুরোপুরি সমর্থন করি এবং আমি প্রস্তাব করছি এই অসহায় শিশুদের আপনাদের দেশে নিয়ে তাদের জন্য আরো ভালো শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।

জোরপূর্বক অন্তর্ধান :

আমি উল্লেখ করতে চাই, জাতিসংঘের জোরপূর্বক অন্তর্ধান বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ তথাকথিত 'জোরপূর্বক অন্তর্ধান'-এর ৭৬টি কেস আমাদের নিকট প্রেরণ করেছে। আমরা বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে আমলে নিয়েছি এবং ওয়ার্কিং গ্রুপের সাথে গঠনমূলকভাবে কাজ করে যাচ্ছি। যাহোক, খোঁজখবর করে আমরা দেখতে পাই যে এই ৭৬ জনের মধ্যে দুজন বিদেশি নাগরিক রয়েছেন আর অন্যদিকে একটি কেস ২৭ বছরের বেশি পুরনো যখন কিনা আওয়ামী লীগ সরকারই ক্ষমতায় ছিল না। আমরা ইতোমধ্যে খুঁজে বের করেছি, এই তালিকার ১০ জন ব্যক্তি পুনঃ আবির্ভূত হয়েছেন। পুনঃ আবির্ভাবের এই যে ১০টি ঘটনা, সেগুলো সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী সংস্থা কর্তৃক এতদবিষয়ে মনগড়া তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এটা বরং দুর্ভাগ্যজনক যে ওয়ার্কিং গ্রুপ সঠিকভাবে যাচাই না করেই আমাদের নিকট এ ধরনের তথ্য প্রেরণ করেছে। জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের উচিত, অন্য কোনো উৎস হতে পাওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর না করে, নিজস্ব গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা করা, যাতে জাতিসংঘের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ না হয়। আমাদের বিদেশি বন্ধুদের উচিত, আরো সচেতনতা অবলম্বন করা যাতে মানবাধিকারকর্মী, নাগরিক সমাজের সদস্য বা এনজিওকর্মীর ছদ্মাবরণে কেউ রাজনৈতিক লক্ষ্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বানোয়াট তথ্য প্রদান করতে না পারে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং সুপ্রশিক্ষিত পুলিশ বাহিনী সত্ত্বেও প্রতিবছর হাজারখানেক লোক যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়া ছাড়াই ডিউটিরত পুলিশের গুলিতে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় (তথ্যসূত্র : www.statista.com) এবং প্রতিবছর প্রায় ছয় লক্ষ লোককে নিখোঁজ হিসাবে রিপোর্ট করা হয় (তথ্যসূত্র : www.statista.com)।

সারণি-২

যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের গুলিতে নিহত :

বছর	সংখ্যা
২০২১	১০৫৫
২০২০	১০২০
২০১৯	৯৯৯
২০১৮	৯৮৩
২০১৭	৯৮১

(তথ্যসূত্র : Statista Research Department, www.statista.com)

সারণি-৩

যুক্তরাষ্ট্রে নিখোঁজ ব্যক্তির সংখ্যা :

National Crime Information Center (NCIC) ডাটাবেইস অনুযায়ী :

বছর	সংখ্যা
২০২১	৫,২১,৭০৫
২০২০	৫,৪৩,০১৮
২০১৯	৬,০৯,২৭৫
২০১৮	৬,১২,৮৪৬
২০১৭	৬,৫১,২২৬

(তথ্যসূত্র : www.statista.com; দ্রষ্টব্য : একজন ব্যক্তিকে নিখোঁজ বলে মনে করা হয়, যখন তিনি অদৃশ্য হয়ে যান এবং এবং তাঁর অবস্থান অজানা থাকে। নিখোঁজ বলে বিবেচিত একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায়ও অন্তরালে চলে যেতে পারেন।)

সম্প্রতি যুক্তরাজ্য মানবাধিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে বাংলাদেশে 'ধর্ষণ ও ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স'-এর সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বিষয়টি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ফলশ্রুতিতে আমি কিছু তথ্যানুসন্ধান করে নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান খুঁজে পাই :

সারণি-৪

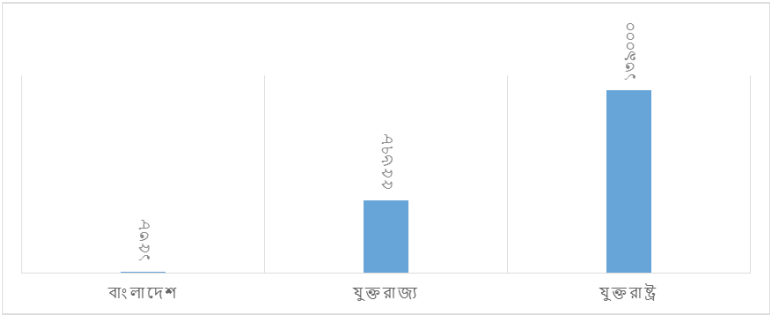

২০২০ সালে বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণের ঘটনার সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র

(তথ্যসূত্র : Statista.com; sharenet-Bangladesh.org)

২০২০ সালে কোভিড চলাকালীন সময়, বাংলাদেশে মোট ১৫৩৮টি ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া যায়, যেখানে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা ছিল যথাক্রমে ৫৫,৬৭৮ এবং ১,৩৯,০০০। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, যুক্তরাজ্যের মোট জনসংখ্যা মাত্র ৬৭ মিলিয়ন, যা বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও কম (১৬৫ মিলিয়ন)। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা বাংলাদেশের দ্বিগুণ। দেখা যায়, মোট জনসংখ্যা এবং ধর্ষণের সংখ্যা বিবেচনা নিলেও যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা অতি নগণ্য।

তথাপি বাংলাদেশ সরকার ধর্ষণ ও নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার ইতোমধ্যে নতুন আইন প্রণয়ন করেছে যাতে ধর্ষণের অপরাধে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। যাহোক নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকাবিলায় আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা আত্মতুষ্টিতে ভুগতে চাই না। বরং নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা দমন সব সময় আমাদের বিচারব্যবস্থা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য অগ্রাধিকার হিসেবে বজায় থাকবে।

দেশের গণতান্ত্রিক পরিসর ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের কিছু বন্ধুর ‘উদ্বেগ’-এর বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই। আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে এবং স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার সরকার শুধুমাত্র জনগণের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। কোনো বাহ্যিক হস্তক্ষেপ বা অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র আমাদের এই লক্ষ্য হতে বিচ্যুত করতে পারবে না। বাংলাদেশে সব সময়ই অত্যন্ত

অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়ে আসছে। এই দেশে এমন নির্বাচন খুব কমই হয়েছে, যেখানে ৭২%-এর নিচে ভোট পড়েছে। এই তুলনায় বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ভোট ৩৫% থেকে ৬০%-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং গড় ভোট থাকে প্রায় ৪৫%-এর মতো, যা বাংলাদেশের ৭২% ভোটের চেয়ে অনেক কম।

পরিশেষে, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং পূর্বপরিচয় নির্বিশেষে প্রতিটি জীবনই সমানভাবে মূল্যবান। জাতিসংঘে বাংলাদেশ শান্তির সংস্কৃতিকে সমুন্নত করে চলেছে। শান্তির সংস্কৃতির মূল উপাদান হচ্ছে সহিষ্ণু মানসিকতা গড়ে তোলা-ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা পূর্বপরিচয় নির্বিশেষে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধার মানসিকতা লালন করা। আমরা যদি সকলের মাঝে এই মানসিকতা গড়ে তুলতে পারি, তাহলে পৃথিবী হতে ঘৃণার বিষ হ্রাস পাবে এবং সহিংসতা কমে যাবে, যার ফলে সারা বিশ্বেই টেকসই শান্তি বিরাজ করবে। মানবাধিকার সুরক্ষা এবং সমুন্নতকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাবই কেবল পারে বিশ্বের সকল মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে।

লেখক : সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

To Ensure Public Access to Information

Dr. Iman Ali

The Constitution of the People's Republic of Bangladesh recognizes freedom of thought conscience and speech as one of the fundamental rights of citizens and the right to information is an integral part of it. All power of the Republic belong to the people, and it is necessary to ensure right to information for the empowerment of the people. If the right to information of the people is ensured, the transparency and accountability of all public, autonomous and statutory organisations and of other private institutions constituted or run by government or foreign financing shall increase, corruption the same shall decrease and good governance of the same shall be established. There is a saying 'information is an integral driving force of our daily life'. There is no area left where there is an option to deny importance of this information

Now we will try to find out what is information. The Right to Information Act 2009 says about information, "information includes any memo, book, design, map, contract, data, log book, order, notification, document, sample, letter, report, accounts, project proposal, photograph, audio, video, drawing, painting, film, any instrument done through electronic process, machine readable record, and any other documentary material regardless of its physical form or characteristics, and any copy thereof in relation to the constitution, structure and official activities of any authority.

What is Right to Information and why it is needed? The right to information is generally known as the right to information which is helpful in attaining the political, economic and social rights of common people, the lack of which creates obstacles in attaining these rights, hinders of the citizen's participation in the national decision - making process. The field of rights to information is created primarily due to various legal and illegal measures to withhold information. The Right to Information Act is people- friendly law.This law is ensures that the government is accountable to the people. Information shall not be withheld under any pretext or the provision of all information except the information mentioned in section 7 of the Act shall be mandatory.

Under the Act, the Government officers can give information freely, as the Act has given them courage to provide information. Every authority has appointed designated officers at most levels of government structures. Authorities are now proactive to set up information desks, displaying citizens' charter, duty rosters,informing about allocation. Simultaneously, demand side community people can now have the courage to ask for information and make the authority accountable if they are not happy with their performances and can challenge authority if they are deprived from basic services. This is such an Act that has created a platform through which people from all walks of life and communities can now access their desired and necessary information, which are favorable for them. However it is important to note that the key factor of the Right to Information Act is to promote and lead to the good governance of the country. There is a close link between Right to Information and Good governance. Good governance is the vehicle for sustainable development. Right to information is related to indicators of good governance. Ensuring people's security, citizen's participation in national decision- making, best use of people's property for the development of the country. Ensuring the basic rights of citizens, transparency and accountability in governance. Ensuring right to information has a positive impact on good governance.

Some NGOs are adding their utmost efforts for individual incentive of accessing information by using Right to Information Act.Section 6 of the RTI Act ensures that every authority should publish and publicize all information related to any executed or proposed activities and decisions in such a manner which can easily be accessible to the citizens. In 2017 the Information Commission introduced Online RTI Application and Tracking System which received much appreciation from different stakeholders.

The Information Commission has been playing an important role in ensuring the people's right to information. Even at the beginning of the Corona crisis, the Commission adopted virtual hearing process. At that time, no party had to appear before the Commission in person. The countries of the world known by people as corruption free countries are oriented towards human welfare. RTI Act can play an important role to ensuring the rights of the most backward and deprived people in the society. Through the implementation of the RTI Act, it will be possible to make Bangladesh a welfare state by making people aware.

Writer: Educationist

রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে জিআই পণ্যের ভূমিকা

মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

২০১৯ সালের কোভিড অতিমারির কারণে দেশে দেশে যে তীব্র অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি হয় তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে। এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু। বাংলাদেশের বিকাশমান অর্থনীতিতে এর যে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল তন্মধ্যে অন্যতম ছিল বৈদেশিক মুদ্রার সন্তোষজনক রিজার্ভের পরিমাণ কমে যাওয়া। কারণ ছিল আশানুরূপ রেমিট্যান্স না আসা, রপ্তানি আয় কমে যাওয়া এবং ডলারের চাহিদা হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়া। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে এই ডলার সংকট হ্রাস পেলেও তা সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত না হওয়ায় সরকার প্রচলিত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। জিআই (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) বা ভৌগোলিক নির্দেশনামূলক পণ্য তদ্রূপ অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য।

কোনো দেশের জিআই পণ্য দেশটির সাদৃশ্যহীন গুণাবলিসম্পন্ন যথা–জলবায়ু, মাটি, সংস্কৃতি, সামাজিক প্রথা, উৎপাদনের বিশেষ প্রক্রিয়া ও দক্ষতা এমনকি বংশপরম্পরায়া পেশাগত ঐতিহ্যের সমাহার, যা স্থানীয় অধিবাসী এবং পণ্যটির মধ্য এক গভীর যোগসূত্র স্থাপন করে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে জিআই পণ্য মেধাসম্পদ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় এটি কোনো দেশের মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়ার অংশ। এভাবে ট্রেড মার্কসের মতো জিআইও একটি ব্র্যান্ড, যা কোনো ক্রেতার সুনির্দিষ্ট চাহিদা বা স্বাদ পূরণ করার ক্ষেত্রে একটি উপযোগী পণ্য হিসেবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাজারে এমনকি স্থানীয় বাজারেও ইলিশ মাছ বেচাকেনা হয়। তবে পদ্মার ইলিশের যে স্বাদ তা বাংলাদেশের ইলিশ। বিশেষ এই প্রজাতির মাছের উৎপাদন পদ্মা অববাহিকায় মিঠা পানিতে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইলিশ নামকরণ হলেই শুধু ভোক্তাগণ এই সুস্বাদু মাছ খেতে সমর্থ হন। এশীয় দেশসমূহের জন্য বাণিজ্যভিত্তিক এই বাস্তবতা সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর ছিল না। তবে সাম্প্রতিককালে এই ভৌগোলিক নির্দেশনা পণ্যেসমূহের সুরক্ষায় স্থানীয়ভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। এখন পর্যন্ত ভারতে কৃষি, খাদ্য, অলংকার আসবাবপত্র শাখার ২ শতাধিক পণ্য নিবন্ধিত হয়েছে জিআই পণ্য হিসেবে, যেখানে বাংলাদেশে এই সংখ্যা মাত্র ১১টি।

তবে একটি গবেষণায় দেখা যায়, খাদ্যসামগ্রী, হস্তশিল্প, তাঁতবস্ত্র সম্পর্কিত দেশের প্রায় ৭৩টি পণ্যই নিজস্বতা থাকায় তা নিবন্ধনের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নিবন্ধিত জিআই পণ্য হচ্ছে জামদানি, ইলিশ, ক্ষীরশাপাতি আম,

বিজয়পুরের সাদা মাটি, দিনাজপুরের কাটারিভোগ চাল, কালিজিরা, রংপুরের শতরঞ্জি, রাজশাহী সিল্ক, মসলিন ও ফজলি আম। ২০১৬ সালে জামদানি শাড়ি প্রথম এই স্বীকৃতি পায়। সর্বশেষ ২০২২ সালে এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে বাগদা চিংড়ি এবং ফজলি আম।

মেধাসম্পদের আওতাভুক্ত হওয়ায় জিআই পণ্য কতিপয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন এবং নির্দেশনার আওতায় চিহ্নিত হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ হচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, ট্রিপস এবং উইপোভুক্ত কতিপয় চুক্তি। এভাবে জিআই পণ্যের ক্ষেত্রে যেকোনো জটিলতা বা মালিকানা নির্ধারণে আন্তর্জাতিক সংস্থা বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরুপ, বাসমতী চালের মালিকানা নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের স্বত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব বিষয়ক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল প্রোপার্টি রাইটস অর্গানাইজেশনের উইপো (WIPO)। উইপোর নিয়ম মেনে বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পেটেন্টস, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্ক বিভাগ (ডিপিডিটি) এই মেধাস্বত্ব স্বীকৃতি ও সনদ দিয়ে থাকে।

কোনো পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেলে বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডিং করা সহজ হয়। এ পণ্যগুলোর আলাদা কদর থাকে। কিন্তু বাংলাদেশি পণ্যগুলোর এখনো কোনো বড় সাফল্য বা এ সকল পণ্যের রপ্তানি বাড়েনি। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার পর এসব পণ্যের রপ্তানি বাড়াতে চেষ্টা চলছে। এখনো অর্থনীতিতে বড় অবদান না রাখলেও এগুলো নিয়ে অনেক সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। স্বীকৃতি পাওয়ার পর এসব পণ্য উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোরও পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের। অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি এ সকল পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের পরিচয় তুলে ধরবে বলেও মনে করেন তাঁরা।

এটি স্বীকার্য যে বাংলাদেশ জিআই অ্যাক্ট এবং জিআই বিধিমালা জারির পর বহু পুরনো ও নিজস্ব পণ্যগুলো সুরক্ষার সুযোগ অবারিত হয়েছে। নিজ দেশের পাশাপাশি অন্য কোনো দেশের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার শর্তে সে দেশেও রপ্তানির সুযোগ ঘটে। তবে একটি দীর্ঘ পথপরিক্রমায় জিআই অ্যাক্ট, ২০১৩ জারি করা একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। কেননা শুধু জিআই অ্যাক্ট জারির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী পণ্যটির সুরক্ষা সম্ভব নয় এর জন্য সম্ভাব্য সকল পণ্য চিহ্নিত করে জিআইভুক্ত করতে হবে। এ জন্য বহুল প্রচার ও গবেষণার মাধ্যমে জিআই নিবন্ধনের গুরুত্ব প্রদানে সংশ্লিষ্ট মহলকে সচেতন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, জিআই পণ্যের কার্যকর বিপণনে একক বা যৌথ উৎপাদনের উভয় ক্ষেত্রেই মার্কেট শেয়ারের জন্য বিপণন পরিকল্পনা অপরিহার্য। জিআই পদ্ধতির অনুসরণে আন্তর্জাতিক বাজার বাস্তবতা, সময়, এবং ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে যথার্থ বিপণন পরিকল্পনা গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। তন্মধ্যে পণ্য পৃথক্করণ, ভোক্তা আচরণ, ভ্যালু চেইন, সমন্বিত বাজার ব্যবস্থা বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। নতুন যেকোনো

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই এ সকল বাজার প্রভাবকারী উপাদানসমূহের পর্যালোচনা অত্যাবশ্যক।

তৃতীয়ত, জিআই পণ্য উৎপাদকগণ মধ্যস্বত্বভোগীদের নেতিবাচক আচরণের শিকার। সরবরাহ চেইনের এই চ্যালেঞ্জ থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী পণ্যের মর্যাদা রক্ষা ও উৎপাদক শ্রেণিকে উৎসাহিত করার জন্য সমগ্র জিআই পদ্ধতির পক্ষে কার্যকর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা জরুরি। এভাবে দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের জিআই পণ্য বিপণনের জন্য এ খাতের সার্বিক পর্যালোচনাভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণের বিকল্প নেই।

যেহেতু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় জিআই পণ্যের স্বীকৃতি পাওয়া গিয়েছে সে কারণে রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে সরকারের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির অংশ হিসেবে এ সকল পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট মহলকে এগিয়ে আসতে হবে।

লেখক : সাবেক পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব

ড. নাজনীন সিদ্দিকী

এই শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশের সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার মানুষ। ২০২২ সালের জুনে এই জেলা দুটির অধিকাংশ মানুষ বন্যার পানিতে আটকা পড়ে। এই দুই জেলায় প্রায় ৩০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মানুষকে উদ্ধারে সিলেট এবং সুনামগঞ্জের আটটি উপজেলায় সেনাবাহিনী নামানো হয়েছিল। বন্যার পানিতে তলিয়ে সুনামগঞ্জ শহর পুরো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। জেলার ৭০ হাজারের মতো মানুষ ২২০টি আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছিল। সিলেটে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বন্যার পানি প্রবেশ করায় ফ্লাইট ওঠানামা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ওসমানী হাসপাতালে নিচের তলায় পানি ওঠায় চিকিৎসা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছিল। রোগীসহ সকল কার্যক্রম উপরের তলায় সরিয়ে নিতে হয়েছিল। বন্যার কারণে রেলস্টেশনের কার্যক্রম বন্ধ হয়েছিল। বিদ্যুৎবিভ্রাট ও টেলিযোগাযোগ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে সকল প্রকার যোগাযোগব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। গত এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে দেশের অধিকাংশ জেলার ওপর দিয়ে তীব্র থেকে মাঝারি তাপদাহ বয়ে যায়। তাপমাত্রা ৪০ থেকে ৪২ ডিগ্রির আশপাশে, কিন্তু অনুভূত হচ্ছিল ৪৫ ডিগ্রির ওপরে। এ সবই ঘটছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে।

এই শতাব্দীতে নতুন কিছু পাওয়ার আশায় পৃথিবীর মানুষ। কালের পরিক্রমায় মানুষের এমন চাহিদা অমূলক নয়। কিন্তু সব চাহিদাকে পাশ কাটিয়ে একটি খবরে সরব পৃথিবী। চারদিকে একটাই আলোচনা, একটাই কথা–'জলবায়ু পরিবর্তন'। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে হুমকির সম্মুখীন আজ সারা বিশ্ব। এই হুমকি মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার কোনো বিকল্প নেই, এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, সবাইকে একযোগে দাঁড়াতে হবে বিপর্যয় রুখতে। বর্তমানে বাংলাদেশ বৈশ্বিক কার্বন নির্গমনে ০.৫৬ শতাংশ অবদান রাখে, তবু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমাদের দেশের ক্ষতির অনুপাত অপ্রতিরোধ্য। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উপকূলীয় ক্ষয়, খরা, তাপ এবং বন্যা–সবই আমাদের অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। আমাদের অবকাঠামো এবং কৃষিশিল্প ধ্বংস হচ্ছে, কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষয়ক্ষতি এবং ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ, হ্রাস ও মোকাবিলায় যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে আমাদের। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মানবসৃষ্ট উষ্ণায়নের কারণে আমাদের জিডিপি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং গড় আয় ২১০০ সালে ৯০ শতাংশ কম হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। আন্ত

সরকারি প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে ধারণা করা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্য প্রায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। জলবায়ু তার নিজ অবস্থানে স্থির থাকে না। এটা সর্বদা পরিবর্তনশীল। তাহলে এটা নিয়ে এত মাতামাতি কেন? মাতামাতির কারণ রয়েছে। বিশ্ব জলবায়ুর স্বাভাবিক পরিবর্তন এখন আর দেখা যাচ্ছে না। পরিবর্তনের মাত্রা খুব বেশি। জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকির ক্ষেত্রে বংলাদেশ সম্পর্কে আশঙ্কা দেশের বৃহৎ অংশ কোনো একসময় সমুদ্রের গর্ভে হারিয়ে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনকে ঘিরে বাংলাদেশ সম্পর্কে এ সংকটের আশঙ্কা অমূলক নয়। তাই ভয়াবহ বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়ার আগেই প্রয়োজন প্রতিরোধ।

আমরা যে পরিবেশে বাস করি, সেই পরিবেশের প্রতিটি মুহূর্ত অনন্য। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিবর্তিত হতে থাকে সেই পরিবেশের অবস্থা। যেমন : কখনো যদি রোদের তীব্রতা দেখতে পাই তো আবার কখনো মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। এভাবে শীত, বৃষ্টি, গরম, ঝড় প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলের অবস্থা পরিবেশকে অনন্য করে তোলে। জলবায়ু হলো দৈনন্দিন আবহাওয়ার দীর্ঘদিনের সাধারণ অবস্থা, গড় আবহাওয়া নয়। জলবায়ুর উপাদানগুলো হলো তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ু, মেঘ, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, বায়ুচাপ প্রভৃতি। একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক অবস্থা ওই দেশের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর চারটি উপাদান যথা : বায়ুর চাপ, বায়ুর তাপ, বায়ুর আর্দ্রতা ও অধঃক্ষেপণ, ঝড়ঝঞ্ঝা। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠে যে চাপ প্রয়োগ করে, তাই বায়ুর চাপ। সমুদ্র সমতলে বায়ুর চাপের পরিমাণ প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ১৪.৭ পাউন্ড। ৪৫ অক্ষাংশের সমুদ্র সমতলে ব্যারোমিটারে এর মাপ ২৯.৯২ ইঞ্চি। সমুদ্রে বায়ুমণ্ডলের ওজন প্রায় ৫ হাজার ৬০০ ট্রিলিয়ন টন। এই বায়রু চাপ পরিবতির্ত হয়ে থাকে বেশ কয়েকটি কারণে, এর মধ্যে অন্যতম তাপ। উষ্ণতার তারতম্যের কারণে বায়ুর চাপ পরিবর্তিত হয়। জলবায়ুর এ উপাদানগুলো পরিবর্তনের কিছু নিয়ামক আছে। সূর্যের কৌণিক অবস্থান জলবায়ুর অন্যতম নিয়ামক। তির্যকভাবে সূর্য আলো দিলে বেশি বায়ুমণ্ডল ভেদ করতে হয়; কিন্তু লম্বভাবে সূর্য কিরণ দিলে তা অনেক বেশি প্রখর হয়, যা বায়ুর তাপের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে থাকে। তাছাড়া ভূপৃষ্ঠের ৭০.৮ শতাংশ পানি এবং ২৯.২ শতাংশ স্থল। সূর্যের তাপ পানির ৬০০ ফুট পর্যন্ত এবং স্থলভাগে ৬০ ফুট পর্যন্ত পৌঁছে। ফলে পানি অনেক বেশি উত্তপ্ত হয় এবং এই উত্তপ্ত পানি এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গেলে সেই অঞ্চলে উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। বায়ুপ্রবাহও জলবায়ুর অন্যতম নিয়ামক, উষ্ণ স্থানের বায়ু শীত অঞ্চলে গেলে সেই অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। আবার শীত অঞ্চলের বায়ু উষ্ণ অঞ্চলে গেলে সেই অঞ্চলের বায়ু শীতল হয়ে ওঠে। এভাবে এ বিষয়গুলো দ্বারা জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর জলবায়ু যে পরিবর্তিত হচ্ছে, এ বিষয়ে আগে কোনো ধারণাই ছিল না। যখন জানা গেল পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি

পাচ্ছে তখন থেকেই মানুষের দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি প্রথম ধরা পড়ে ১৮ এবং ১৯ শতকে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আমরা প্রথম সতর্কতা সংকেত পাই গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে যখন হাওয়াইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিমাপ করা হয় এবং এর পরবর্তী দশকে সেখানে আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিমাপ করা হয়। সেই পরিমাপে দেখা যায়, ক্রমান্বয়ে পৃথিবীতে কাবর্ন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ধারণাটি আমাদের মাঝে তখন থেকেই তৈরি হয়।

প্রকৃতির ওপর মানুষের নির্যাতনের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন দেখা যায়। প্রাকৃতিক কারণে জলবায়ু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হলেও মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ু খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানবসৃষ্ট কারণকেই মূল কারণ হিসেবে দেখা হয়। মানুষ যে জলবায়ু পরিবর্তন করছে, এ বিষয়ে বেশ শক্ত প্রমাণ আছে। আর এ প্রক্রিয়াটি মানুষ সম্পাদন করছে গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপাদনের মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং মিথেনের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপাদন করে। শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী ১৫০ বছরের বেশি সময় ধরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ক্রমাগত অধিক হারে শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ বিভিন্ন গ্যাস নির্গমনের ফলে বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ বেড়ে চলেছে, যার জন্য দায়ী মানুষই। কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি, জমি ব্যবহারে পরিবর্তন, বৃক্ষনিধন, বন উজাড়, জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, মিথেন গ্যাস নির্গমন, কৃষি প্রভৃতি কারণে জলবায়ু পরিবর্তিত হয় (Climate change challenge)। এ ছাড়া নদীর নাব্যতা হ্রাস, পানিদূষণ, শব্দদূষণ, তেলদূষণও জলবায়ু পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া ওজোন স্তর ধীরে ধীরে ক্ষয়ে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে প্রবেশে সাহায্য করে থাকে। অতি বেগুনি রশ্মি পৃথিবীর পরিবেশকে নষ্ট তথা জীবের বসবাসের অনুকূল পরিবেশ নষ্ট করে থাকে। এ পরিস্থিতি জলবায়ু পরিবর্তন করে থাকে। কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইড মূলত বৃদ্ধি পায় অতিরিক্ত শিল্প-কারখানা বৃদ্ধি, গাড়ি, ইটভাটা, নগরায়নের বিভিন্ন উপকরণ (যেমন : কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনকারী বিভিন্ন যন্ত্রাংশ) প্রভৃতি কারণে।

এ ছাড়া রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ পোড়ানোর কারণে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়। এই রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থগুলো উৎপন্ন হয় বিভিন্ন শিল্প-কারখানা থেকে। যেখানে থাকে মানুষের চরম অর্থলালসা। জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হলো মানুষকে সচেতন করা। জলবায়ু পরিবতির্ত হয়, এমন কাজ না করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে সচেতন করা। তবেই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি প্রশমনের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমানো সম্ভব হবে।

লেখক : যুগ্ম সচিব, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়

ভিশন-২০৪১

মোস্তফা মোর্শেদ

স্বপ্নদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার পথে দৃপ্তপদে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ পর পর দু'বার স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের সকল শর্ত পূরণ করার মাধ্যমে ২০২৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে চলছে। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে, ২০৩১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার ইতিমধ্যে ভিশন-২০৪১ ঘোষণা করেছে।

বিগত এক যুগেরও বেশি সময়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে। যার সুফল দেশবাসী পাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ হাত ধরে এখন স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণ এগিয়ে চলছে। টেকসই উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সাথে সাথে উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র্য হ্রাস পাওয়ায় মানুষের জীবন বদলে যাচ্ছে। ২০১৫ সালে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উন্নত হওয়ার পর বাংলাদেশ ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নত হওয়ার পথে রয়েছে। দেশের মানুষের গড় আয়ু, মাথাপিছু আয়, সাক্ষরতার হার, মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণ ইত্যাদিতে লক্ষণীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন ২০৩১ সালে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার ২০৩১-এর মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ২০৪১-এর মধ্যে দারিদ্র্যকে ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে এনে দেশকে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদায় পৌঁছানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

২০২২ সালের প্রথম দিকে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যকার সংকট আমাদের দেশের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ বৈশ্বিক সংকটে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল ও খাদ্যপণ্যের সরবরাহের সাথে সাথে মূল্যের অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদেরও সমস্যায় ফেলেছে। অতিমারির ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ আমাদের উন্নয়নের ধারাকে কিছুটা হলেও বাধা সৃষ্টি করেছে। সরকার ঘোষিত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর প্রধান দুটি ভিশন হলো বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হবে, যেখানে মাথাপিছু আয় হবে বর্তমান বাজারমূল্যে সাড়ে ১২ হাজার মার্কিন ডলারের বেশি এবং তা ডিজিটাল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে এবং দারিদ্র্য ও ক্ষুধা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হবে। এ লক্ষ্যে সরকার দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে। আইসিটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে এ কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে ৩ মিলিয়ন অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষ্য পূরণ করতে হলে বাংলাদেশকে চাকরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি

করতে হবে। গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মৌসুমি বেকারত্ব রোধে 'কাজের জন্য খাদ্য', 'গ্রামীণ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসৃজন' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এগুলোর আওতা সম্প্রসারণের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরবরাহের দিক থেকে দেশে নতুন শ্রমশক্তি প্রতিবছর ২.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে, এটা জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় যথেষ্ট বেশি।

সরকার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১২.৩ শতাংশ এবং চরম দারিদ্র্যের হার ৪.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করে কাজ শুরু করছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনার লক্ষ্যে কাজ করছে। বিভিন্ন রকম আর্থিক নগদ সহায়তা হস্তান্তরে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সুবিধাভোগীর জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে জিটুপি পদ্ধতিতে সুবিধাভোগীদের সরাসরি নগদ অর্থপ্রদান করা হচ্ছে। দেশের সবচেয়ে দরিদ্রতম ২৬২টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্তকরণের মধ্য দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি এবং পল্লি অঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনাবাদি জমিতে ফসল চাষের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এক টুকরাও জমি যাতে অনাবাদি না থাকে সে জন্য সবাইকে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। শহরের সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পর্যায়ক্রমে গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'আমার গ্রাম, আমার শহর' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রযুক্তি ও ফসলের জাত উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থায় আধুনিকায়নের মাধ্যমে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও টেকসই আধুনিক কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সরকার এ খাতে ভর্তুকি, প্রণোদনা ও পুনর্বাসনের সহায়তা দিচ্ছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে সরকার কৃষি যন্ত্রপাতি ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ হারে ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের প্রদান করছে। জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে মাছ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং অচিরেই দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হবে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে মাংসের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণিজ পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার স্বাস্থ্য খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি প্রদানের মাধ্যমে একটি সুস্থ ও উৎপাদনশীল জনসংখ্যা তৈরি করা। মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিশোর-কিশোরীদের সঠিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র কিশোরবান্ধব স্বাস্থ্য কর্নারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সরকার শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। শিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নয়ন, শিক্ষায় বৈষম্য দূরকরণসহ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য অবকাঠামো উন্নয়নসহ সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। সরকার

অর্থনীতির ডিজিটাইজেশনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে, কারণ ডিজিটাইজেশন শুধু প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং সুশাসনই নিশ্চিত করে না বরং উপকরণের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে। ডিজিটাল অর্থনীতিতে সকল ব্যাবসায়িক কর্মকাণ্ড তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্বাহ করা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প পাঁচটি ভাগে ভাগ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এগুলো হলো সংযোগ এবং অবকাঠামো, ই-গভর্নমেন্ট, মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইসিটি শিল্পের প্রসার এবং আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন। সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে আইসিটি খাতে রপ্তানি ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে কাজ করে যাচ্ছে। একটি ক্যাশবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

ভিশন-২০২১-এর অর্জিত সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে সরকার ভিশন-২০৪১ ঘোষণা করছে। ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের সকল ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদের বিকাশ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পুষ্টি বৈষম্য দূরীকরণ এবং টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য।

লেখক : শিক্ষাবিদ ও গবেষক

মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র

অনুপম হায়াৎ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের গৌরব ও সৌরভের সমাচারবাহী। এই যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত হয়েছে হাজার হাজার কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, শিল্পকলা ও চলচ্চিত্র। এসব শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বিধৃত হয়েছে বাঙালির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও বিজয়ের মহৎ লাবণ্য গ্রন্থিত উৎসার। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র এবং তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মিত হয় ১৯৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা এবং পাকিস্তান বাহিনীর হত্যা, খুন, নৃশংসতা, লুণ্ঠন শুরুর পরপরই চলচ্চিত্র শিল্পী-কলাকুশলীরা কলকাতায় আশ্রয় নেন। ওখানে জহির রায়হানের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'স্বাধীন বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলী সমিতি'। এই প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনায় ও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রকর্মীদের সহায়তায় প্রাথমিক পর্যায়ে চারটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হয়। এগুলো হচ্ছে জহির রায়হান পরিচালিত 'স্টপ জেনোসাইড', 'এ স্টেট ইজ বর্ণ', আলমগীর কবির পরিচালিত 'লিবারেশন ফাইটার্স' ও বাবুল চৌধুরী পরিচালিত 'ইনোসেন্ট মিলিয়নস'। এসব প্রামাণ্যচিত্রে বিধৃত হয়েছে পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা, ১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের আন্দোলন-সংগ্রাম, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ ও শরণার্থীদের দুঃখ-কষ্ট। এই প্রামাণ্যচিত্রগুলোর নামকরণ করা হয় 'জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র'। এই চারটি প্রামাণ্যচিত্রই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র। এগুলো প্রদর্শিত হয় মুক্তাঙ্গনে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। এসব চিত্র নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান বাহিনীর নৃশংসতা রেকর্ড করা, বিশ্ববিবেককে নাড়া দেওয়া এবং বাঙালির শৌর্যবীর্য ও প্রতিরোধকে অগ্রায়ন করা।

১৯৭১ সালে বহু বিদেশি চলচ্চিত্রকার, টিভি টিমও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চিত্র নির্মাণ করেছে এবং শুটিং করেছে। মার্কিন নির্মাতা লিয়ার লেভিনের তোলা এমনি শুটিংকৃত দৃশ্য পরবর্তীকালে সংগ্রহ করে তারেক মাসুদ নির্মাণ করেছেন প্রামাণ্যচিত্র 'মুক্তির গান' (১৯৯৫)। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে গঠিত চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পরিচালক ছিলেন আব্দুল জব্বার খান। এই দপ্তরের উদ্যোগেও চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। তবে তা হারিয়ে গেছে।

দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র নির্মাণের হিড়িক পড়ে যায়। ১৯৭২ সালে মুক্তি পায় প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র চাষী নজরুল

ইসলামের 'ওরা ১১ জন'। এতে বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফা ও মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টরের চেতনাকে প্রতীকী করা হয়েছে। ছবির ১১টি মুক্তিযোদ্ধার চরিত্রই বাস্তবের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অভিনয় করানো হয়েছে। চাষী নজরুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পরে আরো কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এসবের মধ্যে রয়েছে 'সংগ্রাম' (১৯৭৪), 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৯৭), 'মেঘের পরে মেঘ' (২০০৪), 'ধ্রুবতারা' (২০০৬)। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অন্যান্য কাহিনিচিত্রের মধ্যে রয়েছে সুভাষ দত্তের 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী' (১৯৭২), মমতাজ আলীর 'রক্তাক্ত বাংলা' (১৯৭২), আনন্দের 'বাঘা বাঙালী' (১৯৭২), আলমগীর কবিরের 'ধীরে বহে মেঘনা' (১৯৭৩), আলমগীর কুমকুমের 'আমার জন্মভূমি' (১৯৭৩), খান আতাউর রহমানের 'আবার তোরা মানুষ হ' (১৯৭৩), মিতার 'আলোর মিছিল' (১৯৭৪), হারুনর রশীদের 'মেঘের অনেক রং' (১৯৭৬), শহীদুল হক খানের 'কলমীলতা' (১৯৮১), নাসির উদ্দীন ইউসুফের 'একাত্তরের যীশু' (১৯৯৩) ও 'গেরিলা' (২০১১), হুমায়ূন আহমেদের 'আগুনের পরশমণি' (১৯৯৫) ও 'শ্যামল ছায়া' (২০০৪), কাজী হায়াতের 'সিপাহী' (১৯৯৪) ও 'জয় বাংলা' (২০২২), শামীম আখতারের 'ইতিহাস কথা' (২০০০), 'শিলালিপি' (২০০২) ও 'রীনা ব্রাউন', তৌকীর আহমেদের 'জয়যাত্রা' (২০০৪), খিজির হায়াতের 'অস্তিত্বে আমার দেশ' (২০০৭), মোরশেদুল ইসলামের 'খেলাঘর', 'আমার বন্ধু রাশেদ' (২০১১), 'অনীল বাগচীর একদিন' (২০১৫), তানভীর মোকাম্মেলের 'নদীর নাম মধুমতী' (১৯৯৭), 'রাবেয়া', 'জীবনঢুলী' (২০১৪), 'রূপসা নদীর বাঁকে', জাহিদুর রহিম অঞ্জনের 'মেঘমল্লার', মাসুদ পথিকের 'নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ' ও 'মায়া- দি লস্ট মাদার, রিয়াজুল মাওলা রিজুর 'বাপজানের বায়োস্কোপ' (২০১৫), নূরুল আলম আতিকের 'লাল মোরগের ঝুঁটি' (২০২১) প্রভৃতি।

অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্রও (এক ঘণ্টার কম) তৈরি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্যচিত্র নির্মাণ করেন মোরশেদুল ইসলাম 'আগামী' (১৯৮৪) নামে। তিনি পরে নির্মাণ করেন 'সূচনা' (১৯৮৮), 'শরৎ ৭১' (২০০০)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্বল্পদৈর্ঘ্যচিত্রের মধ্যে রয়েছে মোস্তফা কামালের 'প্রত্যাবর্তন' (১৯৮৬), জামিউর রহমান লেমনের 'ছাড়পত্র' (১৯৮৮), হাবিবুল ইসলাম হাবিবের 'বঘাটে' (১৯৮৯), খান আখতার হোসেনের 'দুরন্ত' (১৯৮৯), এনায়েত করিম বাবুলের 'পতাকা' (১৯৮৯), দিলদার হোসেনের 'একজন মুক্তিযোদ্ধা' (১৯৯০), আবু সায়ীদের 'ধূসর যাত্রা' (১৯৯২), হারুনর রশীদের 'গৌরব' (১৯৯৮), ছটকু আহমেদের 'মুক্তিযুদ্ধ ও জীবন' (২০০৭), দেবাশীষ সরকারের 'শোভনের একাত্তর' (২০০০), কবরী সারওয়ারের 'একাত্তরের মিছিল' (২০০১), মান্নান হীরার 'একাত্তরের রং-পেন্সিল' (২০০১), রহমান মুস্তাফিজের 'হৃদয়গাথা' (২০০২), সৈয়দ রেজাউর রহমানের 'যন্ত্রণার জঠরে সূর্যোদয়' (২০০৪), তারেক মাসুদের 'নরসুন্দর' (২০১১) প্রভৃতি। এসব চলচ্চিত্র দৈর্ঘ্যে

স্বল্প হলেও বিষয়ের মাহাত্ম্যে অনেক বড়, আমাদের জাতীয় চেতনা, মুক্তিসংগ্রাম ও ইতিহাসের স্বর্ণখণ্ড।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অসংখ্য প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হয় স্বাধীনতার পর। এসবের মধ্যে রয়েছে আলমগীর কবিরের 'ডায়েরিজ অব বাংলাদেশ' (১৯৭২), 'প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' (১৯৭২), ডিএফপির 'মুক্তিযোদ্ধা' (১৯৭৬), সৈয়দ শামসুল হকের '৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ' (১৯৮৩, ১৯৮৪ ও ১৯৮৫), ইয়াসমীন কবিরের 'স্বাধীনতা' (২০০০), চাষী নজরুল ইসলামের 'কামালপুরের মুক্তিযুদ্ধ' (২০০১), সাজ্জাদ জহিরের 'মৃত্যুজয়ী' (২০০১), কাওসার চৌধুরীর 'সেই রাতের কথা বলতে এসেছি' (২০০১), তানভীর মোকাম্মেলের 'তাজউদ্দীনের নিসঙ্গ সারথী' (২০০৭) ও '১৯৭১' (২০১১), লুৎফুন্নার মৌসুমীর 'অন্য মুক্তিযোদ্ধা' (২০০৭), পলাশ বকুলের 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (২০১০), ফখরুল আরেফীন খানের 'আলবদর' (২০১১), কাওসার মাহমুদ ও সজল খালেদের 'একাত্তরের শব্দসৈনিক' (২০১২), প্রকাশ রায়ের 'বাংলাদেশ : একটি পতাকার জন্ম' (২০১৪), আজাদ কালামের 'বিরহগাথা' (২০১০), শবনম ফেরদৌসীর 'জন্ম সাথী' (২০১৩), মানজারে হাসীনের 'এখনো একাত্তর' (২০১৬), ফরিদ আহমেদের 'লাল সবুজের দীপাবলী' (২০১৭), আমিরুল হকের 'অপারেশন জ্যাকপট' (২০১৭), 'পাহাড়ে মুক্তিযুদ্ধ' (২০১৭) প্রভৃতি।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণের সহায়তার জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর, অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে। এজন্য নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কার্যক্রম। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এ ক্ষেত্রে বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করেছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিবছরই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র ও কাহিনিচিত্র নির্মাণ করছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনুদান নীতিমালায়ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আলাদা কোটা রয়েছে। এ ছাড়া উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র ও নিদর্শন সংগ্রহ, রেকর্ড ও সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। এ সবই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, ত্যাগ ও গৌরবকে সমুন্নত রাখা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের শুভ প্রচেষ্টা।

চলচ্চিত্র হচ্ছে প্রত্যক্ষ গণমাধ্যম। এই মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের নির্মাণ, উপস্থাপন, পরিবেশন, প্রদর্শন যত বেশি হবে, ততই মঙ্গল। মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম স্বাধীনতার আগে মহীয়ান ও বলীয়ান হয়ে দেশ-রাষ্ট্র-সমাজ-সংস্কৃতি ও উন্নয়নে অবদান রাখবে, এটাই কাম্য।

লেখক : চলচ্চিত্র গবেষক ও শিক্ষক

বিপন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছ চাষে সাফল্য

ড. রশিদ করিম

দেশীয় মাছ প্রাণিজ পুষ্টির প্রধান উৎস। দেশীয় মাছ অন্য মাছের তুলনায় অনেক সুস্বাদু। এসব মাছের চাহিদা সব সময় বেশি থাকে। কিন্তু অতিআহরণ, জলজ বিপর্যয়সহ নানা কারণে আমাদের অনেক প্রজাতির মাছ আজ বিলুপ্তপ্রায়। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য নিরসন, গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন হতে হবে। গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন আমাদের জলাশয়গুলোকে ভরাট করে ফেলেছে। ফলে দেশীয় মাছের উৎপাদন অনেক কমে গেছে। এ ছাড়া ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গিয়ে অপ্রয়োজনীয় কীটনাশকের যত্রতত্র ব্যবহারের ফলে দেশীয় মাছের উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। দুঃখের বিষয় হলো, অনেক প্রজাতির দেশীয় মাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যা আর আমাদের গ্রামের হাট-বাজারে দেখা যায় না।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা ও নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দেশের মিঠাপানির মৎস্যসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনেক মৌলিক ও প্রয়োগিক গবেষণা পরিচালনা করেছে। গ্রামীণ জনপদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় স্বল্প ব্যয়ে অপেক্ষাকৃত কম শ্রমনির্ভর এবং পরিবেশ উপযোগী অধিক ফলনশীল সুস্বাদু উন্নত জাতের মাছ চাষের কৌশল উদ্ভাবন করছে। অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ভাবিত এ সকল প্রযুক্তি প্রান্তিক পর্যায়ের অগ্রসরমাণ চাষিদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাদের নানা রকম প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে হাতে-কলমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ের মৎস্য চাষিরা মাছের জাত উন্নয়ন, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল আয়ত্ত করে দেশীয় মিঠাপানির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর ময়মনসিংহে অবস্থিত। জলজ পরিবেশ ও মৎস্যসম্পদের প্রকৃতি বিবেচনায় ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ৫টি কেন্দ্র এবং ৫টি উপকেন্দ্র থেকে পরিচিত হয়ে থাকে। এগুলো হলো স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর, নোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এবং চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট। এ ছাড়া উপকেন্দ্র ৫টি হচ্ছে নদী উপকেন্দ্র, রাঙামাটি, প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র, সান্তাহার,

বগুড়া, স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, যশোর, নদী উপকেন্দ্র, কলাপাড়া, পটুয়াখালী এবং স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী। ইনস্টিটিউট দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করে এ পর্যন্ত মোট ৭৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে। আইইউসিএন ২০১৫ সালে তাদের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে আমাদের দেশে ২৬০ প্রজাতির মিঠাপানির মাছের মধ্যে ৬৪ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তপ্রায়। এসব মাছকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার্থে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে ইতিমধ্যে ৩৭ প্রজাতির দেশীয় মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। গত এক যুগে দেশীয় মাছের উৎপাদন কমবেশি চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এসব মাছের প্রাপ্যতা সাম্প্রতিককালে অপেক্ষাকৃত অন্যান্য বছরের চেয়ে বাজারে বেশি দেখা যাচ্ছে। ইনস্টিটিউট গত এক বছরের মধ্যে দারকিনা, কাকিলা, শোল, তিতপুঁটি, নারকেলি, চেলা, ঢেলা, রানী, বাতাসি, রয়না, বাটিয়া পুঁটিয়া ইত্যাদি মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করছে।

মিঠাপানির দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় যেসব মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে তাদের মধ্যে শোল মাছ অন্যতম। আমাদের দেশে এই সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন মাছটি খুব জনপ্রিয় হওয়ার এর চাহিদাও প্রচুর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই মাছটি মুরেল, জিওল ও সেœকহেড নামে পরিচিত। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রথমবারের মতো কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে শোল (Channa striata) মাছের পোনা উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, এ মাছের প্রজনন মৌসুমে, অর্থাৎ এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ডিম দিলেও গ্রীষ্মকালে বেশি ডিম দেয়। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছটির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় মাছটি এখন প্রান্তিক পর্যায়ের চাষিদের চাষের আওতায় চলে আসবে। কাকিলা (Xenentodon cancila) মাছটি একসময় আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। কিন্তু জলবায়ুর প্রভাব, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং মানুষ্যসৃষ্ট নানা কারণে বাসস্থান ও প্রজননক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এ মাছের প্রাচুর্যতা ব্যাপকহারে হ্রাস পেয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর এ মাছের প্রজনন মৌসুম হলেও আগস্ট মাসে এরা বেশি ডিম দেয়। এ মাছটির কৃত্রিম প্রজনন কৌশল ইতিমধ্যে উদ্ভাবিত হওয়ায় এটি এখন চাষের আওতায় আনা সম্ভব হবে। বিলুপ্তপ্রায় তিতপুঁটি (Pethia ticto) একসময় আমাদের দেশের হাওর-বাঁওড়, নদীনালা, খালবিলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের কাছে মাছটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি, ভিটামিন, মিনারেল ও খনিজ লবণের চাহিদা এই মাছটির মাধ্যমে পূরণ হতো। মাছটির প্রজননকাল মে থেকে আগস্ট, তবে সর্বোচ্চ প্রজননকাল জুন মাস। একটি পরিপক্ব (৭-৯ গ্রাম) তিতপুঁটির ডিম ধারণ ক্ষমতা ১৬১০ থেকে ৪১৩০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় এ মাছটি এখন বিলুপ্তির হাত থেকে

রক্ষা পাবে এবং বাণিজ্যিকভাবেও চাষ করা সম্ভব হবে। তিতপুঁটি মাছের দাম অন্য মাছের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বহুল পরিচিত ও সুস্বাদু মাছ দারকিনা (Esomus danricus)। এ মাছটিও বিলুপ্তপ্রায়। ইতিমধ্যে দারকিনা মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জিত হয়েছে। এ ছাড়া নারকেলি, চেলা, বাটিয়া পুঁটিয়াসহ অনেক মাছের কৃত্রিম প্রজনন উদ্ভাবন সম্ভব হওয়ায় এগুলোর চাষ শুরু হয়েছে। দেশে প্রথমবারের মতো স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহে দেশীয় মাছের লাইফ জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে এ লাইফ জিন ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ লাইফ জিন ব্যাংকে দেশের বিলুপ্তপ্রায় ভাগনা, দেশি কৈ, খলিশা, মাগুর, বোয়ালি পাবদা, সরপুঁটি, পুঁটি, শিং, মহাশোল, রুই, বুজুরি, টেংরা, গুলশা, বাটা, রিটা, মলা, পুঁইয়া, গুতুম, টাকি, ঢেলা, চেলা, পিয়ালি, দারকিনা, বাচা, বাতাসিসহ মোট ১০২ প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রকৃতিতে কোনো মাছ হারিয়ে গেলেও এই ব্যাংকের মাছকে ব্যবহার করে পুনরায় প্রকৃতিতে এই মাছ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

দেশে কমবেশি ১৩ লাখের মতো দিঘি, পুকুর, খাল-বিলসহ উন্মুক্ত জলাশয় রয়েছে। এসব জলাশয়ে সনাতন পদ্ধতিতে মাছের চাষ হওয়ায় উৎপাদন কম হয়। অথচ পরিকল্পিতভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষ করা হলে কয়েক গুণ বেশি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য অধিক হারে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে ২৬০ প্রজাতির মাছের মধ্যে অধিকাংশই ছোট মাছ। ছোট মাছের সুবিধা হলো, এসব মাছে ভিটামিন-এ ও ডি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন ও আয়োডিন থাকে। ফলে মানবদেহের হাড়, দাঁত, চর্মরোগসহ রক্তশূন্যতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমাদের দেশে প্রতিবছর কমবেশি ৩০ হাজার শিশু রাতকানা রোগে আক্রান্ত হয়। এটি আয়োডিনের অভাবে হয়। ছোট মাছে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন থাকে। ফলে নিয়মিত ছোট মাছ খেলে রাতকানা রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। দেশের মৎস্যসম্পদ খাতে সমৃদ্ধির সূচনা করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সরকারের মৎস্যবান্ধব নীতি গ্রহণ ও চাহিদাভিত্তিক টেকসই কারিগরি পরিষেবা প্রদানের ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৭.৫৯ লাখ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন হয়েছে। মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্বপরিমণ্ডলে স্বীকৃত। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৫০টিরও অধিক দেশে মৎস্য রপ্তানি করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৪ হাজার ৪২ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করে ৫ হাজার ১৯১ কোটিরও বেশি টাকা আয় করছে। বর্তমানে দেশের মোট জিডিপির ৩.৫৭ শতাংশ আসে মৎস্য খাত থেকে। এ খাতে অব্যাহত উন্নয়ন আমাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, যা ২০৪১-এর উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়তা করেছে।

লেখক :

কিশোরী মায়ের স্বাস্থ্যঝুঁকি ও করণীয়

সিরাজুম মুনিরা

স্কুল থেকে ফিরে এসেছে কিশোরী শিউলী, সবে ক্লাস টেনে উঠেছে। মা এসে বললেন, 'কাল থেকে আর স্কুলে যেতে হবে না, তোমাকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে'–তারপর বিয়ে। প্রতিবাদ করতে চাইল, কিন্তু ১৫ বছরের শিউলীর কতটুকু বা শক্তি আছে সমাজে এত বড় ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়বার। মেধাবী ছাত্রী হিসেবে শিউলীর স্বপ্ন, সে লেখাপড়া শিখে বড় হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে, গরিব বাবার সংসারে সাহায্য করবে। কিন্তু অচেনা, অনিশ্চিত এক জগতে ঠাঁইয়ের জন্য তাকে ঠেলে পাঠানো হলো এবং সংসারধর্মের নিয়ম অনুযায়ী কিশোরী শিউলীর গর্ভে এসে গেল সন্তান। এমন শিউলী একা নয়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় কিশোরী মায়েদের সন্তান জন্মদানের দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে ১১৩টি শিশুই কিশোরী মায়ের সন্তান। এসডিজির সূচকে কৈশোরকালীন মাতৃত্ব কমানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যা আমাদের দেশের জন্য এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিগত বছরগুলোতে দেশে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোর জন্য উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। নারীশিক্ষা, সফল টিকাদান কর্মসূচি এবং পরিবার পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্যই এই সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই সফলতার পরও আমাদের অনেক অর্জন ম্লান হয়ে যায়, যখন একটি মেয়ে কিশোরী বয়সে মা হতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারায়।

কিশোরী মায়েদের ঝুঁকিসমূহ : আমাদের দেশের আইনে আছে, আঠারোর আগে বিয়ে নয়, কুড়ির আগে সন্তান নয়। এর মধ্য দিয়ে কিশোরী মাতৃত্বকে মূলত না করা হয়েছে। কারণ কিশোরী মাতৃত্বের ফলে অনেক ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হয়। ডব্লিউএইচওর সংজ্ঞা অনুযায়ী, ১১ থেকে ১৯ বছর বয়সের মেয়েদের কিশোরী বলে। কিশোরী মাতৃত্ব অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। একটি শিশুর গর্ভে আরেকটি শিশুর জন্ম কখনোই নিরাপদ হতে পারে না। এ অবস্থায় মা হলে তারা নানা জটিলতায় ভোগে। ৬০ শতাংশ কিশোরী মা রক্তস্বল্পতায় ভোগে। তাদের পুষ্টির অভাব থাকে। অপুষ্ট মায়ের বাচ্চা সেও অপুষ্টিচক্রে ভোগে। কিশোরী অবস্থায় গর্ভবতী হলে গর্ভপাত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। একলামসিয়ার মতো খিঁচুনি রোগ হতে পারে। বাধাগ্রস্ত প্রসব হয়। যে কারণে মৃত সন্তান জন্মের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। বাধাগ্রস্ত প্রসবের জটিলতায় মায়ের জরায়ু ও যোনিপথ এক হয়ে অনবরত প্রশ্রাব ঝরতে থাকে। মা জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকে।

বাংলাদেশে 'কিশোরী মা'-এর সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেশি। ১৮ বছর পার হওয়ার আগে কিশোরী অবস্থায় মা হওয়ার মতো মানসিক ও শারীরিক অবস্থা তৈরি হয় না

এবং শিশুকে দুধ খাওয়ানো এবং লালন-পালন করার মতো যথেষ্ট জ্ঞান আর বুদ্ধিও হয় না এদের মধ্যে। যে তার নিজের যত্ন নিতেই ঠিকমতো শেখেনি সে কী করে তার গর্ভাবস্থায় বাচ্চার যত্ন নেবে। শঙ্কার জায়গা হচ্ছে, কিশোরীদের গর্ভপাতের সংখ্যা এবং গর্ভপাতজনিত জটিলতায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, ইনফেকশন বা সেপটিক হয়ে অনেক কিশোরী মায়ের মৃত্যু হয় আবার অনেকে বেঁচে গেলেও রক্তস্বল্পতা রোগে ভোগে ও প্রদাহের কারণে তাদের প্রজনন ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলতে পারে।

ইউনিসেফের তথ্য মতে, ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মা হওয়ার মৃত্যুঝুঁকি ২০ বছরের নারীদের থেকে দ্বিগুণ। অন্যদিকে ১৫ বছরের কম বয়সী মায়েদের প্রসবজনিত মৃত্যুঝুঁকি পাঁচ গুণ বেশি। কিশোরী মায়েদের বাচ্চা প্রসবের ২৮ দিনের মধ্যে মারা যাওয়ার আশঙ্কা দেড় গুণ বেশি। এ ছাড়া ১৫-১৯ বছরের মায়েদের মারা যাওয়ার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো গর্ভকালীন জটিলতা ও সন্তান জন্মদান। বাংলাদেশের এখনো ৫২ শতাংশ মেয়ের ১৮ বছর বয়সের নিচে বিয়ে হয়। ৭০ লক্ষ কিশোরী যারা প্রসূতি অবস্থার কারণে জীবন ঝুঁকিতে থাকে। কিশোরী মায়েদের প্রি-টার্ম লেবারের রিস্ক বেড়ে যায়। এতে সময়ের আগেই শিশুর জন্ম হতে পারে। ওই ধরনের শিশুকে প্রি-ম্যাচিউর বেবি বলা হয়ে থাকে, এতে শিশুর ওজন কমসহ অন্য অনেক জটিলতা হতে পারে।

কম ওজনের নবজাতকের বেঁচে থাকা এবং পরবর্তীতে সুষ্ঠু বিকাশ লাভের সুযোগ কমে যায়। বেঁচে গেলে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে এবং এসব শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ধীরগতিতে হয়। এ ছাড়া প্রি-একলামসিয়া ও মোলার প্রেগনেন্সির মতো রিস্ক ফ্যাক্টরের জন্য বাল্যবিবাহ দায়ী। কিশোরী মা হওয়ার কারণে একজন যুবতীর জীবনে অনেক স্বপ্নই অঙ্কুরে শেষ হতে পারে। যেমন–তাদের শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি।

কিশোরী গর্ভাবস্থা বিভিন্ন কারণে মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়। প্রথমত, বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক ও মানসিক অপরিপক্ব গর্ভাবস্থা এবং প্রসবের শারীরিক চাপ সামলানোকে আরো চ্যালেঞ্জিং করে তুলতে পারে। দ্বিতীয়ত, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস প্রায়ই কিশোর-কিশোরীদের জন্য সীমিত থাকে, ফলে গর্ভাবস্থা এবং প্রসবের সময় উপযুক্ত চিকিৎসা যত্ন বিলম্বিত হতে পারে। উপরন্তু বাংলাদেশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণগুলিও কিশোরী মায়েদের মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়াতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দেশে বাল্যবিবাহ এখনো প্রচলিত এবং অল্প বয়সে বিয়ে করা মেয়েদের কিশোর বয়সে গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ তাদের নিজের শরীরের ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না, যা তাদের স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

করণীয় কী : সবার আগে শিশুর বাল্যবিয়ের প্রতিরোধ করতে হবে। এ জন্য সবার আগে গণসচেতনতা তৈরি করতে হবে। মেয়েদের শিক্ষিত, স্বনির্ভর করতে হবে। যেন তারা স্বামীর ওপর নির্ভরশীল না থাকে। শুধু খাওয়া আর পরার জন্য

বিয়ে দেওয়া হচ্ছে–এই বিষয় থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। কিশোরী মাতৃত্ব রোধে পিতা-মাতার উচিত কিশোরীকে ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে না দেওয়া। স্বামীর উচিত স্ত্রীকে ২০ বছর বয়সের আগে সন্তান গ্রহণে উৎসাহিত অথবা বাধ্য না করা। উপযুক্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা। স্ত্রী গর্ভবতী হলে তাকে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ডেলিভারির সময়ে ট্রেনিংপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীর সাহায্য নেওয়া। পরিবারের সব সদস্যের দায়িত্ব হলো গর্ভবতীকে সহানুভূতির সঙ্গে পরিচর্যা করা। গর্ভকালীন সময়ে মেয়েটিকে অন্যান্য খাবারের সঙ্গে এক কাপ ঘন ডাল, এক মুঠি দেশি শাক-সবজি ও একটি ফল, ছোট মাছ, এক মুঠি বাদাম, সম্ভব হলে একটি ডিম আর এক গ্লাস দুধ খাওয়ানো। প্রতিদিন দিনের বেলা অন্তত দুই ঘণ্টা তাকে বিশ্রাম দেওয়া। মানসিক দিক থেকে নির্ভার রাখা। নবজাতকের জীবনরক্ষায় দরকার আরো কার্যকর ও সার্বক্ষণিক অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্যসেবা, আরো দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী এবং উল্লেখযোগ্য হারে জনগণের সুষ্ঠুভাবে হাইজিন ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা। এ ছাড়া ভৌগোলিক, লৈঙ্গিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে আরো বৃহত্তর আঙ্গিকে কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে।

কেবল প্রজনন স্বাস্থ্য নয়, 'সুস্থ নারী স্বাস্থ্যে' জোর দিতে হবে। গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসব-পরবর্তী সময়ে মায়েদের স্বাস্থ্যসেবায় নজর দিতে হবে। গর্ভকালীন সময়ে কমপক্ষে মোট চারবার ১৬ সপ্তাহ, ২৮ সপ্তাহ, ৩২ সপ্তাহ ও ৩৬ সপ্তাহে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে, পরামর্শমতো চলতে হবে। এ সময় অ্যান্টিনেটাল চেকআপ অবশ্যই জরুরি। প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি অথবা 'স্কিল্ড বার্থ অ্যাটেনডেন্ট' বা দক্ষ, প্রশিক্ষিত ধাত্রীর হাতে সন্তানের জন্ম হওয়াটাও মাতৃমৃত্যু রোধে গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রামীণ ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় দক্ষ জন্ম পরিচর্যা এবং জরুরি প্রসূতি পরিচর্যা পরিষেবার প্রাপ্যতা বাড়ানোও সরকার ও স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি নিশ্চিত করতে হবে যে যে কিশোরী মায়েদের গর্ভাবস্থা এবং প্রসবের সময় মানসম্পন্ন মাতৃস্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ রয়েছে। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সুযোগের মাধ্যমে অল্পবয়সী মেয়ে ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন, বাল্যবিবাহ এবং অনিচ্ছাকৃত কিশোরী গর্ভধারণ প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে। এটি এমন প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে করা যেতে পারে, যা লিঙ্গ সমতাকে উন্নীত করে এবং মেয়েদের স্কুলে থাকতে এবং বিবাহ ও সন্তান জন্মদানে বিলম্ব করতে উৎসাহিত করে। এই হস্তক্ষেপগুলি ছাড়াও কিশোরী গর্ভাবস্থার বিপদ এবং ব্যাপক যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিষেবার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রজনন স্বাস্থ্যের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নীত করার জন্য মিডিয়া প্রচারণা, কমিউনিটির অংশগ্রহণের মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে।

এটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বাংলাদেশে কিশোরী গর্ভাবস্থা মোকাবিলায় মানবাধিকারভিত্তিক পদ্ধতির প্রয়োজন। কিশোর-কিশোরীদের ব্যাপক যৌন এবং

প্রজনন স্বাস্থ্য তথ্য এবং পরিষেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং এই অধিকারগুলি সুরক্ষিত এবং সমুন্নত রাখা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের রয়েছে।

পরিশেষে, এটা স্বীকার করা জরুরি যে কিশোরী গর্ভাবস্থার বিষয়টি বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ নয় এবং এটি একটি বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের বিষয়। এই সমস্যাটি মোকাবিলা করার জন্য এবং সমস্ত তরুণের ব্যাপক যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য তথ্য এবং পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস রয়েছে, তা নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সংহতি বৃদ্ধির প্রয়োজন।

উপসংহার : দেশে গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি, স্বাস্থ্যসচেতনতা এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা গ্রহণ আগের তুলনায় বেড়েছে। আর সরকারের বহুমাত্রিক স্বাস্থ্যসেবা তৎপরতার ফলে মাতৃমৃত্যুর হার অনেকটাই কমে এসেছে। দেখা গেছে, গত দেড় দশকে মাতৃমৃত্যুর হার ৪৫ শতাংশ কমেছে। তবে কিশোরী মায়ের মৃত্যুহার এখনো অনেক বেশিই রয়ে গেছে। ২০৩০ সাল নাগাদ মাতৃমৃত্যুর হার আমরা শতকরা ৭০-এ নামিয়ে আনব, এটা আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু আমরা চিন্তা করতে পারি, কোনো একদিন মাতৃমৃত্যুর হার শূন্যতে নামিয়ে আনব। এটা খুব কঠিন কিছু নয়। আমরা কোভিড-১৯ চলাকালে স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি দেখিয়ে দিয়েছি। আমরা প্রমাণ করেছি, আমরা পারি। কাজেই আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি অনেক। কোভিড চলাকালে মাতৃসেবা কমে গিয়েছিল। এখন তা আবার বাড়ছে। মাতৃমৃত্যু কমানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সেবা বাড়াতে হবে। মাতৃসেবা যাতে প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি, সে প্রচেষ্টায় সরকার বদ্ধপরিকর। আমাদের পরিবার, সমাজ, রাজনীতিবিদ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকলের সমন্বিত এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে উচিত নিষ্ঠা আর মমতার সাথে গ্রামীণ এবং শহুরে বস্তিবাসী কিশোরীদের যথোপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করা। সর্বোপরি বাল্যবিবাহ নিরোধে তাদের উৎসাহিত করা, প্রয়োজনে দরিদ্র পরিবারগুলোকে বাল্যবিবাহ নিরুৎসাহের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকার হওয়া উচিত। যাতে করে সমাজে মেয়েদের মর্যাদা, সম্মান, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের সুযোগ বাড়ানো যায়।

লেখক :

জাগরণ এই ধাবমানকালে

জাফর ওয়াজেদ

ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এ মাসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একুশে ফেব্রুয়ারির কৃতিত্ব ও কীর্তিকে বাঙালি জাতি তার ঐতিহাসিককালের আর সমস্ত কৃতিত্ব ও কীর্তিরাজির শীর্ষে স্থান দিয়েছে। ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত বাঙালি জাতি তার পাকিস্তানি শাসনাধীন জীবনের এ কৃতিত্ব নিছক স্মরণ করে না। শুধু শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক স্থাপন করে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না 'ভায়ের রক্তে রাঙা' রাজপথের তরুণ শহিদদের। জাতি ফেব্রুয়ারির দিনগুলোতে উপলব্ধির অন্তর্গভীরে প্রবেশ করে এবং তার জাতীয় জীবনের লাভ-লোকসানের খতিয়ান করে। এমন ঐক্যবদ্ধ তারা অন্য কোনো সময়ে হয় না। একুশে ফেব্রুয়ারি এক বিমূর্ত মহান অনুভূতি তার সর্বগ্রাসী প্রভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে পুরো জাতিকে। তাই শুধু শহর-বন্দর নয়, পল্লির স্কুল-কলেজেও দেখা মেলে শহিদ মিনারের। দেশের এই হাজার হাজার শহিদ মিনারে একুশে ফেব্রুয়ারিতে পুষ্পস্তবক নিবেদিত হয়। প্রতিটি শহর-বন্দর, গ্রামগঞ্জে এ দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তারপর হয় সভা-সমিতিসহ নানা অনুষ্ঠান। সত্যিই বাঙালি ভোলেনি সেই রক্তমাখা দিন। কখনো প্রদর্শন করেনি উদাসীনতা। সর্বস্তরের গণমানুষের কাছে একুশের আবেদন যেন জাতিসত্তার মেলবন্ধন সৃষ্টি করে। এ মাসে জাতি সচেতন হয় যে, ধর্মবর্ণ যার যা হোক, সামগ্রিকভাবে বাঙালি একটি অবিভাজ্য জাতি। এ জাতি একটি সমন্বিত সংস্কৃতি এবং একটি সমন্বিত জীবনবোধের অধিকারী। তার সাহিত্য, তার সংগীত ও সুর, তার তৈজসপত্র, তার জীবনযাপন প্রণালী এবং অর্থনীতি এক ও অভিন্ন। এগুলো সেই সমন্বিত সংস্কৃতির অকাট্য প্রমাণরূপে বিদ্যমান। তাই এ মাসে বাঙালি তার ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ হয়ে ওঠে। অভিন্ন অনুভূতির এক স্রোতধারায় অবগাহন করে প্রতিবছর নতুন করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় লক্ষ্যাদর্শ পূরণে। অন্য সময়ে যাঁরা শরিক হন না, অথবা কর্তব্যকর্মে গাফিলতি করেন, তাঁরাও সজাগ এবং কর্তব্যসচেতন হন এ সময়টাতে। জনগণের সঙ্গে, জনতার মিছিলের সঙ্গে, জাতির অর্ধমগ্নচৈতন্যে বিদ্যমান অনুভূতির সঙ্গে যোগদান করেন তাঁরাও। কেননা তাঁরা জানেন, এমনকি স্বাধীনতাসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সাথে যারা করেছিল বিশ্বাসঘাতকতা ও দুশমনি, তারাও জানে ফেব্রুয়ারির দিনগুলোতে জাতি কোনোরূপ উদাসীনতা ও শৈথিল্য সহ্য করবে না। সহ্য করবে না বাঙালির স্বাধীনতা চেতনার মূল ভিত্তিভূমিতে কোনো রকমের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আঘাত। জাতি এ সময়টাতে তার ভেতর-বাইরের শত্রু-মিত্রদেরও চিহ্নিত করে এবং যে ক্ষেত্রে যেমন কর্তব্য, তা নির্ধারণ করে পরবর্তী বছরের জন্য পথ বেছে নেয়। বাংলাদেশে আগেও বিভীষণরা ছিল, সব দেশেই কমবেশি থাকে, এখনো আছে। কিন্তু বাইরের শত্রুরা যেমন পরাজিত হয়েছে, তেমনি ভেতরের বিভীষণরাও ইতোপূর্বে পর্যুদস্ত হয়েছে। ১৯৭১

সালে যে সকল বহিঃশক্তি বাংলাদেশে গণহত্যা পরিচালনায় পাকিস্তানকে সর্বপ্রকারে মদদ জুগিয়েছিল, যারা বঙ্গবন্ধুর আততায়ীদের হাতে শহিদ না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি পর্যন্ত দেয়নি, সেসব বহিঃশক্তির অনুপ্রেরণায় পুনরায় ঘরের শত্রু বিভীষণরা ঐক্যজোট বেধে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটিয়েছে। এরা দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে আজও লিপ্ত রয়েছে। জাতি তাদের পরিচয় জানে।

বাংলাদেশের মানুষ এখনো অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং নানা অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এখানে শ্রেণিভেদে শিক্ষার ভেদাভেদ বিদ্যমান। বিদ্বান এবং সুশিক্ষিতরা একটি আলাদা শ্রেণি। ওরা শাসকশ্রেণিও বটে। সাধারণ দেশবাসীর জন্য শিক্ষাব্যবস্থা যা-ই হোক না কেন, তাতে এ শ্রেণিটির লাভ-লোকসান নেই। ওরা ইংরেজ-পাকিস্তানি আমলেও আলাদাভাবে সময়োপযোগী শিক্ষা পেয়েছে, এখনো পাচ্ছে। সাধারণ দেশবাসীকে অদ্যাবধি বর্তমান যুগের এ সর্ববাদীসম্মত সত্যটি বুঝিয়ে বলা হয়নি যে, পৃথিবীর সকল সভ্য ও উন্নত দেশের মানুষ একমাত্র যার যার মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করেই সভ্য হয়েছে এবং উন্নতি লাভ করেছে। এ কথাও বলা হয়নি যে ইংরেজি, ফার্সি, জার্মান প্রভৃতি ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালে উন্নতি লাভ করেছে। এবং এ কথাও ওদের বুঝিয়ে বলা হয়নি যে বাহ্যিক আচার-আচরণের মধ্যেই কেবল পুণ্য নয়, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে একটি উপলব্ধি, প্রকৃত জ্ঞানই শুধু মানুষের মধ্যে সে উপলব্ধি জাগ্রত করতে পারে এবং একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই সে জ্ঞান আহরণ সম্ভব। আমরা সাধারণ বাংলাভাষীরা কোরআনের বাংলা তর্জমা পড়েও আল্লাহর বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারি। এই অতি সহজ-সরল কথাটা পর্যন্ত বোঝার এবং বোঝাবার লোক দেশে অল্প। এককথায় একটি জটিল প্রশ্নমালার সঠিক জবাবদানের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রস্তুতি বাংলাদেশে নেই। কখনো কেউ প্রস্তুত করার চেষ্টাও করেনি। বরং এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে পুরো ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলে শিক্ষা এবং ধর্মের নাম করে সরলপ্রাণ সাধারণ মানুষের মধ্যে মূর্খতা সম্প্রসারণের সজ্ঞান প্রচেষ্টা চলেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে তারই ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীনতা এসেছিল এই ধর্মান্ধতার বিপরীতে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুহীন দেশে ধর্মের নাম করে মূর্খতা ও গোমরাহী সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা পাকিস্তান আমলের চেয়ে জোরেশোরে চলেছে। আর সেই চলার কারণে মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, ধর্মান্ধতার প্রসার ঘটেছে। জাতি তাই একুশেতে শপথ নিচ্ছে এদের বিনাশ সাধনে। বাঙালি জাতিসত্তার বিরুদ্ধে যখনই এসেছে আঘাত, তখনই প্রত্যাঘাত হয়েছে। এমনিতে বাঙালি জাতি হিসেবে অত্যন্ত সহজ-সরল। কিন্তু কঠিন হতেও দেরি হয় না, তার প্রমাণ সে রেখেছে অতীতেও। কিন্তু আজকের বাংলাদেশে একটা প্রচণ্ড চেঁচামেচি, হৈ-হল্লা চালানো হচ্ছে। চিৎকার করা হচ্ছে, দেশের কোথাও ভালো কিছু হচ্ছে না। দেশ দ্রুত সর্বনাশের পথে এগোচ্ছে। এই দুর্মুখরা একাত্তরের পরাজিতদের ক্রোড়ে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করছে, শহিদদের সংখ্যা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করছে। একুশে ফেব্রুয়ারি এসব উপড়ে ফেলার প্রেরণা দেয়। যদিও এদের মিথ্যাচার সীমাহীন।

অযথা বিলাপের সঙ্গে সত্যের অপলাপ, আক্ষেপ-বিক্ষেপের সঙ্গে বক্রোক্তি, কটূক্তি, অতিরঞ্জনের সঙ্গে অপভাষণ এটি এখন দেশব্যাপী একটি ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে যেন। ব্যাধি তো বটেই, হিস্টিরিয়াও হতে পারে। কখনো কঠোর ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করছে, কখনো-বা বিদ্রুপের কশাঘাত করছে। মনে হয় বাঙালির স্বভাবেই এই ব্যাধি রয়েছে। দোষান্বেষী স্বভাব, ছিদ্রান্বেষণী স্বভাব। এমনিতেই কাউকে ছেড়ে কথা কইতে চায় না। দোষ পেলে তো কথাই নেই। সাধারণ কথাবার্তায় উপহাস-পরিহাস লেগেই থাকে। খোঁচা দিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে। এর একটি গুণের দিকও রয়েছে নিশ্চয়ই। হাস্যরসের চর্চা একদা বাঙালি চিত্তকে সরস করেছিল। বাঙালির এই স্বভাবের দরুন আর কিছু না হোক, পরোক্ষভাবে নিজেদের ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে কিছু সহায়তা অবশ্যই করেছে। বাদ-প্রতিবাদের বেলায় কটূক্তি-ব্যঙ্গোক্তি ব্যবহার হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু শালীনতার হানি হয়নি। তবে অনেকের ভাষা ঠিক স্বভাবসংগত ভাষা নয়। ভাষাটা মনে হয় কেমন যেন অকারণে কলহপ্রবণ, উদ্দেশ্যটা যেন গায়ের ঝাল মেটানো। সব ভাষাই জাতীয় চরিত্রের প্রতীক। বাংলা ভাষার বেলায় এটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট। জাতীয় চরিত্রের বহুগুণ সন্নিবেশে এই ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। আজকাল সে ভাষায় যে রূঢ়তা এমনকি স্থূলতা দেখা দিয়েছে, সেটি আদৌ শুভলক্ষণ নয়। মনে হয় বাঙালি চরিত্রেরই কোনো একটি গ্রন্থি যেন ছিঁড়ে গেছে এবং তারই ফলে ভাষার ব্যবহারে শৈথিল্য প্রকাশ পাচ্ছে। বিরোধে-বিদ্বেষে দলীয় নেতাদের মন তিক্ত। দলগত মতিগতির ফলে মনে প্রসন্নতার অভাব ঘটেছে। মনে প্রসন্নতা না থাকলে মুখের কথায়, লেখার ভাষায় প্রসাদগুণ আসে না। বলা নিস্প্রয়োজন, এখানে সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে না। লেখক-সাহিত্যিকরা ভাষা সম্পর্কে সর্বদাই সজাগ–এ ধারণাটি বদ্ধমূল। কাজেই সাহিত্যের ভাষা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। এখানে বলা হচ্ছে–নিত্যদিন যে ভাষা আমরা বলছি, শুনছি টিভিতে, দৈনিক পত্রে যে ভাষা নিত্য পড়ছি; সেই ভাষার কথা। সাহিত্যের ভাষার চেয়েও এটি বড় জিনিস। কেননা এ ভাষার মধ্যেই জাতির প্রকৃত পরিচয়। ভাষা যদি ক্রমেই উগ্র থেকে উগ্রতর হতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে, জাতির চরিত্রে কোথাও বৈকল্য ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে, বাংলা এমনকি ইংরেজি, এই উভয় ক্ষেত্রেই ভাষাকে পালোয়ানি ভঙ্গিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভাষাকে যদি একটি হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয়, তাহলেও মনে রাখা প্রাসঙ্গিক যে, যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেখানে সেভাবেই তাকে ব্যবহার করতে হবে। লেখকের লেখনী ভীমের গদা নয়। গদা অতি স্থূল অস্ত্র। ভীমের হাতেই মানায়। কর্ণ বা অর্জুনের হাতে মানায় না। ভাষা হলো শব্দভেদী বর্ণ। শব্দকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারলে অনায়াসে মর্মভেদ করতে পারে। পালোয়ানির প্রয়োজন হয় না।

ভাষা যে ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠছে, তা প্রকৃতপক্ষে দুর্বলতার লক্ষণ। এই যে ভাষা ধীরে ধীরে বিকৃত হচ্ছে, সে জন্য অনেকাংশে দায়ী উপনিবেশিক মানসিকতাজাত নিন্দুকেরা। কারণ তারা হয় দুঃখে হাপুস নয়ন, না হয় তো ক্রোধে উন্মত্ত। কাজেই বাক্যে ব্যবহারে তাঁরা খুব স্বাভাবিক নন। একটু নাটুকেপনার ভাব আছে। সেটা হাস্যকর। কারণ অনেকটা যেন সার্কাসের ক্লাউনের ভাব এসে যায় তাঁদের।

কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে অপভাষা ব্যবহার যেন স্বাভাবিক। ফেসবুক, টুইটারে ভাষার নানামুখী ব্যবহারের দেখা মেলে। দেশের উন্নয়নবিরোধীরা দেশের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সম্বন্ধে ভেবে আকুল। স্বভাববশে কোথাও একরত্তি ভালো কিছুই দেখতে পায় না। একটুতেই ক্রুদ্ধ, অপভাষা প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত। 'পুলিশরাই পেট্রলবোমা মেরে জীবন্ত মানুষ হত্যা করছে, সরকার নিজেই জঙ্গিদের ব্যবহার করছে, শেখ হাসিনা ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে গ্রেনেড নিয়ে নিজেরাই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে' ইত্যাদি অজস্র উদাহরণ টানা যায়। তার এসব মিথ্যাচার কোনো সম্ভ্রান্ত পত্রিকায় ছাপা হওয়া উচিত নয় মনে হলেও বাস্তবে দেখা যায়, সেসব পত্রিকা এসব কদর্যভাষ্যকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে পানি ঘোলাটে করার জন্য। পঁচাত্তর-পরবর্তী ক্ষমতা দখলকারীদের উত্তসূরিরা এখনো ইতিহাসকে বিকৃত শুধু নয়, রক্তে অর্জিত সংবিধান পাল্টে ফেলতে চায় পুরোদস্তুর। আসলে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান থাকে না। ক্রোধান্ধ ব্যক্তি নিজেই নিজের বিনাশ সাধন করে। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি লোকসমাজে নিজেকে অশ্রদ্ধেয় করে তোলে। যেমন–'শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি, তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন' মার্কা মিথ্যাচার তাদেরকে বাংলাদেশবিদ্বেষী পাকিস্তানপন্থি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, বলা যায় অনায়াসে।

এই অপশক্তি বিশ্বব্যাপী দেশ নিন্দার এক কোরাস জুড়ে দিয়েছে। চেঁচামেচি করে দেশময় উত্তেজনা-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় বরাবর। অথচ ধীরস্থির শান্তভাবে যুক্তিপূর্ণ ভাষায় দোষত্রুটির সমালোচনা করলে দেশের ভালো ছাড়া মন্দ হয় না। সুচিন্তিত সমালোচনা দেশের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু তাদের ভাষণ দেশের অস্তিত্ব ধরেই টান মারে। দেশপ্রেম শিকেয় ঝুলিয়ে রেখে তাই মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা হয়। তাদের মুখে যে অবিরাম মিথ্যাচার চলছে, এতে দেশের, রাজনীতির লাভ কিছুই হচ্ছে না। বরং ক্ষতিই হচ্ছে। আর এই ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলার কাজটি তারা অবলীলায় চালিয়ে যাচ্ছে। অনবরত হতাশাব্যঞ্জক, দেশবিরোধী বক্তব্য শুনে তাদের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তাই তাদের এখন চোরাবালিতে খাবি খেতে হচ্ছে। এদের দেশপ্রেম স্বার্থগন্ধে কলুষিত বলেই ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ফেব্রুয়ারি আমাদের চোখের দৃষ্টি, অন্তরের আবেগকে এমনভাবেই সমৃদ্ধ করে যে, এসব জঙ্গি, সন্ত্রাসবাদী, যুদ্ধাপরাধীকে দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করে স্বাধীনতার ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখার ব্রতে। বাঙালির জাগরণ ঘটেছে ইতিহাসের প্রতি পদে। শত বাধা, শত বিঘ্নকে সে ধূলিসাৎ করতে পেরেছিল। আজকেও সেই পথেই হেঁটে যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারির বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠছে স্বাধীনতার মন্ত্রগুলো। মার্চের গৌরবগাথাকে সামনে এনে দানবের বিরুদ্ধে মানবের জয়কে কেউ রুখে দিতে পারেনি, পারবেও না। বাঙালি মাথা নত না করা জাতি বলেই সে পাড়ি দিতে পারে নিধুয়া পাথার।

লেখক : একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

The Fourth Industrial Revolution and Our Actions

Farhan Masuk

Our world is changing at an incredible speed. Touch of change around the world. New technologies are constantly knocking at our doorstep. Goodbye to the old meditation idea. People of the world need to learn the skills to use the new technology. The pace of technological change is much faster than acquiring the skills to use the technology. As a result, a new challenge has appeared in front of the people of the world to keep pace with the technological change. We have to accept the development and spread of new technology whether we want it or not, otherwise we will fall behind in this world. Digital technology has been associated with excellence in today's world. We can easily imagine that in the coming decades, the fourth industrial revolution driven by technology will change the old structure in all areas of the world. By the year 2030, many of the current jobs will no longer exist. The type of creation is still unknown to us. Robotics ie Artificial Intelligence, Block Chain Technology, Internet of Things, Decentralized Consensus, Gene Engineering and other technologies will build the world in a new way. In addition, fifth generation wireless technology, 3D printing and emerging technologies in fully autonomous vehicles will be considered breakthrough eras.

The fourth industrial revolution is now a reality, there is no denying it. If we fail to meet the challenges of the fourth industrial revolution, the new industrial revolution will leave us behind. There are advantages for us in meeting the challenges of the fourth industrial revolution. Firstly, the implementation of Digital Bangladesh over the past thirteen years has strengthened the foundation of Digital Bangladesh. It has a direct impact on all sectors across the country. It has affected the daily life of people. People are used to one word. Our economy is booming, per capita income is increasing rapidly. In the current financial year, the per capita income has been provisionally calculated at 2 thousand 591 US dollars. The per capita income of more or less 03 crore people of Bangladesh is about 05 thousand US dollars.

The export revenue in the ICT sector is 1.3 billion USD annually. 750 million USD in annual revenue in the outsourcing sector. Bangladesh ranks second in the world in terms of online workforce. The number

of financing is about six and a half lakh. Direct employment in Hi-Tech Park is about 21 thousand. Schools have more than 58 thousand multimedia class rooms. Day by day it is increasing. The government is providing multimedia class rooms on a priority basis in all educational institutions of the country. We need to push our education sector to face the fourth industrial revolution. Hundred percent of people in the country have now come under electricity facilities. Power generation is being increased as per the plan. The government plans to transform itself into a wealthy country with a per capita income of US$ 15,000 by 2041 as well as empowering people equally. In order to implement this plan, all the concerned parties have been explained their responsibilities. Everyone is trying to implement this plan. If this plan is implemented, the GDP of Bangladesh will be 6 trillion US dollars in 2041. Bangladesh ranks 93rd in terms of size and 8th in terms of population. It is not very easy to plan the development of such a populous country and implement it. However, our honorable Prime Minister Sheikh Hasina undertook this difficult task 13 years ago. She had announced the roadmap for the development of the life and livelihood of the people of the country through the implementation of Digital Bangladesh. Since then, digital education has continuously expanded. Many developed countries of the world have not even thought about the launch of 'Five G'. However, 'Five G' has already been launched in Bangladesh. A third submarine cable is coming this year.. The government is bringing broadband internet connectivity to people's doorsteps. Broadband Internet provides high speed data through which technology is expanding. Future world will be data dependent. In this continuation, the demand for broadband internet will continue to increase day by day. The optical fiber network is being delivered to the masses to build the eco system to meet the demand for data and the consumer is easily accepting it. The government has already launched the 'Ekdesh Ekrate' package to make broadband internet affordable and people-friendly. Artificial Intelligence is also known as Machine Intelligence. The best example of computer science is artificial intelligence. The four main functions of artificial intelligence are speech recognition, learning new things, planning and problem solving. Artificial intelligence is being used in smartphones to take beautiful selfies, provide customized services keeping in mind the customer's habits and needs, and provide various services by listening to the voice etc.

Many institutions in Bangladesh are already running their operations with the help of artificial intelligence. City Bank jointly started micro loan disbursement program with bKash. The help of artificial intelligence has been taken in providing this loan. That is, if a bKash account holder

applies for a loan using the bKash app, City Bank will grant the loan automatically with the help of artificial intelligence. No human help is needed here. The loan is available as soon as the application is made. No collateral or documents are required. Bank has no loan processing fee. Loans are collected on monthly basis from bKash account balance. Interest rates are also affordable. Customers are getting this facility 365 days 24 hours. It is a groundbreaking activity in the banking sector. Also, the use of robots in garment factories has started long ago. Robotic technology is being used to assemble refrigerator compressors at the Walton factory. ICDDRB has launched a state-of-the-art artificial intelligence-based method of diagnosing diabetic retinopathy with tele-ophthalmology technology called 'CARA'.

Block chain technology is the most secure technology in the current world for data transfer and data storage. In this method, any work can be done by collecting different blocks in the form of a chain. It is a distributable database in which all the transaction information between the participating parties is in the form of document is saved. Each transaction can be verified again by the majority of the system. Once an information is in the system it remains permanently, it cannot be deleted. It works perfectly. Currently block chain is very popular and effective in network security and data transfer. It is being used in all activities, including financial transactions, to reduce corruption in the country and protect people's information. Bangladesh is already working on this technology. But it is in the early stages. It is playing a revolutionary role in the health sector. All medical records of people are stored through block chain and this information will help the doctors in providing medical services. This technical service is limited in private big hospitals in our country. In various countries of the world, including the United States and Malaysia, the help of artificial intelligence is taken as an aid in determining probation, bail, sentence and crime trends.

The fourth industrial revolution will have the greatest impact on the job market. As a result of automation, industrial factories will become machine dependent. On the one hand, unskilled and low-skilled workers in the traditional labor market will lose their jobs, on the other hand, a lot of employment will be created for the skilled labor force in the new generation labor market. In this knowledge-based industrial revolution, skilled human resources will be more valuable than natural resources. As a result of the fourth industrial revolution, instead of off-sharing, the process of re-sharing will progress. That is, all the production processes that were previously transferred to developing countries will be taken back to developed countries.

The fourth industrial revolution will move mankind forward by 100 years. Today's generation is more educated and aware than before. Our children and teenagers are driven towards technology from birth. Actually there is no scope to go beyond our technical know-how. The fourth industrial revolution with its endless possibilities is knocking at the doorstep of the people of the world. It is hoped that Bangladesh will be able to face this challenge positively and introduce itself to the world as a developed country.

Writer: Software Engineer

যে কারণে তিনি চিরস্মরণীয়

মুহাম্মদ শামসুল হক

চার অক্ষরের একটি শব্দ 'স্বাধীনতা'। পরিধি তার ব্যাপক। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসরত ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, অর্থনীতি, রাজনীতিসহ জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে নিজস্ব রীতিনীতি, স্বকীয়তা অটুট রেখে স্বজাতির ম্যান্ডেট নিয়ে জনপ্রতিনিধির শাসনে পরিচালিত হতে পারার গ্যারান্টিই হচ্ছে স্বাধীনতা। যেকোনো দেশের স্বাধীনতা এমন একটি অমূল্য সম্পদ, যা কুড়িয়ে পাওয়া যায় না কিংবা ইচ্ছে করলে অথবা 'স্বাধীন হয়ে যাও' বললেই হয়ে যাওয়ার বিষয় নয়। অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমদের ভাষায় 'স্বাধীনতা মামার বাড়ির আবদার নয়। স্বাধীনতাযুদ্ধ কোনো অর্বাচিন যুবকের হঠকারিতা নয়।' সাধারণভাবে রাষ্ট্র একটি স্থায়ী ধারণা, সার্বভৌমত্বের প্রতীক ও প্রতিজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র ছাড়া স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণও আত্মতৃপ্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না।

রাষ্ট্র তার জনগোষ্ঠীর সব সম্প্রদায় কিংবা সব অংশের জনগণের প্রতি ন্যায়ভিত্তিক সমান আচরণ ও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলে জনমনে ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম নেয়। শাসকগোষ্ঠী এই ক্ষোভ ও হতাশার কারণ অনুসন্ধান ও সমাধানে ব্যর্থ হলে মানুষ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার পরিবর্তনের নিয়মতান্ত্রিক নানা আন্দোলনে নামে। সরকারের আচরণে বিশেষ করে জাতি ও সম্প্রদায়গত বৈষম্যের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠলে এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে এর সমাধান দুঃসাধ্য হয়ে উঠলে সংশ্লিষ্ট জাতি তথা জনগোষ্ঠী অনিয়মতান্ত্রিক পথে সরকার পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হয়। আর এ পথে একবার অগ্রসর হলে প্রায় ক্ষেত্রে শেষ সমাধান হয় পৃথক রাষ্ট্র তথা স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে।

যেমন ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্তির জন্য বহু বছর ধরে নানা আন্দোলনের এক পর্যায়ে আলোচনার ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছে ১৯৪৭ সালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারত ও পাকিস্তানের মতো এশিয়া এবং আফ্রিকায় অনেক ঔপনিবেশিক দেশ (কলোনি) সমঝোতার মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। ৮০-৯০-এর দশকে পরাক্রমশালী সোভিয়েত রাশিয়া থেকে সমঝোতার ভিত্তিতে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, লাটভিয়াসহ সাতটি সোভিয়েত অঙ্গরাজ্য।

তবে অনেক ক্ষেত্রে হাজারও বৈপরীত্য সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নানা কলাকৌশলে অস্বীকার কিংবা অস্ত্রের মাধ্যমে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট

জনগোষ্ঠীকে একই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে, একই কাতারে শামিল হয়ে, বিনা প্রশ্নে নিঃস্বার্থভাবে জানমাল সমর্পণ করার প্রস্তুতি নিতে হয়। আর এ রকম প্রস্তুতির জন্য জনগণকে মানসিক ও সাংগঠনিকভাবে উপযুক্ত করতে প্রয়োজন কৌশলী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যোগ্য নেতার। কারণ, স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রক্রিয়া যেমন দীর্ঘ, যুদ্ধের ফলাফলও তেমন অনিশ্চিত। উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে। আরব ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনি-জাতি প্রায় পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পরও স্বাধীনতা পায়নি। ইয়ান স্মিথ রোডেশিয়ার শেতাঙ্গ সংখ্যালঘু সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৬৫ সালের ১১ নভেম্বর রোডেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সংখ্যালঘু সরকার কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসনের বিরোধী থাকার কারণে ব্রিটিশ সরকার, কমনওয়েলথ এবং জাতিসংঘ এই স্বাধীনতা ঘোষণাকে অবৈধ ঘোষণা করে। পরবর্তী সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮০ সালে রোডেশিয়া জিম্বাবুয়ে নামে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

১৯১৬ সালে ইস্টার অভ্যুত্থানের সময় ডাবলিনে কিছু আইরিশ বিদ্রোহী জনগণের পক্ষ থেকে সমগ্র আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি সম্পৃক্ত না থাকায় সেই ঘোষণাটি ৬ বছর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। পরবর্তী সময়ে আইরিশ ফ্রি স্টেট ১৯২২ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আয়ারল্যান্ডের উত্তরাংশ এই রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল না।

আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের জন্ম ১৯৭১ সালে। জাতি হিসেবে বাঙালি ও নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশি হিসেবে বিশ্বে আমাদের পরিচয়। কিন্তু এখন থেকে অর্ধশত বছর আগেও জাতি হিসেবে আমাদের কোনো পরিচয় ছিল না। একাত্তরের আগে ২৪ বছর ধরে আমরা ছিলাম পাকিস্তান নামক একটি দেশের পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের বাসিন্দা। শাসন-শোষণ, বৈষম্য ও অধিকারহীনতায় আমাদের অবস্থান ছিল মূলত উপনিবেশের শৃঙ্খলে বন্দি মানুষের মতো। তারও আগে প্রায় দুই শ বছর ব্রিটিশ শাসনসহ যুগে যুগে নানা জাতিগোষ্ঠীর শাসন-শোষণের জাঁতাকলে বাঙালিরা পিষ্ঠ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ২৩ বছর নিয়মতান্ত্রিক ও সাড়ে ৯ মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে একাত্তর সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। আর এ লড়াইয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে এক কাতারে শামিল করে এগিয়ে নেওয়ার কঠিন কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ধর্মীয় জাতিসত্তাবিশিষ্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের আওতায় শাসিত হওয়ার প্রাথমিক অবস্থা থেকে বাঙালি জাতির অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেউ কেউ আঁচ করতে পেরেছিলেন। যতই দিন যায় ততই তাঁদের উপলব্ধি তীব্র হতে থাকে। রাজনীতিক, ছাত্রসমাজ, সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে শ্রেণি-পেশার লোকজনের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধতে থাকে। সব শ্রেণির মানুষের স্বপ্নকে নিজের স্বপ্ন ও চেতনার সাথে মিশিয়ে বঙ্গবন্ধু এমনভাবে

স্বাধীনতার সোপান তৈরি করেন, যা সমসাময়িক অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ নেতার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

শেখ মুজিব ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিমের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গণতান্ত্রিক নেতা ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মতো মাঠচষা নেতাদের ভাবশিষ্য। বলা যায়, তাঁদের হাত ধরেই শেখ মুজিবের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। কিন্তু তারুণ্য-যৌবনের জয়যাত্রায় তাঁর চিন্তা-চেতনা ছিল ওই দুই নেতার তুলনায় অগ্রসর, আধুনিক এবং স্পষ্ট, বিশেষ করে বাংলার স্বাধিকার-স্বাধীনতার প্রশ্নে। চীনের সাথে সম্পর্কের কারণে পাকিস্তানের অখণ্ডতার ব্যাপারে ভাসানী ছিলেন দোদুল্যমান, আর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে। জানা যায়, ৬১ সালে লন্ডনের এক হোটেলে শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীকে 'পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন হতে হবে' বললে সোহরাওয়ার্দী রেগে গিয়েছিলেন। আগে থেকে পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং মুসলিম লীগের ছায়াতলে থেকে রাজনীতি করা এবং পরে আওয়ামী লীগে শামিল হওয়া অনেক নেতাকর্মীও পাকিস্তানকে ভাঙার মতো চিন্তা-ভাবনা মেনে নিতে পারেননি। বিষয়টির প্রতি খেয়াল রেখেই মুজিব প্রবীণ নেতাদের ছায়ার নিচে থেকে নিজের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেন সবার মাঝে।

১৯৫৬ সালে গণপরিষদে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করার প্রস্তাব করে পাকিস্তান সরকার। এর আগে এই প্রদেশের নাম ছিল পূর্ব বাংলা। বঙ্গবন্ধু সে সময় গণপরিষদে দেওয়া বক্তৃতায় 'পূর্ব বাংলা' নাম পাল্টানোর বিরোধিতা করে এর নাম শুধু 'বেঙ্গল' (বাংলা) করার প্রস্তাব করেন। ওই অধিবেশনেই তিনি বাঙালিদের ওপর জুলুম-শোষণ বন্ধ না হলে জনগণ সংবিধানবিরোধী অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে বলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে হুঁশিয়ার করে দেন।

ষাটের দশকের শুরুতে (১৯৬১ সালে) আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির এক গোপন সভায় শেখ মুজিব খোলাখুলিভাবে স্বাধীনতার দাবিকে আন্দোলনের কর্মসূচিতে রাখার আহ্বান জানিয়েছিলেন কমরেড মণি সিংহের প্রতি। সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'একটা কথা আমি খোলাখুলি বলতে চাই, আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন এসব কোনো দাবিই পাঞ্জাবিরা মানবে না। কাজেই স্বাধীনতা ছাড়া বাঙালিদের মুক্তি নেই।'

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তিসনদ হিসেবে ছয় দফা ঘোষণা করলে পাকিস্তান সরকার একে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত হিসেবে প্রচার চালায়। দেশব্যাপী বঙ্গবন্ধুর ব্যাপক সফর ও ছয় দফার প্রচার-আন্দোলনে জনসমর্থন দেখে তা দমানোর জন্য সরকার বঙ্গবন্ধুসহ দলের নেতাকর্মীদের ওপর ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার ও দলন, নিপীড়ন চালাতে থকে।

ছয় দফার মধ্যে প্রকৃতই স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত ছিল। সেটা বুঝতে পেরেই কথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে চিরতরে শেষ করে দিতে চেয়েছিল আইয়ুব খান সরকার। কিন্তু এরই মধ্যে শেখ মুজিবের ওপর জনগণের আস্থা আরো বেড়ে যায়। ছয় দফা ও ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার ভিত্তিতে সৃষ্ট তীব্র গণ-আন্দোলনের ফলে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সামরিক সরকার সেই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং বঙ্গবন্ধুসহ অভিযুক্তরা মুক্তি পান। ২৩ ফেব্রুয়ারি পল্টনে ছাত্র-গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন। জনগণের কাছে এই মামলা মিথ্যা প্রতীয়মান হওয়ার প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু বাঙালির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। একই সঙ্গে তৈরি হয় স্বাধীনতার জন্য প্রকাশ্যে দাবি তোলার পটভূমি। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর ঢাকায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ছয় দফার ভিত্তিতে এই নির্বাচনে অংশ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হলেও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য নানা চক্রান্ত শুরু করে। পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মার্চের ১ তারিখ অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বাতিল করলে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং স্বাধীনতার দাবি জোরালো হয়। ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে স্মরণকালের বৃহত্তম সমাবেশে তাঁর কালজয়ী ভাষণে সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ভাষণে তিনি 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' উল্লিখিত করে শত্রুর বিরুদ্ধে যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হওয়ার জন্য ছাত্র-জনতার প্রতি আহ্বান জানান। ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় সমস্ত প্রশাসন চলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পুলিশ, বিডিআরসহ নিরস্ত্র জনতার ওপর গণহত্যা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতন শুরু করলে বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেসসহ একাধিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর রাত প্রায় দেড়টার দিকে সেনাবাহিনী তাঁর বাসভবন আক্রমণ করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে ঢাকা সেনানিবাসে এবং পরদিন পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরই পূর্বনির্দেশনা অনুযায়ী তাঁর সহযোগী নেতাদের পরিচালনায় ছাত্র-জনতা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে প্রবাসী সরকার। তাঁর প্রতিকৃতি ও নির্দেশনাকে স্মরণ করেই ৯ মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করার মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে আনে বাঙালিরা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রায় ৫৫ বছর জীবনকালে প্রায় ১৩ বছরই কারাগারে কাটিয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও শ্বাসরুদ্ধকর

২৮৯ দিনের বন্দিজীবন কেটেছে তাঁর–মুক্তিযুদ্ধকালে, পাকিস্তানের কারাগারে। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে সামরিক আইনে এক প্রহসনের বিচারে তাঁকে ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। বাঙালি জাতির দৃঢ়প্রত্যয়, আন্তর্জাতিক মহলের চাপ ও নিজেদের স্বার্থ বিবেচনায় শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। অবশেষে সাড়ে ৭ কোটি মানুষের শ্বাসরুদ্ধকর প্রতীক্ষার প্রহর পেরিয়ে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে তিনি তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন জাতির পিতা হয়ে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বাধীনতার প্রয়োজনের কথা অনেকেই আকারে-ইঙ্গিতে, ঘরোয়া আলোচনায় বিভিন্ন সময় বললেও কেউ এই লক্ষ্যে জনগণকে একত্রিত বা সংগঠিত করে সুনির্দিষ্ট কোনো কার্যক্রম হাতে নিতে পারেননি। জেল-জুলুম সহ্য করে, মৃত্যুঝুঁকি মাথায় নিয়ে সময়োপযোগী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ধাপে ধাপে এক একটি বাধা অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধু স্বাধিকার আন্দোলনকে স্বাধীনতাসংগ্রামে রূপ দিয়েছেন, যা আর কারো সাহসে কুলোয়নি। তাঁর নেতৃত্বে এই সংগ্রামের ফলেই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। বিশ্বদরবারে বাঙালি পরিচিতি পায় আলাদা জাতি হিসেবে। এ জন্যই স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ ও বিশ্বদরবারে বাঙালিদের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিহাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লেখক : জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক (বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত), সম্পাদক- ইতিহাসের খসড়া

স্মার্ট এয়ারপোর্ট সার্ভিস

আবদুল মান্নান

আমাদের পৃথিবীটা অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে পাল্টে যাচ্ছে। পুরনো ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা সংযোজন করে নতুন কিছু করার চেষ্টা চলছে বিশ্বজুড়ে। এসবের মূল লক্ষ্য হলো, মানুষের জীবনযাত্রাকে আরো অনেক বেশি সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলা। প্রতিযোগিতা চলছে কে কত ইনোভেটিভ ওয়েতে দ্রুততার সাথে সহজে ইতিবাচকভাবে সেবাগ্রহীতার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সেবাটি পৌঁছাতে পারে। শুধু কি তাই, সেবাগ্রহীতার সন্তুষ্টির জন্য আরো কী কী করা যেতে পারে, তা নিয়েও চলে সবিস্তর গবেষণা। এটা তো বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত, একটি দেশের বিমানবন্দর থেকেই সে দেশের সম্পর্কে অনেক কিছুর ধারণা পাওয়া যায়। আমাদের দেশের বিমানবন্দরের সেবা নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ কমবেশি সকলেরই অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষও কমবেশি সচেতন। তারাও চেষ্টা করছে ধাপে ধাপে এসব সমস্যার সমাধান করার।

সারা বিশ্বেই বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন ঘটছে। বিশ্বের প্রায় সকল বিমানবন্দরের সেবাগুলোকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে এবং হচ্ছে। একদিকে যেমন বিমানবন্দরের নিরাপত্তাব্যবস্থাকে নিশ্ছিদ্র করা হচ্ছে, আবার ঠিক এর পাশাপাশি যাত্রীসেবা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বাংলাদেশে তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে। এগুলো হলো ঢাকায় হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং সিলেটে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এ ছাড়া কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বিমানবন্দরে রানওয়ের সম্প্রসারণসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন করার লক্ষ্যে অনেকটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ের দৈর্ঘ্য হবে ১০ হাজার ৭০০ ফুট, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘ রানওয়েসমৃদ্ধ বিমানবন্দরের মর্যাদা পাবে। এখানে উল্লেখ্য যে এই রানওয়ের ১ হাজার ৩০০ ফুট থাকবে সমুদ্রের মধ্যে। ভবিষ্যতে কক্সবাজার বিমানবন্দর আমাদের পূর্ব দিকের দেশ বিশেষ করে মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিফাইনসহ পূর্বমুখী দেশগুলোর সুপরিসর বিমানগুলোর এ বিমানবন্দর ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। কক্সবাজার বিমানবন্দরকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করে পূর্বমুখী দেশগুলোর বিমান খুব সহজেই পশ্চিমের বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। এর ফলে কক্সবাজারের পর্যটনশিল্প আরো বিকশিত হবে। সামগ্রিকভাবে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ চারটি বিমানবন্দরে অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের সুবিধা রয়েছে। এর পাশাপাশি দেশে আরো চারটি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর রয়েছে।

এগুলো হলো যশোর, রাজশাহী, সৈয়দপুর ও বরিশাল। সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করে সেখানে একটি আঞ্চলিক হাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যে পরিকল্পনা করেছে। বাংলাদেশের পতাকাবাহী ২১টি বিমান দিয়ে বাংলাদেশ বিমান চারটি মহাদেশের ১৬টি দেশে ফ্লাইট পরিচালনা করছে। বেসরকারি খাতের ইউএস-বাংলা ও নভোএয়ার নিয়মিত দেশে-বিদেশে ফ্লাইট পরিচালনা করছে। সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের অবকাঠামো, রানওয়ে, ট্যাক্সি ওয়ে, হ্যাংগার ও আমদানি-রপ্তানি পণ্য সংরক্ষণের শেডসমূহ সংস্কার ও উন্নয়ন সাধনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অনেক বিষয়েই এখন দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দিন দিন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। বিশ্ববাসীর আগ্রহের জায়গায় চলে এসেছে বাংলাদেশ। এরই ফলে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিদেশিদের বাংলাদেশে নিয়মিত যাতায়াত দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আমাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোতে যাত্রীসংখ্যা ও কার্গো হ্যান্ডলিং বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বর্ধিত চাপ সামাল দেওয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সর্বাধুনিক আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ-সুবিধাসহ হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি বিমানবন্দরে আদলে এটি নির্মিত হচ্ছে। সিঙ্গাপুরের রোহানি বাহরিনের নকশা বাস্তবায়ন করছে জাপানের দুটি কোম্পানি মিতসুবিশি ও ফুজিতা এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় স্যামসং কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড টেকিং করপোরেশন। বর্তমানে এক লাখ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে রয়েছে শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দুটি টার্মিনাল। আর তৃতীয় টার্মিনালটি হচ্ছে ২ লাখ ৩০ হাজার বর্গমিটার এলাকাজুড়ে। এটি নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ২১ হাজার ৩০০ কোটি টাকারও বেশি। এখানে থাকবে দুটি হাই স্পিড ট্যাক্সিওয়ে। যাতে বিমানগুলোকে বেশি সময় রানওয়ে না থাকতে হয়। বিমান বেশি সময় রানওয়েতে অবস্থান করলে অন্য বিমানের উঠানামা করতে সমস্যা হয়। গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য তিনতলা ভবন। যাতে একসাথে ১ হাজার ৩০০ গাড়ি পার্ক করা যাবে। দীর্ঘদিনের গাড়ি পার্কিংয়ের সমস্যার সমাধান হবে। ইতোপূর্বে গাড়ি পার্কিং বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তার জন্য সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হতো। গাড়ি পার্কিংয়েও থাকবে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা। হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বছরে বর্তমান ৮০ লাখ যাত্রীকে সেবা দেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে। তৃতীয় টার্মিনাল চালু হলে এ সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ২ কোটিতে উন্নীত হবে। যাত্রীদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হবে না। এ জন্য ১১৫টি চেক ইন কাউন্টার এবং ১২টি বোর্ডিং ব্রিজ, যা সরাসরি বিমানের সাথে সংযুক্তির ব্যবস্থা থাকবে। বহির্গমন ও আগমনী ইমিগ্রেশনের জন্য ৬৪টি করে কাউন্টার থাকবে এবং লাগেজ টানার জন্য ১৬টি অত্যাধুনিক কনভয় বেল্ট থাকবে। আগমনী কার্গো টার্মিনাল হবে ২৭ হাজার বর্গমিটারের। রাজধানীর কাওলা রেলস্টেশনকে তৈরি করা হচ্ছে শুধু হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক

বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালে যাওয়ার জন্য। এ ছাড়া মেট্রোরেল-১ কমলাপুর থেকে শুরু হয়ে বিমানবন্দরে সংযুক্ত হবে। এর পুরোটাই হবে পাতাল রেল। একই সাথে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে থেকে টার্মিনালে নামার জন্য সুড়ঙ্গ পথও থাকবে। হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যেসব যাত্রী ব্যবহার করবেন তাঁরা খুব সহজেই ঝামেলামুক্ত পরিবেশে দ্রুত নিরাপদে নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন। একইভাবে যাঁরা এ বিমানবন্দর ব্যবহার করে দেশের বাইরে যাবেন তাঁরাও বিমানবন্দরের সকল প্রকার আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পাবেন–এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের আকাশসীমায় ও বিমানবন্দরসমূহে চলাচলকারী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিমানের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের। সরকার বাংলাদেশের আকাশসীমায় ও বিমানবন্দরসমূহে চলাচলকারী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিমানের সময়ানুগ, দ্রুত ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিমানবন্দর, এয়ার ট্রাফিক, এয়ার নেভিগেশন, টেলিযোগাযোগ সেবা ও সুবিধা বিশ্বমানের পর্যায়ে পৌঁছাতে নানা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যাত্রীদের এয়ারপোর্টে ডিজিটাল সার্ভিস দেওয়া শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই। এয়ারপোর্টের সকল সার্ভিসই পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ই-গেট সুবিধা চালু করা হয়েছে। অত্যাধুনিক স্কিনিং মেশিন স্থাপনের মাধ্যমে পেসেঞ্জার ও কার্গো সিকিউরিটি স্কিনিংয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ছাড়া অত্যাধুনিক দুটি ইডিএস (এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিস্টেম) স্থাপনের মাধ্যমে কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহারকারীদের প্রধান ছয়টি অভিযোগ হলো ট্রলির স্বল্পতা, লাগেজে পেতে বিলম্ব, লাগেজ থেকে মূল্যবান জিনিস চুরি হওয়া, ইমিগ্রেশনে দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ, সেবাদাতার অসহযোগিতা, বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে পরিবহন ও নিরাপত্তার সমস্যা। কর্তৃপক্ষ স্মার্ট এয়ারপোর্ট ব্যবস্থাপনার আওতায় এ বিষয়গুলোসহ আরো যে বিষয়গুলোর ঘাটতি রয়েছে সেগুলো বিবেচনা নিয়ে পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করছে। ইতিমধ্যে ট্রলির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। লাগেজপ্রাপ্তির সময় কমিয়ে আনা হয়েছে। তৃতীয় টার্মিনাল চালু হলে এটি আরো কমে আসবে। লাগেজ থেকে মূল্যবান জিনিস চুরি ঠেকাতে সিসি ক্যামেরাসহ নিরাপত্তা ও পরিদর্শন জোরদার করা হয়েছে। বিমানবন্দরের সকল শ্রেণির কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং মোটিভেশন দেওয়া হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এয়ারপোর্ট এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কাজ করছে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে স্মার্ট বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনা এখন সময়ের দাবি। বিমানবন্দরের যাত্রীসেবা, কার্গো হ্যান্ডলিং, নিরাপত্তাব্যবস্থাসহ বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষ জনবল নিয়োগ এবং বিমানবন্দর ব্যবহারকারীদের সচেতন করতে সকল পক্ষকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে, তবেই কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে।

লেখক : সিভিল এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ ও সাবেক পরিচালক, সিভিল এভিয়েশন

বাংলাদেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেন?

পরীক্ষিৎ চৌধুরী

প্রশংসা না করে উপায় নেই। ঝুড়ির তলাটি এখন এটাই মজবুত যে তার স্বীকৃতি দিতেই হবে। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশের ঘুরে দাঁড়ানো শুরু, পরের দশকে তার স্বীকৃতি। কী রকম সেই ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পটি?

লন্ডনভিত্তিক ফিন্যানশিয়াল গ্লোবাল পাওয়ার ইনডেক্স পরিচালিত ন্যাশনাল ব্র্যান্ড ভ্যালু সূচকে ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে ভালো অবস্থানে উত্তরোত্তর অগ্রগতি অর্জন করেছে। ন্যাশনাল ব্র্যান্ডিং ভ্যালু একটি ধারণাসূচক; যা একটি দেশের সামষ্টিক আয়ের প্রবৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগতি, দারিদ্র্য নিরসনে সফলতা, ভ্রমণ বিষয়ে সুযোগ, সুশাসন এবং জ্ঞান-গরিমার কদর বিশ্লেষণ করে তৈরি করা হয়। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ভ্যালু ছিল ১৭ হাজার ৭০০ কোটি ডলার। ২০২২ সালে ৩৭ হাজার ১০০ কোটি ডলার। ২০২৩ সালে ৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ হাজার ৮০০ কোটি ডলারে উঠে যায়। যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতি হিসেবে সারা বিশ্বের স্বীকৃতি পেয়েছে। দারিদ্র্য নিরসনের একটি মডেল হিসেবে দেশের সুনামও এই সূচকে প্রতিফলিত।

অথচ গৌরবে দীপ্ত মুক্তিসংগ্রামে অর্জিত বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতার অন্যতম সুফল দারিদ্র্য নিরসনকে কটাক্ষ করে এবারের স্বাধীনতা দিবসে নির্মম উপহাস করা হয়েছে, যা পীড়াদায়ক। দেশের ভেতরে বসে ষড়যন্ত্রকারীরা সমালোচনা করছে, আন্তর্জাতিক পরিসরে কিন্তু তার বিপরীত চিত্র। প্রশংসায় ভাসছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পর যে দেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছিল একটি প্রভাবশালী দেশ। আজ সে দেশেরই মন্ত্রীরা তলার মজবুত অবস্থা দেখে কোরাস গানের মতো বাংলাদেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছেন। ঘুরে দাঁড়ানোর স্বীকৃতি হিসেবে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট অ্যান্টনি ব্লিনকেন বাংলাদেশকে ক্রমবর্ধনশীল আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতি, ক্রমবর্ধমান সুশিক্ষিত কর্মশক্তি এবং একটি গতিশীল যুব জনসংখ্যার সঙ্গে বাংলাদেশ দ্রুত একটি আঞ্চলিক নেতা হয়ে উঠছে। সে দেশেরই জনসংখ্যা, শরণার্থী ও অভিবাসনবিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব স্টেট জুলিয়েটা ভালস নয়েস বলেছেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ পুনর্গঠন এবং বর্তমানে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সার্বিক উন্নয়নের পথ তৈরি করে বাকি বিশ্বের কাছে একটি মডেল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বাংলাদেশ।

বন্দনাগীতি আরো নানা ফোরামেও হচ্ছে। বিশ্ববিখ্যাত সংবাদ সংস্থা ব্লুমবার্গও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও

'সময়োচিত সংস্কার পদক্ষেপ' গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য তারা এ প্রশংসা করেছে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের কারণেই এটা ব্যাপকভাবে প্রত্যাশিত বলে তারা মন্তব্য করেছে। 'ব্যালট বাক্সে পরাজিত হওয়ার ভয়ে বিশ্বজুড়ে সরকারি দলের নেতারা প্রায়ই সংস্কার বাস্তবায়নে পিছিয়ে পড়ছেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁদের মতো নন। ৭৫ বছর বয়সী শেখ হাসিনা এই পদক্ষেপ নিতে কোনো কুণ্ঠা বোধ করেননি। দ্রুত সংস্কার বাস্তবায়নের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটি ঘুরে দাঁড়িয়েছে, যেখানে পাকিস্তান এখনো জ্বালানি ভর্তুকি নিয়ে দুরবস্থার মধ্যে রয়েছে। শ্রীলঙ্কা স্থানীয় পৌরসভা নির্বাচন বিলম্বিত করেছে।' ব্লুমবার্গের পর্যবেক্ষণে এমন কথাই উঠে এসেছে। পাশাপাশি আরো একটি সংবাদ আমাদের গৌরবান্বিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির প্রশংসা করে মার্কিন কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫২তম বার্ষিকী উপলক্ষে এ প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয়।

কংগ্রেসনাল বাংলাদেশ ককাসের পক্ষ থেকে সাউথ ক্যারোলিনার রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান জো উইলসন প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাসব্যাপী বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী এবং এর দোসরদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের কথা প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয়, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ ছিল গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সংগ্রাম। উইলসন কংগ্রেসে বাংলাদেশবিষয়ক কমিটির সহসভাপতি। প্রস্তাবে বলা হয়, বিগত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ ব্যাপক উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধন করেছে। বিশ্বের দ্রুতবর্ধনশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি, যার মাথাপিছু জিডিপি বেড়ে ২০২১ সালে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৪৫৭ মার্কিন ডলারে, যা এখন তার আঞ্চলিক প্রতিবেশীর চেয়ে অনেক বেশি। রেজল্যুশনে আরো উল্লেখ করা হয়, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি ৯ বিলিয়ন থেকে ৪৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে, গড় আয়ু ৪৭ বছর থেকে বেড়ে ৭৩ বছর হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদন, দারিদ্র্য হ্রাস, উন্নত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ প্রশমনসহ আর্থ-সামাজিক খাতে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি দেশে সফলভাবে উগ্রবাদ দমন করা এবং বন্দুকের কর্তৃত্ববাদী শাসনের পরিবর্তে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের প্রতি জনগণের সমর্থন বজায় রাখতে সক্ষম হওয়ারও প্রশংসা করা হয়েছে। এদিকে বাংলাদেশের অর্থনীতি পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার সঙ্গে তুলনীয় নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান অর্থনীতিবিদ হ্যানস টিমার। তাঁর মতে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। তবে এগুলো শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের সংকটের সঙ্গে তুলনীয় নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়ন ও সাফল্যের কিছু তুলনামূলক চিত্র পর্যালোচনা করলেই এই প্রশংসার তাৎপর্য স্পষ্ট হবে। ২০০৬

সালে বাংলাদেশের বাজেট ছিল ৬১ হাজার ৬ কোটি টাকা, যা ২০২২-এ দাঁড়িয়েছে ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। জিডিপি ৫.০৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। গত ১০ বছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রবৃদ্ধি হয়েছে গড়ে ৬ শতাংশের বেশি। করোনা মহামারির মধ্যেও প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.৪ শতাংশ। করোনার আগে ২০১৫ থেকে ২০১৯ সময়কালে বাংলাদেশের জিডিপি বেড়েছে গড়ে ৭.৪ শতাংশ। ভারতে এ হার ছিল ৬.৭। পাকিস্তানে ৫ শতাংশের নিচে।

জিডিপির আকার বর্তমানে ৪১৬ বিলিয়নেরও বেশি, যা ২০০৬-এ ছিল ৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকা। মাথাপিছু আয় ৫৪৩ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৮২৪ মার্কিন ডলার। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি খাতে সরকার ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা ব্যয় করছে। এর উপকারভোগীর সংখ্যা ৪.৫ কোটি। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ৫২.৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০০৬-২০০৭-এ ছিল ১০.৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সাক্ষরতার হার ৫৩.৫০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৬ শতাংশ হয়েছে। ২ কোটি ৫৩ লক্ষ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তি খাতে ১৫ বছর আগেও কোনো পরিকল্পনা বা উদ্যোগই ছিল না। অথচ আজ শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশে আইসিটি খাতে রপ্তানি ১৪০ কোটি মার্কিন ডলার। দেশে ফ্রিল্যান্সিং পেশাজীবীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি, ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিজিটাল সেন্টার হয়েছে ৮ হাজার ৮১২টি, এগুলোতে যেকোনো ব্যক্তি ৩৫৯ ধরনের সেবা পাচ্ছে। হাতের মুঠোয় সহজে সেবা ধরা দিচ্ছে, ২০০৮-এর আগে প্রান্তিক মানুষরা এসব ভাবতেই পারত না। অর্থনীতিবিদ ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, কৃষিপ্রধান থেকে শিল্প ও সেবাপ্রধান অর্থনীতিতে রূপান্তর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আধুনিকায়ন এনেছে। তাঁদের মতে, তৈরি পোশাক খাত এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো রেমিট্যান্সও বাংলাদেশের অর্থনীতির রূপান্তরে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। তার ফলে যে বাংলাদেশ ১৯৭৫-৭৬ সালে মাত্র ৩৮০ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করত, সেই বাংলাদেশ এখন বছরে ৫২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পণ্য রপ্তানি করে। চলমান অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে মোট ৪ হাজার ১৭২ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। আগের বছরের একই সময় রপ্তানি হয়েছিল ৩ হাজার ৮৬১ কোটি ডলারের পণ্য। পাঁচ দশকে মাত্র ৯০০ কোটি ডলারের গরিব অর্থনীতির বাংলাদেশ কীভাবে অসাধারণ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে এখন ৪৬.৫ হাজার কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে; মানুষের গড় আয়ু ৪৭ থেকে ৭৩ বছর হয়েছে এবং বয়স্ক শিক্ষার হার ৭৫ শতাংশে পৌঁছেছে; সেই গল্প নিঃসন্দেহে বাকি বিশ্বের জন্য মডেল। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের সপ্তম দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ।

এমডিজির অনেক সূচক অর্জন করে বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে বাংলাদেশ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের লক্ষণীয়

অগ্রগতি রয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে গত বছর ব্রিটেনের দি ইকোনমিস্ট ৬৬টি সবল অর্থনীতির তালিকা প্রকাশ করে, যেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল নবম। বাংলাদেশ এখন নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দেশটি এগোচ্ছে। গত বছর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির সামনে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর রূপকল্প দিয়েছেন। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার মূল চাবিকাঠি হবে তাঁরই হাতে গড়ে ওঠা দেশব্যাপী জালের মতো ছড়িয়ে থাকা ডিজিটাল সংযোগ। স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজের জন্য ডিজিটাল সংযোগ মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। উন্নয়নের নতুন স্তরে যাওয়ার পথে বাংলাদেশের জন্য বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। সঠিক নীতি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে সেগুলো মোকাবিলা করতে হবে। এলডিসি থেকে উত্তরণ ঘটলে বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার সুবিধা অনেক কমে যাবে। এ কারণে আগামী পাঁচ বছরের উত্তরণকালীন প্রস্তুতি বাংলাদেশের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই উত্তরণে এসডিজি, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয় করে উত্তরণের শক্তিশালী কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের। স্থানীয় বাজার ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, কর্মসংস্থান বাড়ানো, অবকাঠামো উন্নয়ন, দুর্নীতি রোধ, মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবার প্রসারসহ অনেক বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়ার সুপারিশও করছেন তাঁরা।

নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বড় চ্যালেঞ্জ হবে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলা। প্রযুক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জও রয়েছে। এলডিসি থেকে উত্তরণ হলে কী করণীয়, তা নিয়ে ত্বরিত পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নে ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন। উন্নয়নের সুফল যাতে বেশির ভাগ লোকের কাছে পৌঁছায়, সে ক্ষেত্রেও তৎপর থাকতে হবে। নজরদারি ও জনস্বার্থের দেখভাল করা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা ও দক্ষ জনশক্তির উন্নয়ন, বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা-চেতনা, প্রযুক্তির ক্রমাগত ব্যবহার বৃদ্ধি এবং একটি পরমতসহিষ্ণু জাতি গঠনই নির্ধারণ করবে বাংলাদেশের আগামী দিনের অগ্রযাত্রা। আশার কথা, সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায় এ দিকগুলোতে নজর দিচ্ছেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছেন। আহমদ ছফা লিখেছিলেন, 'বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য চর্যাপদ নয়, বৈষ্ণব গীতিকা নয়, সোনার তরী কিংবা গীতাঞ্জলি কোনোটা নয়, বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগীতি হলো 'আর দাবায়ে রাখতে পারবা না'। বঙ্গবন্ধুর সেই কাব্যিক কথা মনে পড়ে যায়। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'সাত কোটি মানুষকে আর দাবায়ে রাখতে পারবা না। বাঙালি মরতে শিখেছে, তাদের কেউ দাবাতে পারবে না।'

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে দাবিয়ে রাখতে অযৌক্তিক সকল বিতর্কের খড়কুটো ইতিহাসের মূলধারার প্রবল স্রোতে নিমিষেই ভেসে যাচ্ছে এবং যাবে।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

গুজবসচেতন সন্তান চাই

নাসরীন মুস্তাফা

ভুয়া তথ্য, মিথ্যা তথ্য, তথ্যের ঘাটতি দিয়ে বানানো কু তথ্যকে গুজব বানিয়ে ভাইরাল করার নেশা কুচক্রীদের কাছ থেকে শিশু-কিশোরদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ুক, এ নিশ্চয়ই আমরা চাই না। এখনকার শিশু-কিশোরদের কাছে ইন্টারনেটের জগৎ কত সহজেই না উন্মুক্ত করে রেখেছি। অপরিচিত মানুষের সাথে মিশো না, এ কথা মুখে বললেও দিব্যি আদরের সন্তানকে অন্তর্জালের অপরিচিত অজানা জগতে ছেড়ে দিচ্ছি একা আর ভাবছি স্মার্ট হয়ে উঠছে সে! ডিভাইস টিপতে পারা স্মার্ট সন্তানকে সচেতন বানানোর কাজটি করতে হবে এবং এই কাজটি মাদক থেকে দূরে থাকার সচেতনতা সৃষ্টির মতোই খুব জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ।

ভেবে দেখুন, দিনের বেশির ভাগ সময় সন্তানরা কম্পিউটার, মোবাইল ফোন আর ট্যাবলেটে সময় কাটাচ্ছে। অনেক জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের হাতিয়ার এগুলো। লেখাপড়ার উপকরণ চোখের পলকে মিলে যায়। কোডিং শিখে ফেলা, অন্য ভাষা শিখে ফেলা এখন ওদের কাছে পানির মতো সহজ বিষয়। এর সাথে সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, অনলাইন গেমস আর ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্মে কত কত অসত্য বা মিথ্যা বা ভুয়া তথ্য গুজবের আকারে ওর মস্তিষ্কে পৌঁছে যাচ্ছে, সেটাও আমাদের দরকার মা-বাবা হিসেবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদর্শন করে সন্তানকে ডিজিটাল দুনিয়া থেকে সরিয়ে আনবেন? পারবেন কি? পারার দরকারই বা কী। এর চেয়ে গুজবসচেতন সন্তান হিসেবে ওকে গড়ে তোলা দরকার। কেননা, এই গুজবে ভরপুর পৃথিবীতে সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে টিকে থাকতে ওকে কিন্তু একলা একা লড়াই করতে হবে।

'গোয়েন্দা' চরিত্র শিশু-কিশোরদের দারুণ পছন্দের। সন্তানকে 'গোয়েন্দা' হতে বলুন, দেখবেন সানন্দে রাজি হবে। এই গোয়েন্দা সত্যের চিপায় লুকিয়ে থাকা মিথ্যা গুজব খুঁজে বের করতে পারে। সন্তানকে বলুন, গোয়েন্দা হতে হলে ওকে জানতে হবে, ভুয়া তথ্য কী ও কত প্রকার, ভুয়া তথ্য চেনার উপায়, ভুয়া তথ্য চেনা ও বিশ্বাস না করা কেন জরুরি ইত্যাদি। গোয়েন্দা দারুণ বুদ্ধিমান। প্রথমেই প্রশ্ন করবে, গুজব বানায় কারা? কী লাভ গুজব বানিয়ে? এর উত্তরে অর্থই সকল অনর্থের মূল, এ কথা খোলাখুলিভাবে বলতেই হবে। সব লাভের লাভ তো অর্থই। অর্থলোভী, সুবিধাভোগী কুচক্রীদের হাতিয়ার গুজব। এরা কখনো একা, কখনো দলবদ্ধ। গুজব এরা নিজেরা বানায় অথবা গুজব বানাতে পারদর্শী কাউকে দিয়ে

বানায়। গুজব বানিয়ে প্রচুর অর্থ হাতিয়ে নেওয়া যায়। বিজ্ঞাপন আকারে অর্থ মেলে। ভিডিও কনটেন্ট বানিয়ে মানুষ দেখলে দর্শকের সংখ্যা গুণে অর্থ জোটে। অর্থের বিনিময়ে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিশ্বাস বা মতাদর্শের প্রচার করা যায়, যাতে তারা অনুসারী পায় বেশি বেশি। যত অনুসারী, তত পেশিশক্তি, তত ভয় কুড়ানো আর যার প্রতি ভয়ের পাল্লা বেশি তার পায়ে অর্ঘ্যদানও বেশি বেশি। ভুয়া তথ্য বিনোদনের শক্ত মাধ্যমও বটে। এসব রসাতলে গেল কিংবা বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হয়ে গেল টাইপের খবরে মস্তিষ্কে উত্তেজনার প্রবাহ পেতে আনন্দ পায়, এমন মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতায় কত কথাই না বলছি। নিজের কথা, নিজের বিশ্বাস, নিজের মতাদর্শ অন্যকে জানিয়ে বা শুনিয়ে বিপুল আনন্দ দেয়। সে কথা সব সত্য না হলেও শোনাতে ইচ্ছে হয়। এভাবেই তৈরি করছি গুজব। গোয়েন্দা এবার জানুক গুজব বানানোর হাতিয়ার কী কী। সত্য কথার ভাত নেই, এমন কথা আমরা বড়রা হরহামেশাই বলি। সন্তানরাও নিজের অবচেতনে বুঝে নেয়, মিথ্যা কথাই বেশি শক্তিশালী। মিথ্যা আবার পুরোপুরি মিথ্যা নয়। সত্যের সাথে মিশিয়ে বললে বেশি পোক্ত হয়। সত্য পুরোপুরি না বলে কিছু তথ্য লুকিয়ে ফেললে বা উদ্দেশ্যমূলক সত্য তথ্য ঢুকিয়ে দিলেও কিন্তু কেল্লা ফতে। সত্য প্রকাশে অনড়-অটল পত্রপত্রিকাগুলো এ রকম হরহামেশাই করছে। এরপর কৌশলী প্রচারণায় দলভুক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দিয়ে বারবার প্রচার করতে হবে, আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই পূর্ণ সত্য। জেনে-বুঝে তথ্যের ঘাটতি করেও গুজব বানানো যায়। কারোর সুনাম ক্ষুণ্ন করতে, কোনো প্রতিষ্ঠানকে ধসিয়ে দিতে সব তথ্য না বলে কিছু তথ্য উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে গায়েব করে ফেলা হয়। ক্ষুব্ধ পক্ষ এরপর মানহানির মামলা করতে পারে, তবে তত দিনে মানের ক্ষতি কিন্তু হয়েই গেল। আর মানুষ সব সময় নেতিবাচক তথ্য গ্রহণ করে বেশি।

গোয়েন্দাদের ম্যাগনিফাইং গ্লাস থাকে, থাকে যেকোনো ঘটনাকে ভিন্নদৃষ্টিতে দেখার ও সমস্যা সমাধানে ভিন্নভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা। ভুয়া তথ্য শনাক্ত করার কিছু উপায় জেনে ফেলবে প্রিয় গোয়েন্দা। যেমন–বাক্যে প্রনাউন বা সর্বনামের ব্যবহার, পরিসংখ্যান, তারিখে গণ্ডগোল ইত্যাদি 'এরর' টের পেতে হবে। আর উচ্চারণে অপেশাদারি, আঞ্চলিকতা, অশুদ্ধতা বুঝতে কান হতে হবে সজাগ। বুঝতে হবে, যা বলা হচ্ছে তা কি ঠাট্টা করে বলছে, বিজ্ঞাপন হিসেবে বলছে, নাকি সত্য হিসেবে সিরিয়াসলি বলা হচ্ছে। না বুঝে বা বুঝে এ রকম অনেক ঠাট্টা ও বিজ্ঞাপন জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যায়েও গুজব আকারে ছড়িয়ে পড়ে, চিলের কান নিয়ে যাওয়ার মতো। গুজবে কান দেওয়া 'জোকার' হতে চায় কে? বিনা স্বার্থে কেউ চায় না। তারিখে গণ্ডগোলের বিষয়টা আরেকটু বাড়িয়ে বলি। গরমের ওয়াজ শীতকালে দিতে হয় না যেমন, তেমনি বসন্তকালে ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে বরফ পড়ছে জাতীয় খবর

বিশ্বাসযোগ্য নয়। তেমনি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দাকালে বাড়ির পাশের বাজারে জিনিসের দাম চড়ে গেলে মাথা একটু কম গরম করে নিজের খাবারে বিকল্প খুঁজতে হবে। সেদিন দেখলাম, প্রথম শ্রেণির এক জাতীয় দৈনিক চিনির দাম বেড়ে যাওয়া বিষয়ক আবেগী প্রতিবেদনে মধ্যবিত্ত পরিবারের কষ্ট জানাতে গিয়ে লেখা হলো, যে পরিবারে চার-পাঁচ কেজি চিনি লাগত মাসে, সেখানে এখন তিন-চার কেজি চিনি লাগছে। এত দিন জানতাম চিনি খাওয়া ভালো না, চিনিকে চিনতে হবে না বলে বিজ্ঞাপনও দেখি। চার-পাঁচ কেজি চিনি হজম করা পরিবার এখন চার-তিন হজম করছেন। সিরিয়াসলি?

ভুয়া খবরের নির্ভরযোগ্য উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না, জানতে হবে তাকে। প্রায়ই বাংলাদেশ নিয়ে 'এইমাত্র পাওয়া' ভয়াবহ খবরের ডিজিটাল কনটেন্ট চোখে পড়ে, যেখানে ভয়াবহ বিজ্ঞ বক্তা নির্দিষ্ট উৎস না বলে তিনি শুনেছেন জানিয়ে শোনা কথা অন্যকে জানানোর দায়িত্ব পালন করতে তৎপর হন দেখেছি। ঘটনা যার সাথে ঘটেছে, যেখানে ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য দায়িত্বশীল তথ্যসূত্র না থাকলে সে তথ্য অবশ্যই গুজব। অন্যের কাছ থেকে শোনা তথ্য কখনো প্রাইমারি সূত্রের সমান মূল্যবান হতে পারে না। ভুয়া ওয়েবসাইট থেকে ভুয়া তথ্য মেলে, এই সঠিক ও জরুরি তথ্যটি সন্তানকে গোয়েন্দা হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। ভুয়া তথ্য মূলধারার উৎসে খুঁজতে গেলে পাওয়া যাবে না। এমন ভাব, এক্সক্লুসিভ এই তথ্য কেবল অমুকই জানে, এইমাত্র জেনেছে আর কি!

সত্য তথ্য সাধারণত নির্মোহভাবে উপস্থাপিত হয়। 'এইমাত্র পাওয়া' টাইপের ডিজিটাল গুজবে আবেগের ছড়াছড়ি, চোখে-মুখে এমন ভাব ফুটিয়ে তোলা হয় যে দয়া করে বিশ্বাস করুন, নইলে আপনার সাথে সাথে আপনার দেশ-জাতি উচ্ছন্নে তথা শ্রীলঙ্কা হয়ে যাবে। কয়েক দিন আগে একজনকে হাউমাউ করে কাঁদতেও দেখলাম, সাথে হাত-পা ছোড়াছুড়ি। ভিউ ছিল চুরানব্বই হাজার। এই কান্নাকাটি দেখে একজনও যদি তাকে বিশ্বাস করে ফেলে, সেটাও ক্ষতি। মিথ্যার শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া ঠিক নয়, তা যত ক্ষুদ্র পরিমাণেই হোক না কেন।

গুজবের বিষয়ের কোনো শেষ নেই। কার ছাদে ইউএফও নেমেছে বা কার সাথে এলিয়েনের দেখা হয়েছে জেনে গোয়েন্দা সন্তান শিহরিত হবে না। কেননা, সে খোঁজ নেবে বাড়ির ছাদটা এবং ব্যক্তিটা এলিয়েন বিশেষজ্ঞ কেউ কি না। রিজার্ভ নিয়ে কত রকমের তথ্যে সয়লাব ডিজিটাল দুনিয়া, এর ভেতরে রিজার্ভ বিশেষজ্ঞ কজন? সবাই রাতারাতি অর্থনীতিবিদ বনে গেলে বছরের পর বছর লেখাপড়া করে, গবেষণা করে অর্থনীতিবিদ হওয়ার দরকার আছে বলে মনে হয় না।

গুজবীয় সংবাদে ব্যবহৃত ছবি, ভিডিও বানানো হয়। অন্য সংবাদের, অন্য দেশের সংবাদের ছবি, ভিডিও চোখ বুজে চালিয়ে দেওয়া গুজবীয় অভ্যাস। আজকাল ছবি,

ভিডিও, তথ্য ভুয়া কি না, তা ধরতে অনেক সফটওয়্যার এসে গেছে। গোয়েন্দা সন্তান খোঁজ নিলেই জেনে ফেলবে এসব। হেডিংয়ের সাথে ছবি ও ভিডিওর মিল থাকে না প্রায়ই। হেডিংয়ের লোভে পড়ে তথ্য জানতে ক্লিক করলেই তো অর্থ মিলছে, নৈতিকতার প্রশ্ন করা যায় না। কেননা গুজবের বিবেক নেই বলেই আমরা বিশ্বাস করি। আমরাও এও বিশ্বাস করি, যারে দেখতে নারি তার চলন সত্যি সত্যি বাঁকা না হলেও বাঁকা হিসেবে সৃষ্ট গুজব বিশ্বাস করতে আপত্তি নেই। পক্ষপাতিত্ব মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কাজেই তথ্য যিনি দিচ্ছেন, তাঁর ঠিকুজি সন্ধান করলেই বোঝা যায় তথ্যটি পক্ষপাতদুষ্ট কি না। আমাদের দেশে যেমন অতজন বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষরিত বিবৃতিবিষয়ক সংবাদে বিবৃতিদাতাদের নাম আগে দেখতে হয়, তাহলে বিবৃতিতে কী বলেছেন পুরোটা না পড়লেও বুঝে নেওয়া যায়। আমরা জেনে গেছি, এ রকম বিবৃতির বাইরে অমুক যাবেন না, আবার অমুক এ রকম বিবৃতিতে আসবেনও না।

এ রকম বিবৃতিদাতা হয়ে বড় হয়ে উঠুক সন্তানরা, তা চাইতে পারেন না কোনো সচেতন অভিভাবক।

লেখক : উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ

মাসুদ মনোয়ার

কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে এক অনন্য উদাহরণ মোহাইমেনা বেগম। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছেন। সাধারণ পরিবারের মানুষের জীবনে সচরাচর যেসব ঘটনা ঘটে, ঠিক তেমনি ঘটনাই ঘটেছে মোহাইমেনার জীবনে। বয়স যখন আট তখন ছোট ভাইয়ের জন্মের সময় মায়ের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু, পারিবারিক বিপর্যয়–এ সবই ঘটছে তাঁর জীবনে। কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি। তিন বোন আর এক ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার বড়। সংগত কারণেই কিশোরীকালেই তাঁকে বাবার সংসারের হাল ধরতে হয়। দাদির সাহায্যে সব ভাইবোনকে লালন-পালনের পাশাপাশি নিজের পড়াশোনাও চালিয়ে যেতে হয়। এসএসসি পাস করার পর বাবার উৎসাহে মহিলা পলিটেকনিক কলেজে ইলেক্ট্রনিকস ট্রেডে ভর্তি হন। ডিপ্লোমা পাসের পর একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি নেন। এরপর ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে যোগ দেন। চাকরিরত অবস্থায় শেষ করেন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যাচেলর ডিগ্রি। এরপর ধাপে ধাপে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে পদোন্নতি পেয়ে আজ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের প্রধান প্রকৌশলী পদে কর্মরত থেকে ওই প্রতিষ্ঠানকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি ভিত্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এগুলো হলো স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি। স্মার্ট সিটিজেন তৈরি করতে হলে আমাদের সুশিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করতে হবে। সরকার 'এসপায়ার টু ইনোভেট–এটুআই' তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর নাগরিক সেবা সহজীকরণে নানা উদ্বোবনী উদ্যোগে সহযোগিতা করছে। ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে স্মার্ট সিটি ও স্মার্ট ভিলেজ বিনির্মাণে সহযোগিতা করছে এটুআই। ই-পার্টিসিপেশনে ২০ ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ৭৫তম এবং জাতিসংঘ ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে ৮ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫১ লাখেরও বেশি। এর মধ্যে পুরুষ ৮ কোটি ১৭ লাখেরও বেশি আর মহিলা ৮ কোটি ৩৩ লাখেরও বেশি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২২ শতাংশ। বিশ্বে বর্তমানে কমবেশি ১৭৪টি দেশে ১ কোটি ২০ লাখেরও বেশি বাংলাদেশি কর্মরত আছে। শুধু ২০২২ সালে বাংলাদেশ থেকে ১১ লাখেরও বেশি কর্মী বিদেশে গেছে। এর মধ্যে ২ লাখেরও বেশি দক্ষ শ্রমিক এবং ৯ লাখেরও বেশি অদক্ষ শ্রমিক। ২০২১-২২ সালে এসব প্রবাসী বৈধ চ্যানেলে প্রায় ২১.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এক লাখেরও বেশি নারী কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের

থেকে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স আসার কথা, তা আসছে না। এর অন্যতম কারণ হলো দক্ষ জনবলের অভাব। প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে সারা পৃথিবী এখন প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে যাচ্ছে। আগের মতো কায়িক শ্রমের স্থান দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে। ফলে আমাদের দেশের অদক্ষ জনবল তাদের কাজ হারাচ্ছে। এশিয়া এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার কায়িক শ্রমিকদের মধ্যে বাংলাদেশের শ্রমিকদের মজুরি সবচেয়ে কম। বিদেশে বাংলাদেশি কায়িক শ্রমিকদের মজুরি গড়ে মাসিক ২০০ ডলারের সামান্য বেশি। ঠিক এ কাজেই ভারতীয়দের মজুরি ৪০০ ডলারেরও বেশি, চীনের প্রায় সাড়ে ৫০০ ডলার এবং ফিলিপিনোদের প্রায় ৬০০ ডলার। আমাদের দেশের শিল্প-কলকারখানায় দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। দেশের সবচেয়ে বড় তৈরি পোশাক খাতে ২০ শতাংশ দক্ষ জনশক্তির ঘাটতি রয়েছে। আর এ সুযোগটি গ্রহণ করছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলো। তাদের কয়েক হাজার দক্ষ জনবল আমাদের তৈরি পোশাক শিল্পে কাজ করছে এবং তাদের উচ্চ বেতন দিতে হচ্ছে। অথচ আমাদের শ্রমিকরা বিদেশে খুব কম বেতনে কাজ করছে। আমাদের প্রবাসী শ্রমিকদের ৬২ শতাংশ অদক্ষ, ৩৬ শতাংশ আধা দক্ষ এবং মাত্র ২ শতাংশ দক্ষ। এদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে প্রায় ২৫ শতাংশ, নিম্ন মাধ্যমিক শেষ করেছে কমবেশি ২৬ শতাংশ, মাধ্যমিক পাস করেছে ২৩ শতাংশের কিছু বেশি আর উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছে কমবেশি ১২ শতাংশ। ভাবতে কষ্ট লাগে আমরা বিদেশি দক্ষ জনবল নিয়োগ দিয়ে তাদের উচ্চ বেতন দিচ্ছি, আর আমাদের ছেলেরা নামমাত্র বেতনে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ করে মানবতার জীবন অতিবাহিত করছে।

আমাদের দেশে প্রশিক্ষণকে সবচেয়ে অবহেলা করা হয়। যদিও গত এক দশকে এ ধারণাটি অনেকটা বদলেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতাপূর্ণ শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনশীলতা কমবেশি ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং এর প্রভাবে মজুরি বৃদ্ধি পায় দেড় শতাংশের মতো। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শ্রমিকের সাথে অদক্ষ শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার পার্থক্য কমবেশি ৮ শতাংশের মতো। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক গেছে সৌদি আরব (সাড়ে ছয় লাখেরও বেশি), ওমান (প্রায় এক লাখ বিশ হাজার), সংযুক্ত আরব আমিরাত (তিরাশি হাজারেরও বেশি), সিঙ্গাপুর (চুয়াল্লিশ হাজারেরও বেশি)। আর সবচেয়ে কম শ্রমিক গেছে নাইজেরিয়া (২২ জন), ইকুয়েডর (২৪), শ্রীলঙ্কা (৭৬) এবং সুদান (৮০ জন)। দেশে-বিদেশে সব জায়গায় এখন দক্ষ জনবলের চাহিদা বেশি। কোনো প্রতিষ্ঠানই অদক্ষ বা আধা দক্ষ জনশক্তিকে চাকরি দিতে আগ্রহী হয় না। আমাদের তৈরি পোশাক খাতে যেমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী শ্রমিকরা কাজ করছে এবং এ খাতে তাদের চাহিদাও আছে, তেমনি বিদেশে বিশেষ করে জর্ডান, মরিশাস, সিশেলস, কুয়েত, ক্রোয়েশিয়া, জাপান, হংকংসহ বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কুমিল্লা জেলা থেকে এক লাখেরও বেশি মানুষ কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে গেছে। এরপর আছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া

(৬১ হাজারেরও বেশি), চট্টগ্রাম (৫১ হাজারেরও বেশি), চাঁদপুর (প্রায় ৪২ হাজার) এবং সবচেয়ে কম মানুষ কাজ নিয়ে বিদেশে গেছে বান্দরবান (৬৫৮), পঞ্চগড় (৬৮৩), লালমনিরহাট (৭২৮) এবং রাঙামাটি (৮৩৫ জন) থেকে।

সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে গড়ে প্রতি উপজেলা থেকে এক হাজার দক্ষ শ্রমিক বিদেশে প্রেরণের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রামে একটি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন করা হয়েছে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতাধীন ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, ৬৪টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারসহ মোট ৭০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান উপযোগী ৫৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কারিকুলাম তৈরি করে তার মানোন্নয়ন এবং দক্ষতা সনদ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স, হাউজ কিংপিং ও প্রি-ডির্পারচার ওরিয়েন্টেশন কোর্সের ভর্তি থেকে শুরু করে পুরো কোর্স অনলাইনে সম্পন্ন করে সনদপত্র ও অনলাইনে দেওয়া হচ্ছে। এতে করে প্রশিক্ষণার্থী দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকেই পছন্দের প্রতিষ্ঠান হতে পছন্দ অনুযায়ী এ কোর্সগুলো সম্পন্ন করতে পারবেন। এতে অর্থ ও সময় বাজবে। ইতিমধ্যে এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮ লাখ ৫৬ হাজারেরও বেশি প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রাক বহির্গমন ওরিয়েন্টেশন সনদ প্রদান করছে। এর মধ্যে ৩৮ হাজার ৫৭৯ জন মহিলা রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ নিয়ে ২০২১-২২ অর্থ বছরে দক্ষ জনবল হিসেবে ১ লাখ ৯৭ হাজারেরও বেশি এবং স্বল্প দক্ষ জনবল হিসেবে ২৪ হাজারেরও বেশি কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। দেশে-বিদেশে দক্ষ ড্রাইভারের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারি অর্থায়নে ১ লাখ ২ হাজার ৪০০ জনকে দেশের ৬৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৩ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

শ্রমিকদের মজুরি নির্ভর করে কাজের দক্ষতা ও দর-কষাকষির সক্ষমতার ওপর। দর-কষাকষির সক্ষমতা নির্ভর করে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ভাষার দক্ষতার ওপর। আমাদের প্রবাসী শ্রমিকদের কম মজুরি মূল কারণ হলো প্রশিক্ষণ, শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষার ওপর দখল না থাকা। বর্তমান সরকার আমাদের প্রবাসী শ্রমিকরা যেসব দেশে কাজ করছে তাদের সুবিধা-অসুবিধা, সমস্যা-সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে কোন দেশের জন্য কী দক্ষতার জনবল তৈরি করা দরকার তা নির্ধারণ করে সে মোতাবেক জনবল তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

এ সমস্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে স্মার্ট সিটিজেন তৈরি সম্ভব হবে।

লেখক : শিক্ষক, যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার

ভ্রমণে পছন্দের শীর্ষে রেলপথ

মো. শরিফুল আলম

বাংলাদেশ রেলওয়েকে আধুনিক, যুগোপযোগী গণপরিবহন মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। রূপকল্প-২০২১, রূপকল্প-২০৪১, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য-২০৩০ অর্জনসহ একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারের ধারাবাহিক সহযোগিতায় রেলওয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে। ৩০ বছর মেয়াদি Railway Master Plan, সরকারের অনুমোদিত অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি ও নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮ অনুযায়ী বাংলাদেশে রেল যোগাযোগব্যবস্থা উন্নতকরণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে রেলপথ বিভাগকে গত ৪ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত ৮৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

নিরাপদ ও তুলনামূলক কম খরচে পরিবহন সেবা প্রদানে বাংলাদেশ রেলওয়ে কাজ করছে। এ ছাড়া তুলনামূলক পরিবেশদূষণ, স্বল্প জ্বালানি খরচ ও দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি কম হওয়ার সুবাদে রেলওয়ে অধিক জনপ্রিয় পরিবহন মাধ্যম। বাংলাদেশের রেল যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় জনসাধারণের যাতায়াত আরো সহজ হচ্ছে এবং পরিবহন ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পাচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, শিল্পায়নের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটছে এবং দারিদ্র্য হ্রাসসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। কালের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় প্রশাসনিক সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ে বর্তমান ব্যাপক উন্নয়ন পর্যায়ে এসেছে। রেলওয়ে দেশের বর্তমান পরিবহন চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ খাতে উন্নয়নের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। সমন্বিত বহুমাত্রিক যোগাযোগব্যবস্থায় রেলওয়ে দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বা মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। ইতোমধ্যে নতুন রেললাইন নির্মাণ, পুরাতন রেললাইন পুনর্বাসন, মিটারগেজ লাইন ডুয়েল গেজে রূপান্তর, লোকোমোটিভ, যাত্রীবাহী কোচ ও মালবাহী ওয়াগন সংগ্রহ ও পুনর্বাসন, সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, নতুন ট্রেন সার্ভিস চালুসহ বেশ কিছু সাফল্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে অধিকতর জনবান্ধব হিসেবে প্রতিভাত করেছে। টেকসই উন্নয়ন অর্জনসহ একুশ শতকের

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারের ধারাবাহিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে সারা দেশে চলাচলকারী যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা ৩৯৪টি। আন্তঃনগর ট্রেন ১০৪টি, মেইল এক্সপ্রেস এবং কমিউটার ট্রেন ১৪০টি, লোকাল ট্রেন ১০৮টি। মিটারগেজ এসি কোচ ১৩০টি, নন-এসি কোচ ১০৭৩টিসহ মোট ১২০৩টি। ব্রডগেজ এসি কোচ ৮৬টি, নন-এসি কোচ ৩৮২টিসহ মোট ৪৬৮টি এবং সর্বমোট কোচের সংখ্যা ১৬৭১টি। আন্তর্দেশীয় ট্রেন (মৈত্রী, বন্ধন ও মিতালী এক্সপ্রেস, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলাচলকারী) ৪টি এবং সর্বমোট স্টেশন ৪৮৩টি। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ-জয়দেবপুর, আখাউড়া-কুমিল্লা, লাকসাম-কুমিল্লা-চাঁদপুর, লাকসাম-কুমিল্লা-নোয়াখালী, সিলেট-আখাউড়া, পার্বতীপুর-ঠাকুরগাঁও, পার্বতীপুর-লালমনিরহাট এবং চট্টগ্রাম-কুমিল্লা কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এতে রাজধানীসহ দেশের অন্য জনবহুল শহরগুলোতে যানজট অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। এ ছাড়া 'ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম' প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। বিনিয়োগপ্রাপ্তি সাপেক্ষে ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণ করা হলে যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে রেল যোগাযোগ দ্রুত ও সহজীকরণ ও উক্ত অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে চায়নার অর্থায়নে পদ্মা রেলসংযোগ প্রকল্পের কাজ এবং জাইকার অর্থায়নে দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তিনটি নতুন জেলা যথা–মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও নড়াইল জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত হবে এবং এ অঞ্চলের জেলাগুলোর সাথে রাজধানী ঢাকার যাতায়াতের সময় ২-৪ ঘণ্টা পর্যন্ত কমে আসবে। এ ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং জিডিপি প্রায় ১ শতাংশ বাড়বে বলে এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আরো অধিকসংখ্যক যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেন অধিক গতিতে চালানো সম্ভব হবে। এতে দেশের উওরাঞ্চলের রেল যোগাযোগব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হবে। পর্যটন নগরী কক্সবাজারের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মিয়ানমারের নিকট ঘুনধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণের কাজ চলমান আছে এবং এ প্রকল্প সমাপ্ত হলে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন আকর্ষণ কক্সবাজার জেলার সাথে ঢাকা হতে সরাসরি রেলসংযোগ স্থাপিত হবে এবং কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ছাড়া খুলনা-মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ, আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ নির্মাণ, ঢাকা-টঙ্গী তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ

এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ চলমান আছে। খুলনা হতে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৬৪.৭৫ কি.মি. ব্রডগেজ সিঙ্গেল রেললাইন নতুন নির্মিত হবে। এতে দেশের অন্যতম প্রধান সমুদ্রবন্দর মোংলার সাথে সরাসরি রেলসংযোগ স্থাপিত হবে এবং বাগেরহাট জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত হবে। এ ছাড়া বগুড়া থেকে শহিদ এম মনসুর আলী স্টেশন ভায়া সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ, খুলনা-দর্শনা সেকশন ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্প এবং পার্বতীপুর-কাউনিয়া সেকশনে মিটারগেজ লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান আছে। ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে করিডরকে ডাবল লাইনে উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডরে লাকসাম-আখাউড়া ব্যতীত সমগ্র সেকশনে মিটারগেজ ডাবল লাইনে ট্রেন চলাচল করছে। অবশিষ্ট আখাউড়া-লাকসাম অংশকে ডাবল লাইনে পরিণত করার লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং ইউরোপীয় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের অর্থায়নে 'আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর' শীর্ষক প্রকল্পে ট্র্যাক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। তা ছাড়া ভারতীয় অনুদানে আখাউড়া-আগরতলা এবং এলওসি অর্থায়নে কুলাউড়া-শাহবাজপুর প্রকল্পের কাজও চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়েকে আধুনিক, যুগোপযোগী জনপরিবহন মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রেলওয়ের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আধুনিকীকরণের প্রোগ্রাম রেলওয়ের উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। ৩০ বছর মেয়াদি (২০১৬-২০৪৫) রেলওয়ে মাস্টারপ্ল্যান ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫ লাখ ৫৩ হাজার ৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এডিবির অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান মাস্টারপ্ল্যানটি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যাত্রীসাধারণের সুবিধার্থে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে Rail Sheba অ্যাপসের মাধ্যমে ট্রেনের টিকিট ক্রয়ের জন্য টিকেটিং সুবিধা চালু করা হয়েছে। অনলাইনে টিকিটের কোটা বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশ হতে ৫০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। এ ছাড়া নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের জন্য Water Aid, Bangladesh-এর সহযোগিতায় বিভিন্ন স্টেশনে পানি শোধনাগার স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে ট্রেনের মাধ্যমে কনটেইনার পরিবহন করে। বাংলাদেশ রেলওয়ের কনটেইনার পরিবহন বৃদ্ধি করার জন্য ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডর ডাবল লাইনে রূপান্তর এবং ধীরাশ্রমে একটি আইসিডি নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে কনটেইনার পরিবহনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির জন্য একটি পৃথক কনটেইনার কোম্পানি গঠন করেছে। ভারতীয় রেলওয়ের সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের সংযোগের জন্য ৮টি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট রয়েছে। এই ৮টি

ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টের মধ্যে ৫টি (দর্শনা-গেদে, বেনাপোল-পেট্রাপোল, রোহনপুর-সিঙ্গাবাদ, বিরল-রাধিকাপুর, চিলাহাটি-হলদিবাড়ী) বর্তমানে চালু রয়েছে। বন্ধ ৩টি ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্টের মধ্যে ১টি চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে আরো দুটি নতুন ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ রেলওয়ের ১২৩টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্য, সবজি ও অন্যান্য জরুরি পার্সেল মালামাল পরিবহনের জন্য বিভিন্ন রুটে বিশেষ পার্সেল ট্রেন পরিচালনা করা হয়। রাজশাহী বিভাগের আম চাষিদের কথা বিবেচনা করে ২০২০ সাল হতে 'ম্যাংগো স্পেশাল' ট্রেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ-ঢাকা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ রুটে চলাচল করছে। পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে গবাদি পশু পরিবহনের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্যাটেল স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করে থাকে। এভাবেই রেলওয়ে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে যাত্রীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক ম্যানেজমেন্ট ও অপারেশনাল পদ্ধতিসহ চলমান এবং ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন পরিবহন খাতে রেলওয়ের বিকাশেই শুধু সহায়তা করবে না, বরং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নেও ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। রেলওয়ে তার নিজের বাজার শেয়ার পুনরুদ্ধার করে বাণিজ্য সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচন করবে, যা রেলওয়েকে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করবে। সরকার রেলওয়ে মাস্টারপ্ল্যান, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প-৪১-এর আওতাধীন পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং কৌশলগত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে গণপরিবহন হিসেবে রেলওয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ দীর্ঘদিন ধরে রেলওয়ে সেক্টর অবহেলিত ছিল। নিরাপদ, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব হওয়ায় রেলওয়ের জনপ্রিয়তা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি জনগণের মাঝে রেলভ্রমণের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি আরামদায়ক, সাশ্রয়ী ও নিরাপদ পরিবহন নেটওয়ার্ক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর এবং এ লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত চলমান উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ রেলওয়ে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

লেখক : উপপ্রধান তথ্য অফিসার ও সাবেক গণসংযোগ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়

সবার মানবাধিকার রক্ষা করতে হবে

ফারহানা সাত্তার

'নিজেকে জীবিত প্রমাণ করতে ব্যর্থ প্রতিবন্ধী বিপ্লব'—এই শিরোনামে গত ২০ আগস্ট ২০২১ তারিখে দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদে উল্লেখ করা হয়, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার থানা বাজার এলাকার পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রতিবন্ধী বিপ্লব আজাদকে ২০১৮ সালে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার সময় মৃত হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ফলে তিনি প্রতিবন্ধী ভাতাসহ সরকারি সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। তিনি নিজ বাড়ির মিউটেশন, ভোটাধিকার প্রয়োগ, এমনকি করোনার টিকাও নিতে পারছেন না। বিষয়টি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নজরে আসে। মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে চারটি পর্যবেক্ষণের আলোকে সরেজমিনে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বিষয়টি কমিশনকে জানানোর জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দৌলতপুর, কুষ্টিয়াকে অনুরোধ করা হয়। মানবাধিকার কমিশনের পর্যবেক্ষণগুলো হলো প্রতিবন্ধী বিপ্লব আজাদ নিজেকে জীবিত প্রমাণ করার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কেন প্রমাণ করতে পারছেন না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সশরীরে প্রতিবন্ধী বিপ্লবকে দেখেছেন কি না? তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্র এবং প্রতিবন্ধী সনদের ছবির সাথে মিল আছে কি না? অথবা প্রতিবন্ধিতার ধরনের সাথে মিলিয়ে দেখেছেন কি না? ইউনিয়ন পরিষদের জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন রেজিস্টারে অভিযোগকারী বিপ্লবকে মৃত্যু দেখানো হয়েছে কি না? মৃত্যু দেখানো হয়ে থাকলে কীসের ভিত্তিতে মৃত্যু দেখানো হয়েছে? ভোটার তালিকা হালনাগাদকালে প্রতিবন্ধী বিপ্লবকে মৃত্যু হিসেবে দেখানোর ভিত্তি কী? এই পর্যবেক্ষণের আলোকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সরেজমিনে বিষয়টি তদন্ত করে মানবাধিকার কমিশনের নিকট প্রতিবেদন জমা দেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, প্রতিবন্ধী বিপ্লব আজাদকে ভোটার তালিকা হালনাগাদের সময় ভুলক্রমে মৃত্যু দেখানো হয়েছিল, যা পরবর্তীতে সংশোধন করা হয়েছে। ভোটার তালিকা হালনাগাদের সময় তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার মৃত খাদেমুল ইসলামের কর্তন ফরম পূরণ করেন। কর্তন ফরমে খাদেমুল ইসলামের নাম থাকলেও এনআইডি নম্বরের স্থলে ভুলক্রমে তাঁর ছেলে বিপ্লব আজাদের এনআইডি নম্বর লেখা হয়। সে জন্য মৃত্যু খাদেমুল ইসলামের পরিবর্তে তাঁর ছেলে বিপ্লব আজাদ মৃত্যু হিসেবে কর্তন হয়। ভুক্তভোগী বিপ্লব আজাদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও প্রতিবন্ধী সনদের ছবির মিল রয়েছে এবং প্রতিবন্ধিতার ধরন সঠিক আছে। এ ছাড়া ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পরিশোধ বইয়ের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে বিপ্লব আজাদ প্রতিবন্ধী ভাতা গ্রহণ করেছেন। অক্টোবর, ২০২০ থেকে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভাতা প্রদান কার্যক্রম শুরু হলে এমআইএস সফটওয়্যারে ভুক্তভোগীর তথ্য এন্ট্রি দেওয়ার সময় নির্বাচন কমিশনের এনআইডি

সার্ভার থেকে স্বয়ক্রিয়ভাবে তাঁকে মৃত দেখানো হওয়ায় ভাতা প্রদান সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বিপ্লব আজাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কর্মকর্তা এনআইডি সংশোধন করে দেন এবং সমাজসেবা অফিসার এমআইএসের সফটওয়্যারে তথ্য এন্ট্রি দিয়ে নিয়মিত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

ভিকটিম বিপ্লব আজাদ মানবাধিকার কমিশনের হস্তক্ষেপে ভাতার কার্ডটি এবং ভাতা পেয়ে খুশি হয়েছেন। এ রকম অসংখ্য ঘটনায় মানবাধিকার কমিশন অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ নাগরিকদের পাশে এসে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রকে বাধ্য করেছে। রাষ্ট্র সব সময় মানবিক হবে, এটা আমাদের সংবিধানের মূলসুর। বর্তমান সরকারও সর্বক্ষেত্রে নাগরিকদের সাথে মানবিক আচরণের মাধ্যমে কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে এটাও ঠিক কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তির বিচ্যুতির কারণে অনেক সময় নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনা ঘটছে। দেশের মানবাধিকার কমিশন এ ব্যাপারে সজাগ। যখনই কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তাদের নজরে আসে সঙ্গে সঙ্গে কমিশন স্ব-উদ্যোগে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। আমাদের মানবাধিকার কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের মূলসুর হলো, প্রত্যেকটি মানুষের সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকা তার জন্মগত অধিকার। মানুষ হিসেবে এ অধিকার প্রত্যেকটি মানুষের প্রাপ্য, যা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এ অধিকার শাশ্বত যা কোনো দেশের সীমারেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ৩০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, শিশু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী যা-ই হোক না কেন, তিনি গ্রামে বা শহরে বা বিশ্বের যে প্রান্তেই বসবাস করেন না কেন, সকলের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা রয়েছে। আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এখানে বহু ধর্মের, বহু ভাষা, সংস্কৃতি এবং নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা সহাবস্থানে রয়েছে। এখানে মানুষের জীবনমান এখনো কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নয়ন করা সম্ভব হয়নি। উন্নত দেশের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা আমাদের দেশের নাগরিকদের কাছে মাত্রই পৌঁছানো শুরু হয়েছে। এসব সুবিধা সকল নাগরিকের কাছে পৌঁছাতে সময় লাগবে। এমন একটি অবস্থায় দেশের সম্মানিত নাগরিকদের মানবাধিকার সুরক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তদুপরি মানবাধিকার কমিশনের সীমিত জনবল, আইনি সীমাবদ্ধতাসহ নানা রকম সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানবাধিকার কমিশন দেশের যুবসমাজকে মানবাধিকারকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। ইতিমধ্যে বিপুলসংখ্যক মানবাধিকারকর্মী তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। এটি একটি চলমান

কার্যক্রম। আর এর মাধ্যমেই ভবিষ্যতে মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং লঙ্ঘন প্রতিরোধে জোরদার ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। মানবাধিকার কমিশন দেশের জনসাধারণকে সচেতন করতে নানা রকম প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মানবাধিকার কমিশন ২০২১ সাল পর্যন্ত পূর্ববর্তী সময়ের অভিযোগসহ মোট ১ হাজার ২৭১টি অভিযোগের মধ্যে ৯৭২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করছে।

মানবাধিকার কমিশন দরিদ্র, দুর্বল, প্রান্তিক, নারী ও শিশু, প্রতিবন্ধী, ঝুঁকিগ্রস্ত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সব সময়ই সচেষ্ট। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করা বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করে যাচ্ছে। মোটকথা, দেশের কোনো মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো ঘটনা ঘটলে তা মানবাধিকার কমিশনের নজরে আনতে হবে। এটা সচেতন নাগরিক হিসেবে সকলেরই দায়িত্ব। এসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ পেলে কমিশন দ্রুতই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ভিকটিম প্রতিকার পেয়ে থাকে। মানবাধিকার কমিশন তাদের নিজস্ব কর্মীদের মাধ্যমেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো নিয়মিত মনিটর করে থাকে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও কমিশন আমলে নিয়ে থাকে। দেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো ওই সব এলাকার সচেতন নাগরিকরা মানবাধিকার কমিশনের নজরে আনতে পারেন। এতে অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করা সম্ভব হবে এবং ভিকটিমকে আইনি সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে অপরাধ কমানো সম্ভব হবে।

আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা জীবন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত ছিলেন। তাঁর নেতৃত্ব 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবাধিকার সংগ্রামের ফসল হিসেবে। ভিশন-২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশের মানবাধিকার সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়ন এবং মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আইনের শাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

লেখক : গবেষক ও মানবাধিকার কর্মী

সুপার ফুড

নাফিসা শারমিন

মাছে-ভাতে বাঙালি এ ভূখণ্ডের একটি জনপ্রিয় প্রচলিত প্রবাদ। একসময় এ অঞ্চলের মানুষের গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ আর ক্ষেতে থাকত সোনালি ফসল। কালের বিবর্তনে গ্রামে আর পুকুর দেখা যায় না। মিঠাপানির সেই সুস্বাদু মাছের স্থান দখল করে নিয়েছে চাষের হাইব্রিড মাছ। গোয়াল ভরা গরু আজ আর গ্রামের গৃহস্থ বাড়িতে দেখা যায় না। প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে আমাদের জীবন অনেক বদলে গেছে। গ্রামে গ্রামে এখন আর নবান্নের উৎসব হয় না। শহুরে মানুষরা নিজেদের ঐতিহ্যকে জানান দিতে নবান্নের উৎসব করে। পিঠাপুলির আয়োজন করে কিছু আলোচনা হয়। এর মাধ্যমে আমরা বাঙালি, এটা জানান দেয়।

কবি বিভূতি দাস তাঁর 'মাছে ভাতে বাঙালি' কবিতায় লিখেছেন, 'মাছে ভাতে বাঙালি, নিরামিষে মন উঠছে না এটা সেটায় ভরছে পেট, রসনা কিন্তু মানছে না। গ্রামের মানুষেরা বাজারে আড্ডায় শিঙ্গাড়া, পেঁয়াজু, সমুচা খায় আর শহরের মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তরা পিৎজা, বার্গার, তন্দুরি, চিকেন ফ্রাই, ফ্রেন্স ফ্রাইসহ আরো নানা রকম ফাস্ট ফুড না হলে তাদের চলে না। আর এসব খাবার গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আমাদের অজান্তেই শরীরের অনেক বড় ক্ষতি করে ফেলছি। বাঙালি চিরকালই ভোজনরসিক। তা সেকালই হোক কিংবা একালই হোক। সব যুগেই বাঙালির খাবারের সুনাম রয়েছে। আমরা যতটা না আদর্শ খাদ্য গ্রহণে সচেতন আর চেয়ে অনেক বেশি মুখরোচক খাদ্যের প্রতি বেশি দুর্বল। আমরা একবার ভেবেও দেখি না কী খাচ্ছি, এতে আমাদের শরীরের ওপর কী প্রভাব ফেলছে?

বিশ্বজুড়ে এখন পুষ্টিবিদরা খাবার গ্রহণের জন্য সুপার ফুডের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাহলে আমাদের জানতে হবে সুপার ফুড কী? বিজ্ঞানীদের মতে, সুপার ফুড হলো এমন এক ধরনের খাদ্য, যাতে উদ্ভিদজাত পুষ্টি উপাদান বেশি পরিমাণে থাকে, যা আমাদের দেহের জন্য খুব উপকারী। এতে অ্যান্টি-অক্সিজেন, অ্যাঁসায়ানিন, ভিটামিন সি, বিভিন্ন মিনারেল, ডায়োটারি ফাইবার থাকে বলে দেহের ক্ষয়পূরণ, পুষ্টিসাধন, রোগ প্রতিরোধসহ নানা উপকার করে। সুপার ফুড আমাদের ইমিউন ফাংশন বৃদ্ধি করে এবং রোগ প্রতিরোধে বা অগ্রগতির সম্ভাবনা হ্রাস করে স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে সহায়তা করে। সুপার ফুড সম্পর্কে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, 'সুপার ফুড খাবারের এক একটি বিভাগ, যা সুপার স্বাস্থ্যকর। তবে প্রতিটি স্বাস্থ্যকর খাবার সুপার ফুড নয়।' প্রতিটি সুপার ফুডের বিশেষ পুষ্টিগুণ রয়েছে। এসব বিশেষ পুষ্টিগুণের কারণে মানব শরীরের হার্টের সমস্যা, ক্যান্সার প্রতিরোধ, প্রদাহ হ্রাস, কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে রাখাসহ একটি শক্তিশালী ইমিউন সিস্টেম তৈরি করে।

সুপার ফুডে বিশেষ যেসব পুষ্টিগুণ থাকে তার মধ্যে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস অন্যতম। অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসের প্রাকৃতিক যৌগগুলো মানব শরীরের কোষকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। ফলে হৃদরোগ, ক্যান্সারের মতো জীবনহরণকারীসহ অন্যান্য রোগের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। সুপার ফুডে প্রচুর খনিজ পদার্থ থাকে। আমাদের শরীরের খনিজ পদার্থ মূলত অজৈব পদার্থ, এগুলো ছাড়া শরীরের পক্ষে কর্মচঞ্চল রাখা একেবারেই অসম্ভব। খনিজ লবণ দেহের অস্থি, দাঁত এনজাইম ও হরমোন গঠনে সাহায্য করে। ক্যালসিয়াম দাঁত ও হাড় গঠনে, রক্ত জমাট বাঁধতে,ায়ু ব্যবস্থায় সুষ্ঠু কাজ করতে সহায়তা করে। আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ ও বিপাকের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তা করে। ভিটামিন হচ্ছে এক ধরনের জৈবিক উপাদান, যা আমাদের শরীরে একেবারে তৈরি হয় না বা দরকারের চেয়ে কম তৈরি হয়। আমাদের দেশের মানুষ খাবারের ভিটামিন নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত থাকে। অথচ এই উপাদানটি আমাদের শরীরে খুব অল্প পরিমাণ লাগে। তবে এটা ধারাবাহিকভাবে শরীরে জোগান দিতে হয়। এই ভিটামিনের ঘাটতি হলে শরীরে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। বিজ্ঞানীরা ১৩ প্রকার ভিটামিনের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। ভিটামিন শরীরে বিভিন্ন কোষের স্বাভাবিকতা রক্ষার কাজে সহায়তা করে। রক্তের কাজ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভিটামিনের অভাবে রাতকানা, রক্তস্বল্পতা, চর্মরোগ, রিকেট ও অস্টিওম্যালিসিয়া (হাড়ের রোগ) ও,ায়ুরোগ দেখা যায়। আবার অধিক ভিটামিনের প্রভাবে শরীরে যেসব সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হলো– ভিটামিন 'এ'। এর আধিক্যের কারণে হাইপার ভিটামিন সি, ভিটামিন-বি১-এর কারণে তন্দ্রাভাব, ভিটামিন-বি৩-এর কারণে লিভারে বিরূপ প্রভাব, ভিটামিন-বি৫-এর কারণে বমি বমি ভাব ও ডায়রিয়া এবং ভিটামিন-ই-এর কারণে হার্ট ফেইলিউর হয়ে থাকে। এ ছাড়া সুপার ফুডে থাকে ফাইবার, ফ্ল্যাভোনয়েডস এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি। ফাইবার শরীরের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, হৃদরোগ প্রতিরোধ করে এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিসে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করে। ফ্ল্যাভোনয়েডসে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টি-কার্সিনোজেনিক বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলো উদ্ভিদে পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যকর চর্বি হলো মনোস্যাচুরেটেড ও পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট। একে ভালো চর্বি বলা হয়। এটি আমাদের শরীরে কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে এবং হৃদরোগ এবং স্ট্রোক প্রতিরোধ করে।

আমাদের আশপাশে সস্তায় যেসব সুপার ফুড পাওয়া যায় সেগুলো খুব সহজেই আমরা, আমাদের খাদ্য তালিকায় রাখতে পারি। আপেল, কমলা, ড্রাগন ফল এগুলো সুপার ফুড কিন্তু দাম বেশি হওয়ায় সাধারণ মানুষ সব সময় এগুলো কিনতে পারে না। তবে এর বিকল্প হিসেবে কলা, পেয়ারা, পেঁপে, জাম, আনারস, গাজর খুব সহজেই কম মূল্যে এগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব। বাদাম, টকদই, কম চর্বিযুক্ত দুধ, ডিম, কুমড়া, হলুদ সবজি-ফল সুপার ফুড হিসেবে স্বীকৃত। পাতাযুক্ত সবুজ শাকসবজিতে ভিটামিন এ, সি এবং ই প্রচুর পরিমাণে থাকে। এসব শাকসবজি

ক্যান্সার প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এ ছাড়া এসব শাকসবজিতে ভিটামিন-কে এবং ফোলেট থাকার কারণে হাড় ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। দারুচিনি আমাদের দেশের সকল মানুষের কাছে একটি পরিচিত মসলা। এটি মানবদেহের প্রদাহ, রক্তের শর্করার পরিমাণ এবং কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। চিয়া বীজ মেক্সিকো এবং গুয়েতেমালার একটি ফুলের বীজ। এই বীজে ফাইবার, প্রোটিন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের পাশাপাশি ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন ও জিংক পাওয়া যায়। এগুলো কম ক্যালরিযুক্ত খাবার, যা মানুষের জন্য খুবই সহায়ক। আদা, রসুন, হলুদ, কুমড়া, মসুরের ডাল, পালং শাক, মুলা শাক, শালগম, বাঁধাকপি, মটরশুঁটি এ সবই সুপার ফুড। মানব শরীরের জন্য উপকারী। আমলকী, আখরোট অ্যাভোকাডা, ব্লুবেরি, এক্সট্রা ভার্জিন অয়েলের উপকারিতা সম্পর্কে আমরা কমবেশি জানি।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিবছর শুধু খাবারের কারণেই এক কোটিরও বেশি মানুষ মারা যায়। আমাদের দেশে এমনিতেই পুষ্টি বৈষম্য রয়েছে, যা নিরসনে কাজ করছে সরকার। সুপার ফুড একই সাথে স্বাস্থ্যকর এবং রোগবালাই প্রতিরোধকারী। তাই সুস্থ থাকার জন্য শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় উপদান সুপার ফুড। সুস্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর দীর্ঘ জীবন পেতে হলে ফাস্ট ফুড নয়, সুপার ফুডকে বেছে নিতে হবে।

লেখক : পুষ্টিবিদ

Water Management in Delta Planning

Dr. Monirul Alam

Bangladesh has prepared a 100-year Delta Plan-2100. There are 9 reservoirs in this plan. 25 Biodiversity Conservation Areas have been declared in the OTIG that divides Bangladesh geographically. If we want to take Bangladesh to the ranks of developed countries, we need to protect rivers and wetlands by prioritizing delta planning. Advanced technology should be used to protect rivers. In cases where rivers and water bodies are being filled and cannot be freed from encroachment, all levels must come together and the government must take swift action. Technology-based river information systems are not developed in Bangladesh, such as how many rivers there are in the border, past and present status of the rivers. If it is possible to improve the information system of the river, it is possible to bring people, water body and nature together. Every six months or a year, an app or a database containing the information of the river should be created through satellite images, from which the past and present condition of the river can be known and the general public can participate. Can and easily identify problems. Then the government can easily take steps to protect rivers and aquifers and the delta plan can be successfully implemented and economic development will be possible. Waterlands and rivers are a major source of fresh water. Water for daily use of the city, water for agriculture and industrial production is taken from aquifers and rivers. Water bodies and rivers are being polluted through various human activities. Water security and sustainable development goals are threatened by water pollution. Various water borne diseases spread through water pollution. Contaminated water contains various harmful substances, chemicals, heavy metals (arsenic, lead, mercury, etc.). Because of this, using contaminated water can cause serious diseases including cancer. Vulnerable groups, especially pregnant mothers, newborns, children under five years are at higher risk. This increases healthcare costs for the poor and marginalized, reduces their working hours, and increases poverty. Excessive uses of pesticides during cultivation, industrial effluents are constantly mixing with water and polluting the soil and water. It reduces soil fertility, disrupts crop production and industrial production due to use of polluted water, which affects economic development. Polluted water infested with pesticides damages women's physical characteristics and hormone-sensitive tissues. It also increases the risk of breast cancer. People working in factories and people living in or around industrial areas are at high

risk due to excess carbon emissions in industrial areas. Due to excess carbon emissions, the temperature of the environment is increasing. Because of this, if the sea level rises, coastal marginal communities, sailors, fishermen, farmers are affected. Pesticides are spread with rain, increasing water pollution by spreading pollutants through excess storms and rain. Water pollution threatens the life of aquatic species. Pollution is spreading from reservoirs to canals, rivers, and seas through flow. It is becoming impossible for the animals there to survive. If water pollution is not prevented, aquatic species will disappear. Water pollution of wetlands and rivers is a challenge today. Water pollution is not only a threat to human health and the environment, but also to economic prosperity and social progress. Sustainable development goals cannot be achieved unless water pollution is prevented. To prevent water pollution, the source and cause of pollution must be identified first. Excessive use of pesticides on land should be prevented, toxic and harmful chemicals should be disposed of in specific places and proper measures should be taken for industrial waste. Water pollution can be prevented by setting up treatment plants in every factory, providing safe sanitation, systematic urban planning, above all by taking appropriate measures. People's active participation should be ensured in combating water pollution, all public and private institutions should work together. Only then will it be possible to realize the Sustainable Development Goals. Three-quarters of the world's drinking water is in poor condition due to increasing levels of water pollution. The way water is being polluted due to various reasons, even if it is possible to turn water from polluted state to pure state, many considerations and questions remain. The amount of water we are polluting, can we purify that amount of water? Even if the water can be purified, the cost of doing so, can everyone afford it? How much will we buy water in the future? From the point of responsibility and reality of water pollution, various steps have been taken to depollute the water, but some errors still remain. One of the shortcomings is non-treatment of industrial effluents and water, inefficiency of a large part of those involved in the treatment work and lack of knowledge about the proper quality of water ingredients and components. Human household waste, industrial waste, various chemicals, solid materials, pesticides, fertilizers are polluting the water of reservoirs, rivers, canals, rivers. Again, people are using the reservoir and river water in different ways. Reservoir and river water is purified and made suitable for use at various stages. Chlorine, a disinfectant chemical, is added to water to preserve water for consumption by removing potential pathogens or microorganisms such as viruses, bacteria including Escherichia coli, Campylobacter, Shigella etc. Water is made suitable for consumption by purification, maintaining

a standard standard of water constituents in the world and in Bangladesh. In the case of waste water, the World Health Organization has specified the standards for water parameters, the Department of Environment, Government of Bangladesh has set standard standards for some water components in many cases. Bangladesh is not able to progress in the way that global environment is being given importance. Still many parameters levels are not compatible with international standards. For example, the level of nitrogen after wastewater treatment is set at 30 ppm internationally, while the standard level in Bangladesh is 150 ppm. Treatment plant should be made mandatory in every industrial plant. Before releasing the waste water into the wetlands, the parameters should be checked and treated properly. The authorities have to ensure on-site supervision from time to time. If water pollution can be prevented, it will be possible to protect rivers, wetlands and biodiversity. # PID Feature

Writer: Teacher and Researcher

Fuelling Innovation: The Rise of ICT Entrepreneurship in Bangladesh

A H M Masum Billah

ICT entrepreneurship in Bangladesh has experienced significant growth in recent years, playing a crucial role in the country's economic development and technological advancement. The government of Bangladesh has been instrumental in creating an enabling environment for ICT startups and entrepreneurs, recognizing the immense potential of this sector. Through a range of initiatives and programs, the government has provided support, resources, and incentives to foster innovation, attract investments, and drive the growth of ICT entrepreneurship.

One such initiative is the Startup Bangladesh program, launched in 2020, which aims to promote entrepreneurship and innovation across various sectors, including ICT. The program starting with an allocated capital of Tk 500 crore, offers support services such as seed funding, mentorship programs, and networking opportunities to startups. It has successfully created a vibrant ecosystem that nurtures ICT startups and helps them thrive and scale their businesses.

The Innovation Design and Entrepreneurship Academy (iDEA), an initiative under the Ministry of Posts, Telecommunications, and Information Technology, focuses on building a skilled workforce, promoting digital entrepreneurship, and supporting startups in their early stages. iDEA provides aspiring entrepreneurs with training, mentorship, and funding opportunities to transform their innovative ideas into successful ventures. In a recent collaboration, iDEA and Microsoft have joined hands to enhance the startup ecosystem in Bangladesh.

In addition to these initiatives, the Bangladesh Hi-Tech Park Authority (BHTPA) plays a crucial role in nurturing technology-driven companies, including ICT startups, by establishing a favorable ecosystem. BHTPA offers state-of-the-art infrastructure, attractive tax incentives, and a supportive regulatory framework to attract both local and foreign investments into the flourishing ICT sector. Notably, hi-tech parks like the Bangabandhu Sheikh Mujib Hi-Tech Park in Gazipur have already been established, providing an optimal environment for startups to collaborate, innovate, and thrive. Currently, operations are underway in ten parks, and plans are underway to develop the Sheikh Russell IT Park and Incubation Center, as well as a High-Tech Park in Bogra, in line with this trajectory of progress.

This remarkable growth in the ICT entrepreneurship sector is reflected in the data provided by the Export Promotion Bureau for the fiscal year 2021-22. It reveals that Bangladesh achieved a significant milestone by generating $592 million in revenue through the export of IT and Information Technology Enabled Service (ITES). Furthermore, the ICT sector has made a substantial contribution of 1.28% to the nation's GDP while creating over 300,000 employment opportunities.

The success stories of startups like Sheba.xyz and Chaldal demonstrate the significant contributions made by ICT entrepreneurship across diverse industries. Sheba.xyz has revolutionized service provision by establishing a convenient online marketplace for a wide range of services, creating job opportunities and improving operational efficiency. Similarly, Chaldal has transformed the grocery industry by providing customers with a seamless online shopping experience and doorstep delivery. These examples demonstrate the transformative impact of ICT entrepreneurship in meeting evolving consumer demands and reshaping traditional industries.

Bangladesh has witnessed significant growth in mobile phone penetration and internet connectivity, creating a conducive environment for ICT startups. According to the data of Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) as of April 2023, the number of mobile phone users in the country is 183.8 million and the number of internet users is 126.45 million. Among the internet users, 114.40 million are using mobile internet and 12.05 million are using ISP and PSTN. The adoption of digital financial services has also seen a remarkable surge in Bangladesh. As of December 2022, the number of registered Mobile Financial Service (MFS) users in Bangladesh has reached an impressive 181.1 million, with 13 MFS providers facilitating these services. Notably, rural areas account for a surprising 100.7 million users, surpassing the 80.4 million users in urban centers. Furthermore, the volume of transactions carried out by account holders has been consistently increasing each year, demonstrating a significant upward trend.

The government's vision of Digital Bangladesh has been a driving force in promoting ICT entrepreneurship. This vision includes expanding internet connectivity, digitizing government services, promoting e-governance, and fostering digital literacy. By creating a digitally inclusive environment, the government has generated demand for innovative digital solutions, opening up opportunities for ICT startups to thrive.

The impact of government initiatives is evident in the growth of the startup ecosystem. Access to support services, mentorship programs, and

finance has encouraged aspiring entrepreneurs to pursue their ventures. The increased number of ICT startups in Bangladesh has fueled innovation and competitiveness in the sector.

Moreover, the initiatives have fostered a culture of entrepreneurship, instilling an entrepreneurial mindset among the youth. Awareness campaigns, training programs, and startup events have played a crucial role in encouraging young individuals to pursue their innovative ideas and become job creators.

These government initiatives have also attracted both local and foreign investments in the ICT sector. Tax incentives, access to high-tech parks, and a skilled workforce have made Bangladesh an attractive destination for investors. This influx of investments has not only fueled startup growth but has also contributed to job creation, technology transfer, and overall economic growth.

The government of Bangladesh has recognized the potential of ICT entrepreneurship in driving economic growth, innovation, and job creation. Through various initiatives, programs, and support services, the government has fostered an enabling environment for startups to thrive. The impact of these initiatives is evident in the growing number of successful ICT startups, increased investments, and the overall digital transformation of the country. With continued government support and a vibrant startup ecosystem, ICT entrepreneurship in Bangladesh is poised to further accelerate the country's journey towards a digital and knowledge-based economy.

Writer: Deputy Principal Information Officer, PID

তরুণদের হাত ধরেই স্মার্ট বাংলাদেশ

ইমদাদ ইসলাম

দেশে বেকার, বিদেশে যেতে চান? কীভাবে শুরু করবেন, কার কাছে যাবেন, বুঝতে পারছেন না? কোনো সমস্যা নেই। আপনার এ সমস্যাগুলোর ধারাবাহিকভাবে সমাধান দেওয়ার জন্য সরকারের ডিজিটাল পরিষেবা 'আমি প্রবাসী' অ্যাপ এখন আপনার হাতের মুঠোয়। মোবাইলের প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে শুরু করুন নিবন্ধন। তারপর ধাপে ধাপে আপনার কাজগুলো আপনি নিজেই সমাধান করতে পারবেন। ইতোমধ্যে এই অ্যাপের মাধ্যমে কমবেশি ২০ লাখ মানুষ নিবন্ধন করেছে। বিদেশগামী কর্মীদের দীর্ঘদিনের নানামুখী সমস্যার সমাধান করে কোনো প্রকার বিদেশি সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশি প্রকৌশলী এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে তৈরি এমন অ্যাপ বিশ্বে এটাই প্রথম। সম্পূর্ণ ডিজিটাল প্রক্রিয়াটি প্রস্তুত করেছে বিএমইটির ডিজিটাল সার্ভিস প্রোভাইডার আমি প্রবাসী লিমিটেড। ক্লিয়ারেন্স স্মার্ট কার্ড এখন সত্যিকার অর্থেই স্মার্ট। QR code দিয়ে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে যে কেউ এর তথ্য সহজেই যাচাই করতে পারবে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিআইডিএ) ২০১৯ সালে ওএসএস পোর্টালের মাধ্যমে মাত্র দুটি ডিজিটাল সেবা দেওয়ার মাধ্যমে তাদের ডিজিটাল যাত্রা শুরু করেছিল। ২০২২ সালে শেষ প্রান্তিকে এসে বিআইডিএ এখন ১৮টি সংস্থার ৫৬টি ডিজিটাল সেবা অংশীজনদের জন্য উন্মুক্ত করেছে। প্রতিদিন গড়ে ওএসএসের মাধ্যমে ১০০-এর বেশি বিনিয়োগকারী বিডা থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকে। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বাংলাদেশের সেবা খাতসহ অন্য সকল সেক্টরে ডিজিটাইজেশন হচ্ছে। মানুষ এর সুবিধা পাচ্ছে।

বাংলাদেশ ইন্টারনেটের যুগে প্রবেশ করেছে ১৯৯৬ সালে। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশকে বিনামূল্যে সাবমেরিন ক্যাবল দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। আমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে সে সুযোগ নিতে পারিনি। ২০০৬ সালে এসে মূল্য দিয়ে সেই সাবমেরিন ক্যাবল নিতে হলো। ১৯৯৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কম্পিউটারের ওপর থেকে ভ্যাট-ট্যাক্স প্রত্যাহার করে নিলেন। ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলের জন্যই কম্পিউটার ব্যবহার সহজলভ্য হলো। একাধিক মোবাইল কোম্পানিকে মোবাইল সেবা দেওয়ার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হলো। লাখ টাকার মোবাইল চলে এলো হাজার টাকায়। যে মোবাইল ছিল এক সময় শুধু উচ্চবিত্তের ব্যবহারের জন্য, তা মুহূর্তে হয়ে গেল সর্বসাধারণের। মোবাইল ইন্টারনেটের যুগে বাংলাদেশ প্রবেশ করে ২০১৩ সালে। ২০১৮ সালে দেশে ফোরজি চালু হলে ভয়েস কল ও ডেটা ট্রান্সফার অনেক সহজ হয়ে যায়। মানুষের চাহিদা বাড়তে থাকে।

২০০৮ সালে বাংলাদেশে মোট ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার হতো সাড়ে সাত জিবিপিএস। আর এখন দেশে মোট ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার হয় প্রায় তিন হাজার ৫০০ জিবিপিএস। এখন দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৩ কোটিরও বেশি। মাত্র ১৩ বছরের ব্যবধানে এই পরিবর্তন, যা পৃথিবীতে কোনো দেশেই হয়নি।

মজার বিষয় হলো, ২০০৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা দেন। তখন দেশের মানুষ এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব চিন্তা করতে পারেনি। তবে এটা ঠিক তরুণ প্রজন্ম এটাকে লুফে নিয়েছিল। আমাদের পরে ২০০৯ সালে ব্রিটেনে ডিজিটাল ব্রিটেন, ২০১৪ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ডিজিটাল ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান ২০১৯ সালের ৫ ডিসেম্বর ডিজিটাল পাকিস্তান ঘোষণা করে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে। সর্বক্ষেত্রেই তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। তবে এটা সত্য তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে ডিজিটাল বৈষম্য রয়েছে। করোনাকালে সারা দেশে যখন আইসিটির ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয় তখনই ডিজিটাল বৈষম্য আমাদের কাছে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কালবিলম্ব না করে এই বৈষম্য নিরসনের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা দ্রুত গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন। সে মোতাবেক অবকাঠামোগত উন্নয়ন দ্রুত এগিয়ে চলছে। এ ছাড়া তথ্য-প্রযুক্তির সরঞ্জাম সহজলভ্য করাসহ সাশ্রয়ী মূল্যে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছেন। কম্পিউটার কেনার জন্য বিভিন্ন রকম লোনও দেওয়া হচ্ছে। এসব লোন সম্পূর্ণ বিনা সুদে অথবা নামমাত্র সুদে ও সহজ শর্তে দেওয়া হয়ে থাকে। বাংলাদেশের জনগণ এখন অনেক স্মার্ট। এখন ব্যাংকিং লেনদেনের জন্য ব্যাংকে যেতে চায় না। সব ব্যাংকেরই অ্যাপস আছে, এর মাধ্যমে দ্রুত টাকা ট্রান্সফারসহ যাবতীয় লেনদেন সম্পন্ন করা সম্ভব। ব্যাংকেরও কোনো প্রয়োজন হলে এসএমএস বা ই-মেইল করে তথ্য চায়। সেসব তথ্য ই-মেইল বা অ্যাপসের মাধ্যমে ব্যাংকে দেওয়া যায়। ব্যাংকিংব্যবস্থায় অটোমেশনসহ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার শুরু হয়েছে। গ্রাহককে ঋণ অনুমোদনসহ বিতরণব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা হচ্ছে, অর্থাৎ একজন গ্রাহক ঋণের আবেদন করার কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর কাঙ্ক্ষিত ঋণ পেয়ে যাচ্ছেন। সিটি ব্যাংক এবং বিকাশ এই ঋণ বিতরণের কাজটি প্রথম করছে।

ই-কৃষি বদলে দিয়েছে বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা। কৃষক ভাইদের চাষাবাদে এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। ই-কমার্স ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারণাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। প্রাইমারি পড়ুয়া ছেলেটিও এখন ফুড পান্ডায় অর্ডার করে পছন্দের খাবার খাচ্ছে। ভূমি ব্যবস্থাপনায় এসেছে ডিজিটাল ছোঁয়া। দেশের যেকোনো জায়গা থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকা নিজের জমির খাজনা মুহূর্তেই পরিশোধ করা সম্ভব। ই-মিউটেশন ভূমি ব্যবস্থাপনার এক যুগান্তকারী কার্যক্রম। 'ভূমি তথ্য ব্যাংক' এবং কৃষিজমি সুরক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সারা দেশে মৌজা ও প্লটভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিংয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোনসহ

সব ধরনের ইউটিলিটি বিল এখন ঘরে বসেই দিচ্ছে মানুষ, যা আজ থেকে পাঁচ বছর আগে কল্পনাও করা যেত না।

চিকিৎসাব্যবস্থায় এসেছে বড় পরিবর্তন। করোনা অতিমারি মোকাবিলায় ব্যাপকভাবে আইসিটির ব্যবহার হয়েছে। দেশের হাসপাতালগুলোতে টেলি মেডিসিনের ব্যবহার বেড়েছে। অনেক হাসপাতালেই এখন প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট, রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র ই-মেইলে সরবরাহ করা হয়। কমবেশি ৮০টি চক্ষু ক্লিনিক আছে উপজেলা পর্যায়ে। একজন নার্স এসব ক্লিনিকে একজন রোগীর চোখ পরীক্ষা করেন এবং সেই পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রোগীর জন্য চশমা দেওয়া থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র দিয়ে দেন।

আমরা কি কল্পনা করতে পারতাম, এমন একটা যুগে আমরা পৌঁছাতে পারব? এগুলো এখন কল্পনা নয়, বাস্তব। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে নতুন কারিকুলাম তৈরি করা হচ্ছে। পরীক্ষার মূল্যায়ন ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আসছে। আমাদের তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীরা এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবট তৈরি করছে। সরকারি দপ্তরে ২ হাজার ৪২৫টি নাগরিক সেবার মধ্যে ১ হাজার ৮৫১টি সেবা ইতোমধ্যেই ডিজিটাইজেশন হয়েছে। অবশিষ্ট নাগরিক সেবাগুলো ডিজিটাইজ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব ডিজিটাল কার্যক্রম মনিটর করার জন্য E-Service Monitoring Committee গঠন করা হয়েছে। সরকারি সকল সেবা এক প্ল্যাটফর্মে প্রাপ্তির জন্য 'একসেবা' মোবাইল অ্যাপস চালু করা হয়েছে। বিগত ৩৮ বছরে যে দেশটি মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য তেমন সাফল্য দেখাতে না পারেনি, সে দেশটি ২০০৮ সাল থেকে মাত্র ১৩ বছরে মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রমনির্ভর দেশ থেকে প্রযুক্তিনির্ভর দেশে রূপান্তরিত হয়েছে।

যদি কেউ সাফল্যে সচেতন হয় তাহলে সাফল্য তার পিছু ছাড়ে না। আমাদের তরুণ মেধাবী প্রজন্ম সাফল্য সচেতন। তারাই স্মার্ট বাংলাদেশ মূল কারিগর। সরকারের দূরদর্শী পরিকল্পনার আলোকে গড়ে উঠছে আমাদের আগামীর প্রজন্ম। ২০৪১ সালের আগেই তাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ হবে উন্নত বাংলাদেশ, স্মার্ট বাংলাদেশ। এটাই জাতির প্রত্যাশা।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নারী উন্নয়নে রেশমশিল্পের অবদান

রাজীব আল মামুন

একটি রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরিমাপক হিসেবে দারিদ্র্যমোচন অন্যতম। এ বিবেচনায় বাংলাদেশ এখন বিশ্ববাসীর সামনে উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনে সরকারি- বেসরকারি এবং বহুবিধ সামাজিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে গত এক দশকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে লাগসই কৌশলসমূহ যেমন–দারিদ্র্য ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সম্প্রসারণ, আর্থিক প্রণোদনা, ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে উৎসাহ প্রদান, কার্যকর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি, বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে কাজের সুযোগ করে দেওয়া, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা বিনির্মাণ ইত্যাদি প্রয়োগে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যমোচনে বিশেষজ্ঞদের নজর কেড়েছে।

দেশের দারিদ্র্যের হার বেশি রংপুর বিভাগে। এ বিভাগের দারিদ্র্যের হার ৪৭.২৩ শতাংশ, এরপর আছে ময়মনসিংহ ৩২.৭৭ শতাংশ এবং রাজশাহী ২৮.৯৩ শতাংশ। দেশের সবচেয়ে কম দরিদ্র মানুষের বসবাস ঢাকার অভিজাত এলাকা গুলশানে ০.৪ শতাংশ। আর সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষের বসবাস কুড়িগ্রাম জেলার চর রাজীবপুর উপজেলায় ৭৯.৮ শতাংশ। সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বদ্ধপরিকর। এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে যেসব বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে তা হলো আন্তর্জাতিকতা, সমন্বিত গতি-প্রকৃতি ও টেকসই উন্নয়নের সকল প্রকার মাত্রা অনুসরণ, বাস্তব ও জ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে ভঙ্গুর ও সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি গুরুত্ব প্রদান। সরকার এসডিজি বাস্তবায়নে 'সমগ্র সমাজ' পদ্ধতি অনুসরণ করে চলছে। উত্তর জনপদের পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সরকার ইতিমধ্যে নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলোর একটি হলো রেশম চাষ এবং এ শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। রেশম চাষের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো, রেশম চাষ ধনী থেকে দরিদ্রদের কাছে সম্পদ হস্তান্তর করতে পারে। রেশম চাষের সাথে জড়িত প্রায় সকলেই গরিব আর রেশম দ্বারা তৈরি পোশাক ব্যবহার করে ধনীরা। ফলে ধনীদের টাকা গরিবদের কাছে স্থানান্তরিত হয়। রেশম চাষ খুব সহজেই বাড়িতে করা যায়, এটি প্রকৃতিগতভাবে একটি গৃহপালিত উৎপাদন প্রক্রিয়া। এ কাজটি বাড়ির মহিলারা অন্যান্য কাজের পাশাপাশি করে থাকেন। ফলে অতিরিক্ত কোনো জনবলের প্রয়োজন হয় না। পরিবারের সদস্যরা তাঁদের অব্যবহৃত

শ্রমকে কাজে লাগিয়ে এবং স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্মে কোনো বিঘ্ন না ঘটিয়ে রেশম উৎপাদন করতে পারেন। পরিবারের মহিলারা রেশম উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত থাকায় পরিবারের কাছে মহিলারা অর্থ উপার্জনকারী হিসেবে বিবেচিত হন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণও সহজ হয়। অর্থাৎ রেশম চাষের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নও বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। কারণ বাংলাদেশের কমবেশি ৮৫ শতাংশ রেশম চাষি নারী। ছোট পরিসরে রেশম চাষের জন্য অতিরিক্ত জমি, সময় ও শ্রমের প্রয়োজন হয় না। রেশম চাষ পরিবেশ ও শ্রমবান্ধব।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী, রাজশাহী বিভাগের মোট জনসংখ্যা ২ কোটি ৩ লাখ ৫৩ হাজার ১১৯ জন। এর মধ্যে গ্রামে বসবাস করে ১ কোটি ৫৫ লাখেরও বেশি মানুষ। এ বিভাগে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আছে ২ লাখ ৪৪ হাজারেরও বেশি। এদের অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। এদের মধ্যে একটা বড় অংশই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করে। রংপুর বিভাগের মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ৭৬ লাখেরও বেশি। এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে ১ কোটি ৩৭ লাখেরও বেশি মানুষ। এ বিভাগে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আছে ৯১ হাজারেরও বেশি। এদের অধিকাংশই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসব দরিদ্র মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে আনা হয়েছে। এসব এলাকায় সরকার বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, টেস্ট রিলিফ, ফেয়ার প্রাইস কার্ড, আশ্রয়ণ, গৃহায়ণ, ঘরে ফেরা, বয়স্ক ভাতা, এতিম, প্রতিবন্ধী ভাতা, দুস্থ মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তদের ভাতা প্রদানসহ আরো নানা রকম কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এসব সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি কর্মক্ষম মানুষকে বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ দেওয়াসহ তাদের বিনা জামানতে প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে রাজশাহী অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি রেশম চাষ হয়। তবে বিগত বছরগুলোতে রংপুর অঞ্চলে রেশম চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম নীলফামারী ও রংপুর জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে রেশম চাষের বিস্তার ঘটেছে। এ অঞ্চলের মহিলারা নামমাত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে আবার অনেকেই পাশের বাড়ি মহিলার দেখাদেখি তার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে নিজের বসতবাড়িতেই রেশম চাষ শুরু করেছে। এর ফলে রংপুর অঞ্চলের নতুন নতুন এলাকা রেশম চাষের আওতায় আসছে। বাংলাদেশে বছরে রেশম সুতার চাহিদা কমবেশি ৪০০ মেট্রিক টন, আর আমাদের দেশে উৎপাদন হয় মাত্র ৩৫-৪০ মেট্রিক টন। ঘাটতি সুতার চাহিদা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়।

বর্তমান বিশ্বে কমবেশি ৪৫টি দেশে রেশম চাষ হয়ে থাকে। এর মধ্যে চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রধান রেশম উৎপাদনকারী দেশ। বাংলাদেশও ধীরে ধীরে রেশমের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশ রেশম উৎপাদনে

বিশ্বে দশম। বিশ্বে চার ধরনের রেশম চাষ হয়ে থাকে। এগুলো হলো ইরি, তুঁত, মুগা ও তসর। তবে বাংলাদেশে শুধু তুঁতপাতানির্ভর রেশম উৎপাদন হয়ে থাকে। রেশম চাষের দুটি প্রধান ধাপ রয়েছে। এগুলো হলো তুঁত গাছের চাষ এবং রেশম কীট পালন। বাংলা ভাষাভাষী মানুষ রেশম কীটকে পলু নামে ডাকে। রেশম কীটের একমাত্র খাদ্য হলো তুঁত গাছের পাতা। তুঁত গাছ একবার রোপণ করলে ২০-২৫ বছর পর্যন্ত পাতার ফলন দেয়। বেশি চাষেরও দরকার হয় না। বছরে ৩-৪ বার খোঁড়, নিড়ানি ছাঁটাই এবং প্রয়োজনে পানি সেচ দেওয়া লাগে। এতে অন্য ফসলের তুলনায় চাষাবাদ ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ খুবই কম। ছায়াযুক্ত স্থান বাদে বাড়ির আঙিনায়, আনাচে-কানাচে, রাস্তার পাশে চাষযোগ্য পানি জমে না এমন জমিতে চাষ করা যায়। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড বিএসআরটিআইয়ের সহায়তায় রেশম চাষিদের প্রয়োজন অনুযায়ী তুঁত গাছের চারা এবং রোগমুক্ত রেশম ডিম বিনামূল্যে সরবরাহ করে থাকে। এ ছাড়া সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় রেশম চাষিদের সব ধরনের ভৌত ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে আসছে। এসব সহায়তার মধ্যে রয়েছে তুঁত চারা সরবরাহ, তুঁত চারা রোপণ এবং যতক্ষণ না চারাগুলো উৎপাদনশীল হয় ততক্ষণ তুঁত গাছের রক্ষণাবেক্ষণের সহায়তা, রেশম কীট পালন ও রিলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে রোগমুক্ত রেশম ডিম সরবরাহ, রেশম পোকা পালনের জন্য পলুঘর (বিয়ারিং হাউস) নির্মাণের জন্য অর্থ সহায়তা, রেশম কীট বা পলু পালনের উপকরণ যেমন–ডালা, চন্দ্রকি, ঘরা ইত্যাদি এবং সবশেষে উৎপাদিত কোকুনগুলোর জন্য বিপণন সহায়তা। রেশম চাষ থেকে গরিব পরিবারগুলো গড়ে বছরে ১৬ হাজার টাকার মতো আয় করে থাকে। তবে কোনো কোনো পরিবার বছরে কমবেশি অর্ধলক্ষ টাকা আয় করে। তবে শুধু রেশম চাষই দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে না। তবে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষরা অন্যান্য পেশার সাথে রেশম চাষের মাধ্যমে তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে।

রেশম চাষ সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে পুনর্বাসনসহ আর্থিক ও সামাজিকভাবে এগিয়ে আসতে সহায়তা করছে। দরিদ্র মানুষ যখন তাদের নিজস্ব কোনো উদ্যোগে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়, তখন তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষমতা অর্জন করে। রেশম চাষির নিকট সমাজের ধনীদের অর্থ স্থানান্তর হয়ে আসে ফলে রেশম চাষ অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসে অবদান রাখে। সবচেয়ে বেশি উপকৃত হন গ্রামের দরিদ্র মহিলারা। রেশম চাষের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার নারীর অংশগ্রহণ এবং নারী নির্যাতন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীরা সচেতন হচ্ছেন, তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে, যা নারী উন্নয়নেরই শুভ লক্ষণ।

লেখক : উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড

তৈরি পোশাক শিল্পে পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা

ফারুক রায়হান

ভারতীয় উপমহাদেশে টেক্সটাইলশিল্পের ইতিহাসে যে কজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম জানা যায় তাঁদের মধ্যে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার কুষ্টিয়ার মোহন চক্রবর্তী অন্যতম। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তাঁর হাতে টেক্সটাইলশিল্পের গোড়াপত্তন হয়। ১৯০৮ সালে কুষ্টিয়া শহরের গড়াই নদের তীরে ১০০ একর জমির ওপর তিনি একটি টেক্সটাইল মিল চালু করেন। নাম দেন মোহিনী মোহন মিলস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড। এই মিলটি এক সময় এশিয়ার সর্ববৃহৎ টেক্সটাইল মিলের স্বীকৃতি পেয়েছিল। মিলটিতে তখন প্রায় তিন হাজার মানুষ কাজ করত।

এরও পূর্বে ব্রিটিশ আমলের বহু আগে থেকেই এ জনপদে হাতে বোনা কাপড়ের সুখ্যাতি ছিল। আরব ও ইউরোপীয় বণিকদের কাছে ছিল এর ব্যাপক চাহিদা। বাংলা ও এর আশপাশের এলাকায় সুলতানি আমলে হাতে বোনা কাপড়ের উৎকর্ষতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এ শিল্পটি তৎকালীন 'বসাক' সম্প্রদায়ের হাত ধরে গড়ে উঠেছিল। এ সম্প্রদায়ের মূল আবাসভূমি ছিল সিন্ধু উপত্যকার অববাহিকায়। কালের পরিক্রমায় তারা সেই স্থান ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে এসে বসবাস শুরু করে। আবহাওয়ার প্রতিকূলতার কারণে সেখান থেকে তারা রাজশাহী অঞ্চলে চলে আসে এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে পাবনা, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লাসহ অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁতের কাজ শুরু করে। তখনকার সময়ে যারা তাঁতশিল্পের সাথে জড়িত ছিল, অর্থাৎ মুসলিম তাঁতিদের 'জুলা' বলা হতো। 'জুলা' শব্দটি এসেছে ফরাসি 'জুলাহা' থেকে, যার অর্থ তন্তুবায়, অর্থাৎ সুতা তৈরি করা থেকে শুরু করে কাপড় বোনার কাজ করত। ঢাকার মসলিনের কথা কে না জানে। মোগল সম্রাটদের অন্দরমহল থেকে শুরু করে ইউরোপীয় এলিটদের কাছে এর কদর ছিল আকাশছোঁয়া। পর্যটক ইবনে বতুতার কথা আমরা কমবেশি সবাই জানি, যিনি চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি বাংলা ভ্রমণ করেন। তিনি তৎকালীন ঢাকার কাছে সোনারগাঁয়ের মসলিন দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম শতকে রচিত 'পেরিপ্লাস অব দি এরিথিয়ান সি' গ্রন্থে মসলিন সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। এ সময় রোম সাম্রাজ্যের অভিজাত রোমান নারীরা মসলিন ব্যবহার করতেন। এ গ্রন্থে তিন ধরনের মসলিনের উল্লেখ রয়েছে। একটু মোটা ধরনের মসলিনকে মলোচিনা, প্রশস্ত ও মসৃণ মসলিনকে মোনাচি এবং সর্বোৎকৃষ্ট মসলিনকে গেনজিটিক বা গঙ্গাজলী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মসলিন ছিল ৪০ হাত লম্বা ও দুই হাত চওড়া। এসব মসলিন দিয়ে রাজকীয় পোশাক তৈরি

করা হতো। ইতিমধ্যে তিনটি শিল্পবিপ্লব আমারা পার করে চতুর্থশিল্প বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করলেও সেই আমলের মসলিন আমরা আজও তৈরি করতে পারিনি। তবে আশার কথা হলো, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ আগ্রহে মসলিন পুনরুদ্ধারের জন্য একটি প্রকল্প সরকার বাস্তবায়ন করছে, যার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই আদি মসলিনের প্রায় কাছাকাছি কাউন্টের সুতা ও কাপড় তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই মসলিন পুনরুদ্ধার প্রকল্পে বুটেক্সের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. শাহ আলিমুজ্জামান বেলাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে পুরান ঢাকার উর্দু রোডে রিয়াজ স্টোরের যাত্রা শুরু হয়। শুরুতে এখানে টেইলারিংয়ের সুবিধা ছিল। সে সময় এটির সুনামও ছিল। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৩ সালে এটির নাম পাল্টে রাখা হয় রিয়াজ গার্মেন্টস। প্রথম দিকে এই গার্মেন্টসের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় মার্কেটগুলোতে বিক্রি হতো। এরপর এই গার্মেন্টসের পণ্য বিদেশে রপ্তানি শুরু হলে দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে নতুন এই ব্যবসা নিয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সেই থেকে শুরু। বাংলাদেশের গার্মেন্টস ব্যবসায়ীদের আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বিভিন্ন সময়ে নানা রকম ঝড়ঝঞ্ঝা এলেও দক্ষতার সাথে আমাদের গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা সেগুলো সামাল দিয়েছেন। রিয়াজ গার্মেন্টসের হাত ধরে চলা এই পোশাক রপ্তানি এরই মধ্যে বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়তে উন্নীত ঘটছে। ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে ভালো করছে। আমরা অনেকেই হয়তো জানি বা জানি না যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন বাংলাদেশের তৈরি ডেনিম জিনস প্যান্ট ব্যবহার করে। আর ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রতি তিনজনে একজন বাংলাদেশের তৈরি টি-শার্ট ব্যবহার করে। এটি বাংলাদেশের জন্য গর্বের। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদেশে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৪২.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের, যা মোট রপ্তানির ৮১.৮১ শতাংশ। দেশের জিডিপির কমবেশি ১১ শতাংশ আসে পোশাকশিল্প থেকে। তৈরি পোশাক রপ্তানির বিশ্ববাজারের প্রায় ৮ শতাংশ স্থান দখল করে আছে বাংলাদেশ। এর অর্থ বিশ্ববাজারের আরো বেশি অংশ করায়ত্ত করার বিশাল সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের সামনে। ২০৩০ সালের মধ্যে পোশাক রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ শিল্পে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ৪০ লাখ মানুষের। এর মধ্যে কমবেশি ৭০ শতাংশ মহিলা। পরোক্ষভাবে কমবেশি ৫ কোটি মানুষ এ শিল্পের ওপর নির্ভরশীল।

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ দক্ষতার সাথে তার অবস্থান ধরে রেখে নতুন নতুন বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করছে। গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পণ্যের মান ও ডিজাইন আধুনিক করার পাশাপাশি ক্রেতাদের রুচি এবং তাদের ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গবেষণার মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে রপ্তানি বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা হচ্ছে। পোশাকশিল্পের হাত ধরেই দেশের অর্থনীতিতে

এসেছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। শ্রমঘন এ শিল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান ও নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ের সুবিধাবঞ্চিত নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে।

বাংলাদেশে গার্মেন্টসের সবুজ কারখানা রয়েছে ১৯২টি। বিশ্বে বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি সবুজ গার্মেন্টস কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে ৬৮টি প্লাটিনাম, ১১০টি গোল্ড, ১০টি সিলভার এবং চারটি কারখানা এখনো কোনো রেটিং পায়নি। বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ ১০ কারখানার আটটি বাংলাদেশের। আর শীর্ষ ১০০ পরিবেশবান্ধব কারখানার ৫৩টি বাংলাদেশের। অন্যদিকে বিশ্বের শীর্ষ গার্মেন্টস রপ্তানিকারক দেশ চীনে আছে মাত্র ১০টি পরিবেশবান্ধব কারখানা। ২০১২ সালে প্রথম পরিবেশবান্ধব গার্মেন্টস কারখানার যাত্রা শুরু হয় পাবনার 'ঈশ্বরদী ইপিজেডের ভিনটেজ ডেনিম স্টুডিও'-এর মাধ্যমে। এ ছাড়া আরো ৫৫০টি গার্মেন্টস কারখানাকে পরিবেশবান্ধব কারখানায় রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ চলছে। সাধারণত অন্য গার্মেন্টসের চেয়ে পরিবেশবান্ধব গার্মেন্টসের খরচ ৫-২০ শতাংশ বেশি হয়ে থাকে। গত চার দশকে একটি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করার পেছনে সরকারের নীতি এবং শিল্পের অভাবনীয় বিকাশ কাজ করছে। দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অব্যাহত অবদান রাখার পাশাপাশি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত, শ্রমিকের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং পরিবেশবান্ধব সবুজ শ্রমঘন শিল্প হিসেবে গার্মেন্টস সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থায় পরিবেশ ও জলবায়ুর বিষয়গুলিকে বিদেশি বায়ার, অর্থাৎ তৈরি পোশাকের বিদেশি ক্রেতারা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। ফলে দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাণিজ্যে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখা এবং সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব কারখানা তৈরির বিকল্প নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের United States Green Building Council (USGBC) ১৯৯৯ সাল থেকে কোনো স্থাপনার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে। চারটি ক্যাটাগরিতে এই সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এই সার্টিফিকেশন প্রসেসের মধ্যে ১১০ পয়েন্টকে ৭ ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো ভৌগোলিক অবস্থান যার পয়েন্ট হলো ২৬, পানি সাশ্রয় যার পয়েন্ট ১০, প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহারের পয়েন্ট ৩৫, পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রীর জন্য ১৪, অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত অবস্থার জন্য ১৫, অতিসাম্প্রতিক উদ্ভাবন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ৬ পয়েন্ট এবং এলাকাভিত্তিক প্রাধান্যের জন্য ৪ পয়েন্ট রয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে সব ইন্ডিকেটর মিলে ৪০-৪৯ পেলে প্রতিষ্ঠানটি সার্টিফায়েড। ৫০-৫৯ পয়েন্ট পেলে সিলভার, ৬০-৬৫ পয়েন্ট পেলে গোল্ড সার্টিফিকেট এবং ৭০-৮০ বা এর বেশি পয়েন্ট পেলে প্লাটিনাম সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

উৎপাদনের সাথে পরিবেশের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে পরিবেশদূষণও বৃদ্ধি পায়। এ জন্য বলা হয় উৎপাদন ও বণ্টনের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক নেতিবাচক। কিন্তু উৎপাদন ও বণ্টন ছাড়া বর্তমান পৃথিবী অচল। তাই পরিবেশের প্রধান তিনটি উপাদান বায়ু, মাটি ও পানির দূষণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখে উৎপাদন ও বণ্টন তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখতে হয়। এ জন্যই এসডিজিতে উল্লেখ করা হয়েছে Minimum Development, maximum sustainable output অর্থাৎ আগামীর ক্ষতি না করে বর্তমানের সর্বোচ্চ উন্নয়ন করাই SDGs-এর মূল লক্ষ্য। পোশাকশিল্প অতীতেও আমাদের এ ভূখণ্ডে ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে যুক্ত করে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি পোশাক অধিক হারে রপ্তানির সুযোগ আছে।

লেখক : অর্থনীতিবিদ

স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নারীরা

আফরোজা নাইচ রিমা

স্মার্ট বাংলাদেশ হবে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সোসাইটির ওপর ভিত্তি করে। আর সমাজ উন্নয়ন নির্ভর করে পুরো জনসংখ্যার ওপরে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী, দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৮ কোটি ১৭ লাখ ১২ হাজার ৮২৪ জন; নারী ৮ কোটি ৩৩ লাখ ৪৭ হাজার ২০৬ জন। এই হিসাবে বর্তমানে প্রতি ১০০ জন নারীর বিপরীতে পুরুষ আছে ৯৮.০৪ জন। সাশ্রয়ী, টেকসই ও জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে 'প্রগতিশীল প্রযুক্তি, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতি'তে অবশ্যই নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণের কারণে বাংলাদেশে জেন্ডার সমতাসহ সব ক্ষেত্রেই উন্নতি হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে লিঙ্গ সমতায় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে নারীর অনেক ভূমিকা রয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে নারীর অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে হলে নারীদের প্রযুক্তিশিক্ষার হার বাড়াতে হবে। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে পড়াশোনার জন্য বিভিন্ন সুযোগ দিতে হবে। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, বর্তমানে মাত্র ৩০ শতাংশ নারী তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়ে পড়াশোনা করেন। আর দেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাতের পেশাজীবীদের মধ্যে নারীর সংখ্যা মাত্র ১২ শতাংশ। স্মার্ট বাংলাদেশের নারীরা এখন অনেক এগিয়ে গেছেন। তাঁরা এখন গ্রামে বসে মোবাইলের সাহায্যে অনলাইনে ব্যবসা করছেন। বিকাশে টাকা লেনদেন করছেন। মেয়েরা অনলাইনে ক্লাস করছে।

তথ্য-প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামেও বর্তমানে ডিজিটাল সেন্টার থেকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ডিজিটাল সেন্টার থেকে দেশের নাগরিকরা ৮০ কোটির বেশি সেবা গ্রহণ করেছে। বিশ্বে অনলাইন শ্রমশক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান এখন দ্বিতীয়। প্রায় সাড়ে ছয় লাখ প্রশিক্ষিত ফ্রিল্যান্সার আউটসোর্সিং খাত থেকে অন্তত পক্ষে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করছে। মাত্র ১৩ বছরে ৬৫ লাখ থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখন ১৩ কোটির বেশি এবং মোবাইল সংযোগের সংখ্যা ১৮ কোটির ওপরে।

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ৮ হাজার ৮০০টির বেশি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এসব সেন্টার থেকে প্রতি মাসে গড়ে ৭০ লাখেরও অধিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত দেশের নাগরিকরা

৮০ কোটির বেশি সেবা নিয়েছে। এতে নাগরিকদের ৭৮.১৪ শতাংশ কর্মঘণ্টা, ১৬.৫৫ শতাংশ ব্যয় এবং ১৭.৪ শতাংশ যাতায়াত সাশ্রয় সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া পেপারলেস কমিউনিকেশন চালু করার লক্ষ্যে ই-নথির মাধ্যমে ২ কোটি ৪ লাখের বেশি ফাইলের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ই-নামজারি সিস্টেমের মাধ্যমে ৪৫.৬৮ লাখের বেশি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে অনলাইনে।

এ ধরনের নানা সুবিধা পাওয়ায় দেশে স্টার্ট আপ ইকো সিস্টেম গড়ে উঠেছে। প্রায় আড়াই হাজার স্টার্ট আপ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। যারা প্রায় আরো ১৫ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। মাত্র সাত বছরে এ খাতে ৭০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ এসেছে। ১৩ বছর আগে ডিজিটাল অর্থনীতির আকার ছিল মাত্র ২৬ মিলিয়ন ডলার। আর বর্তমানে তা ১.০৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। সরকারের লক্ষ্য, ২০২৫ সালে আইসিটি রফতানি ৫ বিলিয়ন ডলার এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আইসিটি খাতে কর্মসংস্থান ৩০ লাখে উন্নীত করা। আইসিটি পার্কে দেশি-বিদেশি ১৯২টি প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে। ২০২৫ সালের মধ্যে আরো ৩৫ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে। জরুরি সেবার মাধ্যমে সুবিধা পাচ্ছে জনগণ। জরুরি সেবা ৯৯৯, সরকারি তথ্য ও সেবা ৩৩৩, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ১০৯, দুদক ১০৬, দুর্যোগের আগাম বার্তা ১০৯০, লক্ষ্য এবার স্মার্ট বাংলাদেশ। দেশে ই-কমার্সের ৮০ শতাংশ ব্যবসা পরিচালনা করছেন নারীরা। ফ্রিল্যান্সিংয়ে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। নারীর শান্তি ও নিরাপত্তা সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ১,৩২৫ নম্বর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, যা নারীর শান্তি ও নিরাপত্তা-ডব্লিউপিএস এজেন্ডা প্রতিষ্ঠা করেছে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধান ও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে। সংবিধানের ২৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : রাষ্ট্র শুধু ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করবে না, অথচ একই অনুচ্ছেদের (২) ধারায় বলা হয়েছে : নারীদের সমান অধিকার থাকবে রাষ্ট্র ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে। সরকার নারীনীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছে এবং নীতিমালায় নারীর সামগ্রিক উন্নয়ন ও মূলধারার আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং তাদের ক্ষমতায়নের পথে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, ব্যবসা, খেলাধুলা, সশস্ত্র বাহিনী প্রভৃতি খাতে তাদের বর্ধিত অংশগ্রহণ ও অবদান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক দৃশ্যপটকে বদলে দিয়েছে। বাংলাদেশে নারীরা এখন সরকারের সচিব, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং অনেক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে দায়িত্ব পালন করছেন।

গ্রামীণ জীবনেও আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে প্রতিটি ইউনিয়নে চালু করা হয়েছে ডিজিটাল সেন্টার। এই আমূল পরিবর্তনের সারথি হয়ে দেশের নাগরিকদের নিরলস সেবা দিয়ে যাচ্ছেন নারী উদ্যোক্তারা। যাঁরা

সংখ্যায় দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে নারী উদ্যোক্তারা ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছেন। নাগরিকদের সেবা প্রদান, তাঁদের জীবনমান উন্নয়ন করার পাশাপাশি আর্থিকভাবেও স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে এই সকল নারী উদ্যোক্তা। সেই সাথে তাঁরা প্রান্তিক অঞ্চলে নতুন নতুন উদ্যোক্তাও সৃষ্টি করছেন।

ডিজিটাইজেশন হওয়ার পরে বিগত বছরগুলোয় বাংলাদেশে নাগরিকের ব্যাংকিং সেবায় অন্তর্ভুক্তি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালে যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার মাত্র ৩১ শতাংশ আর্থিক পরিষেবার আওতায় ছিল। সেটা গত এক দশকেরও কম সময়ে ৫৩ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই বৃদ্ধির হার ক্রমবর্ধমান। ফিনটেক (ফিন্যানশিয়াল টেকনোলজি)-এর মতো আর্থিক পরিষেবার ডিজিটাল সেন্টারগুলোয় অন্তর্ভুক্তি নাগরিকের হয়রানি হ্রাস করছে, তাদের সেবাপ্রাপ্তিকে করেছে আরো ত্বরান্বিত, আরো সহজ। মোবাইল ফিন্যানশিয়াল সার্ভিসেস (MFS)-এর মতো পরিষেবামূলক ব্যবস্থার ফলে ব্যাংকিং সেবা এখন পৌঁছে যাচ্ছে নাগরিকের দোরগোড়ায়। সামগ্রিকভাবে এই ডিজিটাইজেশন বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য রাখছে সুদূরপ্রসারী প্রভাব।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন নারীরা। নারীর এই এগিয়ে যাওয়াই দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির এক অপ্রতিরোধ্য যাত্রা। তাঁদের অগ্রযাত্রার ফলেই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে সপ্তম, স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত কর্মীদের প্রায় ৭০ শতাংশই নারী, করোনা মহামারির বিরুদ্ধে লড়াইয়েও তাঁরা ছিলেন সম্মুখ সারির যোদ্ধা। তৈরি পোশাক আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি, সেখানেও ৮০ শতাংশের বেশি নারীকর্মী নিয়োজিত রয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত এই সকল নারীর প্রতিটি বুননে ফুটে উঠেছে আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশের অবয়ব; এবং নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এই অংশগ্রহণমূলক ধারাবাহিকতায় রচিত হবে আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি।

আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, সোনালি সাহিত্যভিত্তিক ও উদ্ভাবনী বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বাধীনভাবে সংস্কৃতি চর্চা ও বিকাশের সুযোগ দানে নারী এবং পুরুষকে একযোগে কাজ করতে হবে। শুধু অর্থনীতিই একটি দেশ বা জাতির উন্নয়নের সূচক হতে পারে না, এর পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের সূচকও সমান গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, চিত্রকর, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন পেশাজীবীকে স্বাভাবিক নিয়মে শিল্পচর্চায় এবং যাঁর যাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা, ধারণার উন্মেষের ফলেই সম্ভব হবে স্মার্ট মানুষ, স্মার্ট পরিবার এবং স্মার্ট সমাজ–সর্বোপরি স্মার্ট বাংলাদেশ।

কারিগরি শিক্ষায় বর্তমানে শতভাগ ছাত্রদের উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। ছাত্রদের ক্ষেত্রে এ হার ৭০ শতাংশ। ডিপ্লোমা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেলে ভর্তির ক্ষেত্রে নারীদের ১০ শতাংশ কোটা বৃদ্ধি করে ২০ শতাংশ করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগীয়

শহরে একটি করে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ৪০ শতাংশ ছাত্রীদের উপবৃত্তি, বই ক্রয়, ফরম পূরণ, টিউশন ফি এর অর্থ উপকারভোগী ছাত্রীদের Electronic Funds Transfer (EFT)-এর মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। এ উপবৃত্তি প্রদানের ফলে গরিব নারী শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়া সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় 'Improving Access and Retention Through Harmonized Stipend Program' শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে বৃত্তি ও মেধা বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের শ্রমশক্তির আকার কমবেশি ৬ কোটি ৩৫ লাখ। এর মধ্যে নারী আছে কমবেশি ২ কোটি। শ্রম বাজারে নারীর অবদান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের ৮ কোটি ২২ লাখ নারীর কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারলে দেশ ও জাতির দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হতো। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি-২০১১)-এর আলোকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও নারী সার্বিকায়ন নিশ্চিত করে শ্রম বাজারের চাহিদা উপযোগী টিভিইটি ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা থাকলেও তা বাস্তবায়নে আরো কার্যকর ও সমন্বিত উদ্যোগ করা দরকার।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

আকাশ কটাক্ষ নিয়ে ভাবনা

পরীক্ষিৎ চৌধুরী

'খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন। হারুর মাথার কাঁচা-পাকা চুল আর মুখে বসন্তের দাগভরা রুক্ষ চামড়া ঝলসিয়া পুড়িয়া গেল। সে কিন্তু কিছুই টের পাইল না। শতাব্দীর পুরাতন তরুটির মুখ অবচেতনার সঙ্গে একান্ন বছরের আত্মমমতায় গড়িয়া তোলা চিন্ময় জগৎটি তাহার চোখের পলকে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কটাক্ষ করিয়া আকাশের দেবতা দিগন্ত কাঁপাইয়া এক হুঙ্কার ছাড়িলেন। তারপর জোরে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল।'–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের সূচনা এভাবেই।

এই 'আকাশ দেবতার কটাক্ষ'–বজ্রপাত, আজ এক গভীর ভাবনার বিষয়। যে কটাক্ষে চলতি মাসেও দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকজন হারুকে হারাতে হয়েছে, আহত হয়েছে অনেকে। আকাশে কালো মেঘের ছড়াছড়িতে চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার হলেও অনেকে মাছ ধরতে বা ক্ষেতে কাজ করতে যায়। বিপদে তারা খোলা মাঠে দিশাহারা হয়ে পড়ে বা কোনো গাছের নিতে আশ্রয় নেয়, যা বজ্রপাতের কবলে পড়ার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

বজ্রপাত কোনো ব্যক্তির ওপর সরাসরি পড়তে পারে অথবা একটি বড় এলাকাজুড়েও হতে পারে। বজ্রপাতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বেশির ভাগই তৎক্ষণাৎ মারা যায়। বজ্রপাতে আহতদের চিকিৎসার জন্য কোনো প্রটোকল নেই। বজ্রপাতে আহত কাউকে কী চিকিৎসা দেওয়া হবে, সেটাও বেশির ভাগ মানুষের জানা নেই।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বাংলাদেশ ঝড়, বন্যা ও বজ্রাঘাতপ্রবণ অঞ্চল। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে বছরে ৮৪ লাখ বজ্রপাত হয়। বিশ্বে বজ্রপাতের প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষ প্রাণ হারায় বাংলাদেশে। ক্রমবর্ধমান উষ্ণতা ও পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা–সব মিলিয়ে যেন বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরির আদর্শ পরিবেশ এ দেশের বায়ুমণ্ডল। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে দুই ধরনের বজ্রপাত হয়। মেঘ থেকে আরেকটি মেঘে এবং অপরটি মেঘ থেকে ভূমিতে, যার কারণেই জানমালের ক্ষতি বেশি হয়।

দেশের সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, পাবনা, নওগাঁ, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, জামালপুর, গাইবান্ধা ও টাঙ্গাইল সবচেয়ে বেশি বজ্রপাতপ্রবণ জেলা। এই ১৫ জেলায় মৃত্যুও বেশি। এর মধ্যে মার্চ-এপ্রিল ও মে মাসে বজ্রপাত বেশি হয় হাওরাঞ্চলে–কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট ও নেত্রকোনা জেলায়। জুন, জুলাই,

আগস্টে হয়ে থাকে সুনামগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও বরিশালে। অন্যদিকে কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড়েও বজ্রপাত বেশি হয়। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরে পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কক্সবাজারে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতের তথ্য সফটওয়্যারে প্লটিং করে বাংলাদেশের একদল গবেষক দেখেছেন, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পূর্ব ও সরাসরি উত্তর-পূর্ব কোনাকুনি এলাকা, অর্থাৎ সুনামগঞ্জ-সিলেট অঞ্চলে অধিকাংশ বজ্রপাত হচ্ছে।

বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা বজ্রপাতকে আবহাওয়া সম্পর্কিত দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, বুয়েট, দুর্যোগ ফোরাম, গণমাধ্যমের তথ্য ও একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হিসাবমতে, গত ছয় বছরে সারা দেশে বজ্রপাতে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছে। বজ্রপাতের মাত্রা এবং মৃত্যুর সংখ্যা বিবেচনা করে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সরকার এটিকে বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

দুঃখজনক সত্যটি হলো, বাংলাদেশে বজ্রপাতের ওপর তেমন কোনো গবেষণা নেই। তবে ইউরোপ, জাপান ও আমেরিকায় এ বিষয়টি নিয়ে বড় গবেষণা চলছে। আমেরিকান মেট্রোলজিক্যাল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ 'লাইটিং ফ্যাটালিটিস ইন বাংলাদেশ ফ্রম ১৯৯০ থ্রু ২০১৬'-এ দেখানো হয়েছিল, ওই ২৬ বছরে বজ্রপাতে মারা গিয়েছে তিন হাজার ৮৬ জন। যার মধ্যে ৯৩ শতাংশই গ্রামের এবং কৃষক। বর্ষার শুরুর দিকে মৃত্যু হয় সবচেয়ে বেশি (৬২ শতাংশ)। বর্ষার মধ্যবর্তী সময়ে ৩৩ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে সকাল ও দুপুরে। কারণ ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাতকে উপেক্ষা করে এ দেশের লোকজন খোলা জায়গায় কাজ করে। বিশেষ করে হাওরাঞ্চলের কৃষক ও জেলে সম্প্রদায়। আকস্মিক এ দুর্যোগের সময় দ্রুত সরে যাওয়ার নিরাপদ স্থান না থাকায় মাঠেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি সংগঠন 'ডিজাস্টার ফোরাম'-এর তথ্য মতে, কৃষিকাজের সময় ৭০ শতাংশ, সাড়ে ১৪ শতাংশ বাড়ি ফেরার পথে এবং পুকুরে বা নদীতে ১৩ শতাংশের মৃত্যু হয়েছে বজ্রাঘাতে। তবে শহরের ভবনগুলোয় বজ্রপাত প্রতিরোধক দণ্ড থাকায় হতাহতের সংখ্যা কম।

সাম্প্রতিক সময়ে অস্বাভাবিক হারে বজ্রপাত বৃদ্ধির কারণ হিসেবে জলবায়ু বিজ্ঞানীরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ার ধরন পরিবর্তন, জলীয়বাষ্পের মাত্রা বেড়ে যাওয়া, আকাশে কালো মেঘের পরিমাণ ও মেঘে মেঘে ঘর্ষণের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বেশি দায়ী করেছেন। পাশাপাশি বৃক্ষনিধনের ফলে উঁচু গাছের সংখ্যা কমে যাওয়া, বন উজাড়, মোবাইল ফোন ব্যবহার ও টাওয়ারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া বড় ভূমিকা রাখছে বলেও তাঁরা মনে করেন।

আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তাপমাত্রা যত বাড়ে, বজ্রপাতও তত বাড়ে। তাপমাত্রা গড়ে ১ ডিগ্রি বেড়ে গেলে বজ্রপাত ১০ শতাংশ বা তার চেয়ে বেশি বেড়ে যায় বলে ধারণা করা হয়।

বজ্রপাত থেকে রক্ষায় সচেতনতার বিকল্প নেই। বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য প্রথম কাজ হলো বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে মনোযোগী হওয়া। পরিবেশ দূষণ ও বৃক্ষনিধন রোধসহ নিয়মিত বৃক্ষ রোপণে সচেষ্ট থাকতে হবে। একটি গাছ কাটলে অন্তত পাঁচটি চারাগাছ রোপণ করার যে স্লোগান দেওয়া হয়, তাকে শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে। বাড়ির আশপাশে, রাস্তার উভয় পাশে, উন্মুক্ত স্থানে সুপারি, নারিকেল, তালজাতীয় গাছ লাগাতে হবে।

গ্রামের মানুষ বজ্রপাত বা আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকে। বজ্রপাত থেকে নিরাপদে থাকতে কিছু করণীয় পরামর্শ মেনে চলার জন্য বলছেন আবহাওয়াবিদরা। এগুলো হলো বিদ্যুৎ চমকালে খোলা প্রান্তরে না থেকে ঘরের ভেতরে থাকতে হয়। বজ্রপাতের সময় পাকা বাড়ির নিচে আশ্রয় নিতে হবে এবং গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে দূরে থাকতে হবে। বজ্রপাত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে ধাতব হাতলযুক্ত ছাতার পরিবর্তে প্লাস্টিক হাতলযুক্ত ছাতা ও রাবারের জুতা ব্যবহার করা উচিত। বজ্রপাতের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। টেলিভিশন, ফ্রিজ, এসিসহ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামকে বৈদ্যুতিক সকেট থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। এ সময় বারান্দার ধাতব গ্রিল স্পর্শ করা উচিত না। রান্নাঘর বা টয়লেটের পানির ধাতব কলের মুখসহ অন্যান্য ধাতব পাইপ থেকেও দূরে থাকতে হবে। ভবন নির্মাণকাজের সময় তামার তারের মাধ্যমে আর্থিং করিয়ে নেওয়া উচিত।

এবার প্রাতিষ্ঠানিক করণীয় নিয়ে বলি। আবহাওয়া জরিপের মাধ্যমে দেশের বজ্রপাতপ্রবণ এলাকাগুলো শনাক্ত করে 'বজ্রপাত নিরাপত্তা বলয় জোন' স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। বিস্তীর্ণ জলাভূমি বা উন্মুক্ত প্রান্তরে কৃষক যেন অল্প সময়ে নিরাপদ স্থানে যেতে পারে সেজন্য প্রাক-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা ও বজ্রপাতনিরোধক স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে। এসব এলাকায় মুঠোফোনের টাওয়ারে বজ্রপাতনিরোধক লাগিয়ে বজ্রপাতের ঝুঁকি কমানো যেতে পারে। মুঠোফোন কোম্পানিগুলো তাদের দায়িত্বের অংশ হিসেবে কাজটি করতে পারে। পল্লী বিদ্যুৎ ও সীমান্তরক্ষীদের সব স্থাপনায় কমবেশি এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশ্বের দেশে দেশে এসব প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে বজ্রপাতে আগে বছরে ৪০০ থেকে ৪৫০ জন নিহত হতো, সেখানে এখন মারা যায় ২০ থেকে ৪০ জন। বজ্রপাতের ঝুঁকি মোকাবিলায় সারা দেশে তালগাছের ৫০ লাখ চারা রোপণের উদ্যোগকে শেষ করতে হবে।

সতর্কবার্তা দ্রুত প্রচারের জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের তৎপর থাকতে হবে। মোবাইল মেসেজ ও রেডিওর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মানুষকে জানানোর ব্যবস্থা করতে পারলে মৃত্যুর ঘটনা কমবে। এ ক্ষেত্রে কমিউনিটি রেডিওগুলো অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। যেহেতু মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত বজ্রপাতের প্রকোপ বেশি, এই সময় বেশি বেশি প্রচার, সতর্কীকরণ, সামাজিক সভা ও মাইকিং করতে হবে। তবে সহজ ভাষায় আবহাওয়া সংক্রান্ত সতর্কবার্তা প্রচার করার দিকে সংশ্লিষ্টদের নজর দেওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে,

গ্রামের সাধারণের পক্ষে আবহাওয়ার গতানুগতিক কেতাবি পূর্বাভাস বোঝা বেশ কঠিন।

বজ্রপাতে প্রাণহানি ঠেকাতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে এবং কৃষি মন্ত্রণালয় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন মেয়াদের পৃথক প্রকল্প হাতে নিচ্ছে। 'হাওরাঞ্চলে কৃষকদের জীবনের সুরক্ষায় বজ্রনিরোধক ব্যবস্থা স্থাপন' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ২৩ জেলায় 'লাইটার অ্যারেস্টার' সংবলিত বজ্রপাতনিরোধকসহ কংক্রিটের ছাউনি বা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করবে। এখানে লোকজন নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারবে। পৃথিবীর অনেক দেশেই 'লাইটার অ্যারেস্টার' প্রযুক্তি আছে। প্রাথমিকভাবে হাওর এলাকায় ১ হাজার বজ্রপাতনিরোধক নির্মাণ করা হবে। থাকবে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম, যা বজ্রপাতের ৪০ মিনিট আগেই সংকেত দিবে। মোবাইলের মাধ্যমে এ সতর্কবার্তা মাঠের কৃষকসহ সবার কাছে পৌঁছে যাবে। ইতোমধ্যে মেহেরপুরের গাংনীতে এ ধরনের ছোট ছোট কয়েকটি ছাউনি করা হয়েছে। এখন হাওরেও হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয় পাইলট আকারে হাওর এলাকার চারটি উপজেলায় ১৬টি 'আর্লি স্টিমার ইমিটার (ইএসই)' নামক বজ্রনিরোধক স্থাপন করবে। পরে আরো হাওরের তিন জেলায় তা সম্প্রসারিত হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা জনসচেতনতা তৈরির জন্য কাজ করছে। হাওরাঞ্চলে স্থাপিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থ নেটওয়ার্ক থেকে পাওয়া সেন্সরভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় 'ক্লাউড টু গ্রাউন্ড' এবং 'ক্লাউড টু ক্লাউড লাইটনিং ডিটেকশন সিস্টেম', যা মোবাইল অ্যাপ, মোবাইল ভয়েস ও টেক্সট মেসেজের সাহায্যে কৃষকদের সতর্ক করবে।

বজ্রপাত থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন সুরক্ষার জন্য 'পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি)' ১৯৯৬ সাল থেকে সঞ্চালন লাইনে গ্রাউন্ড-ওয়্যারের পরিবর্তে অপটিক্যাল গ্রাউন্ড ওয়্যার (ওপিজিডব্লিউ) প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৭ হাজার ৩৭৭ কিলোমিটারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

যত উদ্যোগই নেওয়া হোক না কেন, বজ্রপাত থেকে মৃত্যু কমাতে সচেতনতাই প্রথম অবলম্বন। সচেতনতা গড়ে তুলতে গণমাধ্যম, জনপ্রতিনিধি ও সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। সকল প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বনভূমির পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং প্রকৃতির সঙ্গে সখ্যতা বাড়াতে হবে।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

Success of Cotton Cultivation in Poverty Alleviation

Dr. Mahatab Kabir

Cotton is the main raw material of textile mills and a cash crop to farmers. Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman established the Cotton Development Board in 1972 with the aim of introducing cotton cultivation in Bangladesh for the development of textile industry and sustainable development of the country. The Cotton Development Board has been providing necessary support to make cotton cultivation more profitable for the farmers. The Cotton Development Board provides support to farmers in research, extension, distribution of microcredit and marketing of cotton. As a result of the concerted action taken by the Cotton Development Board under the auspices of the present government, the production of cotton in the country has increased consistently over the past few years. Through the research of the Cotton Development Board, a total of 20 (twenty) has released high yielding varieties. Chinese hybrid cotton seeds are being cultivated at field level from 2009-10 season by government and private initiatives, yielding 12-15 maunds per bigha.

Bangladesh is the world's second largest cotton consumer and largest importer country. Bangladesh ranks second only to China in terms of imports as the local garment industry is highly dependent on cotton imports place. More than 74 percent of Bangladesh's garment exports are cotton garments. But in this case the global picture is completely different. Overall, 78 percent of the world's manufactured clothing is handwoven. Local entrepreneurs have also increased investment in handwoven fabrics to strengthen their position in the global market. Cotton spinning capacity in Bangladesh is in good condition. Local spinners are able to supply 95 percent of the yarn for the knitting sector and 40 percent of the materials for the oven sector.

The textile and clothing industry is divided into two parts in the global market. One part is natural fiber i.e. cotton yarn and the other part is artificial fiber based on man made fiber i.e. polyester, nylon, viscose etc. Historically, the textile and clothing sector of Bangladesh is dependent on natural fiber and cotton yarn. But there has been a major change in the textile and clothing sector in the global market in the last 10 years. That is, 70 percent of the textile and clothing market is now occupied by synthetic yarn polyester or man made fiber. And 30 percent is occupied by clothes made of cotton yarn.

Bangladesh's strong position in the global market of ready-made garments is based on the natural fiber and cotton yarn based garment industry. Bangladesh usually imports cotton from India, Uzbekistan, Kazakhstan and African countries. Local mills import the most cotton from India. Cotton is imported from the neighboring country through the sea port of Calcutta and the land port of Benapole. Due to relatively short geographical distance with India, shipment takes less time. As a result, transportation and other logistics costs are also relatively low. The quality of cotton produced in our country is equal to the quality of imported cotton. The annual fiber demand of 407 spinning mills in our country is more or less 50-60 lakh bales (1 bale = 182 kg). Current production is only 3-4 percent of domestic demand. 10-15 percent of the total demand locally. To meet the increased demand, the Cotton Development Board has adopted an action plan for cotton cultivation in one lakh hectares of land by 2030. To expand cotton cultivation without disrupting food production, the Cotton Development Board has started work by earmarking non-traditional areas such as tobacco and agroforestry land for cotton cultivation. Since cotton is drought and salinity tolerant, cotton cultivation is being expanded in drought, saline, pasture and hilly areas. Without disrupting food production, it is possible to produce one million bales of fiber cotton by cultivating cotton in less productive areas such as Barendra, Char, hilly and coastal areas. In the southern part of the country, the work of expanding cotton cultivation has started in rabi season in fallow land after Aman paddy harvesting. At present there are expansion activities of cotton development board in 131 upazilas of 39 districts of the country. Expansion activities are being implemented. Cotton production and processing has huge employment potential in the country. Besides providing cotton fiber as raw material for cotton plantation, textile industry is playing an effective role in food security of small and marginal farmers.

From cotton seed sowing to seed cotton processing, employment opportunities are created for women workers. 40 percent fiber and 60 percent seed are obtained from seed cotton produced. Again 15 percent edible oil and 85 percent oil are obtained from the seeds. Cotton husks are used as fish and animal feed. In the financial year 2021-22, more than 700 tons of edible oil and more than 3 thousand tons of oil have been produced. A high-capacity machine has been installed at the headquarters of the Cotton Development Board for checking the quality of cotton. On the advice of Cotton Development Board, a cotton oil refinery factory has been set up by private enterprise in Kushtia. Edible oil is being produced from the factory. Cotton Development Board has been implementing research program since 1991. The main objectives of cotton research

are to develop short-term high-yielding and hybrid varieties with fiber of desired qualities, to develop agronomic management techniques to increase productivity, to improve soil fertility through integrated management of organic and inorganic fertilizers, to evaluate organic pesticides for controlling harmful insects of cotton and to manage cotton diseases. In addition, research on resilience in combination with traditional knowledge and bio-technologies to expand cotton cultivation in hilly, pasture, saline and drought-prone areas. From cotton production to ginning, oil and Khail (Oil-cake) marketing, employment opportunities are created for a wide range of people including women. Cotton plant is also used as a medium for mushroom production. In the leading cotton producing countries, cotton plants are being used to make particle board. According to the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), the country's annual yarn spinning and cloth production capacity is 33 billion kg and 78 billion meters respectively. Bangladesh annually produces 1.15 million bales of unginned cotton. Has the ability to use. But currently 85 lakh bales of cotton are being used.

The garment industry has developed in Bangladesh. The export sector of the country is based on the garment industry. Its main material is cloth. Therefore, the demand for clothes is increasing gradually. Due to rising labor wages, environmental problems and the recent trade war with the United States, Chinese companies are withdrawing from the clothing business.

It increases the potential of Bangladeshi garments in the world market. Most of the investments are coming in the garment sector where the government is establishing economic zones. When production starts in these factories, the demand for clothes will increase.

Apart from this, as a by-product of cotton, there is a possibility of employment in the industry of making gauze, bandages, high quality paper, photo film paper etc. In one word, cotton is one of the agricultural products for food security, poverty alleviation and socio-economic development of small and marginal farmers. Through modern methods of cotton cultivation, it is possible to fulfill the cotton demand of the country and play an important role in the employment of backward women in the society and poverty alleviation.

Writer: Economist

খাজনা দেওয়া কত সহজ!

মুস্তাফা মাসুদ

রফিক খোন্দকার বড় শৌখিন আর সোজাসাপ্টা মানুষ। কোনো দীর্ঘসূত্রতা, অনিয়ম আর ধানাইপানাই তার একেবারেই পছন্দ নয়। অসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা বলে আয়েশি অলস জীবন যাপন করেন না। খাওয়াদাওয়া, চলাফেরা, ওঠাবসা, কথাবার্তা, লেনদেন–সর্বক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ আর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখেন; একচুল হেরফের হওয়ার উপায় নেই। তিনি প্রতি মাসে ব্যাংকে গিয়ে পেনশনের টাকা তোলেন। বিদ্যুৎ বিল দেন। গ্যাস সিলিন্ডার কিনে আনেন। নিয়মিত বাজারে গিয়ে সদাইপাতি কেনেন। তার ওপর রোজ এক-দেড় ঘণ্টা হাঁটা একেবারেই বাধ্যতামূলক।

পৈতৃক সূত্রে বেশ কিছু কৃষি-অকৃষি জমি পেয়েছেন খোন্দকার সাহেব। তিনি লক্ষ করেছেন–গ্রামে বেশিরভাগ মানুষই নিয়মিত ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা দেয় না। কিন্তু তিনি অন্যান্য বিষয়ের মতো এ ক্ষেত্রেও সিরিয়াস এবং পাংচুয়াল। চার বছর যাবৎ তিনি গ্রামে সেটেল্ড। এর আগে ঢাকায় থাকার সময় প্রতিবছর চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে বাড়ি এসে নিজে সব জমির খাজনা দিয়ে যেতেন ভূমি অফিসে গিয়ে। গ্রামে সেটেল হওয়ার পরও সেই ধারা অব্যাহত রেখেছেন। সেজেগুজে ভূমি অফিসে জমির খাজনা দিতে যাওয়া তার কাছে ভারি আনন্দের একটা কাজ। শুধু আনন্দই নয়; খাজনা দেওয়ার বিষয়টি তার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। এই স্বাধীন দেশের কিছুটা ভূখণ্ড একান্তভাবেই তার নিজের অধিকারে; তাঁর বংশধরদের অধিকারে–এই বোধ তাঁকে তৃপ্ত করে; আত্মপ্রত্যয়ে উজ্জীবিত করে। তাই কৃষি-অকৃষি–কোনো জমির খাজনাই তিনি কখনোই বাকি রাখেন না। এ ব্যাপারে তাঁর সাফকথা : সরকার চলে জনগণের খাজনা-ট্যাক্সের টাকায়। তা পরিশোধ না করলে সরকার চলবে কীভাবে! দেশের উন্নয়নই-বা হবে কীভাবে! এমন সাফকথার জন্য গ্রামের কেউ কেউ তাঁকে নিয়ে জনান্তিকে ঠাট্টা-তামাশাও করে : শহর থে নতুন আয়ছে তো, তাই এট্টু বেশি ভাব দেহাচ্ছে। কেউ বলে : বুড়োর দেমাগ আছে; তয় কথাডা কিন্তু অল্যাজ্য কয়নি। কেউ আবার ফোঁড়ন কাটে : আরো কিছুদিন যাক, সব ফট্টিফটাং চলে যাবেনে। এহানে শহরের দস্তুর চলে না, চাচা।

আজ সোমবার। চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ। রফিক খোন্দকার সকালের নাশতা খেয়ে কাপড়চোপড় পরেন। যত্ন করে তাতে সেন্ট স্প্রে করেন। ধোপদুরস্ত পায়জামা-পাঞ্জাবিতে দারুণ মানিয়েছে তাঁকে। এই ষাটোর্ধ্ব বয়সেও মাথাভর্তি চুল–সবটা তেমন পাকেওনি। সাদা, কালো আর বাদামির মিশেলে চুলগুলো এক বিশেষ সৌন্দর্যে চিক চিক করে। রফিক সাহেব তাঁর প্রিয় চুলগুলোয় চিরুনি চালিয়ে আরো

বিন্যস্ত আর পরিপাটি করছেন। তখনই মিসেস রফিক মানে রাশেদা বেগম বলেন : হ্যাঁ গো, দক্ষিণ পাড়ার সুলতান এসেছে। তোমার সাথে নাকি জরুরি কথা আছে। ড্রয়িংরুমে বসা আছে।

রফিক সাহেব একটু পর ড্রয়িংরুমে আসেন। সুলতান দাঁড়িয়ে তাঁকে সালাম দেয়। সে উপজেলা সদরের বাজারে একটি আইটি ফার্ম চালায়। ভারি চটপটে আর বুদ্ধিদীপ্ত ছেলে। রফিক সাহেব তাকে ডেকেছেন কম্পিউটারের কিছু বিষয় শেখার জন্য। এমনিতে তিনি কম্পিউটারে লিখতে পারেন, খবরের কাগজও পড়তে পারেন। কিন্তু ওতে তাঁর চলছে না। বর্তমানে দেশে ইনফরমেশন টেকনোলজির যেরূপ অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে, সেক্ষেত্রে কম্পিউটার সম্পর্কে ওইটুকু বিদ্যে দিয়ে তাঁর আর চলছে না। তাই সুলতান এসে রোজ সকালে তাকে একটু তালিম দিয়ে যাবে। অবশ্য এ জন্য তাকে উপযুক্ত সম্মানী দেবেন তিনি।

রফিক সাহেবকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করে সুলতান : দাদা, কোথাও যাচ্ছেন বুঝি? হ্যাঁ রে ভাই... কোথায়... ভূমি অফিসে। বাংলা বছর শেষ হতে আর মাত্র দুদিন বাকি। তাই যাচ্ছি জমির খাজনা দিতে। খাজনা দিতে! ভূমি অফিসে... যেন আকাশ থেকে পড়লে ভায়া! খাজনা দিতে ভূমি অফিসে যাব না তো মৎস্য অফিসে যাব নাকি? মাই ডিয়ার ইয়াং দাদু, ডিজিটাল বাংলাদেশে বসে আপনি অ্যানালগ মানুষের মতো কথা বলছেন। মানে? মানে হলো : বাংলাদেশে এখন ডিজিটাল প্রযুক্তি গ্রামেগঞ্জে, ঘরে ঘরে বিস্তৃত হয়েছে। যাদের ঘরে স্মার্ট ফোন, কম্পিউটার/ল্যাপটপ আর ইন্টারনেট-ওয়াইফাই আছে, দুনিয়া তাদের হাতের মুঠোয়। এখন ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ আছে। কম্পিউটারও আছে গ্রামের অনেক বাড়িতে। স্মার্ট ফোন আর ইন্টারনেট-ওয়াইফাইও আছে বহু বাড়িতে। তাই ঘরে বসেই এখন অনেক কিছুই করা যায়। আপনার বাড়িতেও তো এসব সুবিধা আছে... সংক্ষেপে বলো ভায়া। আমাকে আবার ভূমি অফিসে....যেতে হবে না। মানে? আপনার এই কম্পিউটার দিয়ে ঘরে বসেই খাজনা দিতে পারবেন। আপনার মোবাইল ফোন দিয়েও পারবেন।

রফিক সাহেব এবার ঘোরলাগা মানুষের মতো তো-তো করেন আর তাকিয়ে থাকেন সুলতানের মুখের দিকে। ডিজিটাল বাংলাদেশের নানা বিস্ময়ের কথা তিনি শুনেছেন, ভাসাভাসা জানেনও কিছু কিছু। তার পরও সুলতানের কথায় তিনি যেন খেই হারিয়ে ফেলেছেন। তবে সুলতান যে মিথ্যে বলছে না–তাও তিনি বুঝতে পারেন। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলেন : তাই নাকি ভায়া! তাহলে তো খুব ভালো হয়! তো ভায়া, দেখাও তো তোমার ডিজিটাল জাদু? দেখি, শিখি আর নিজেও অ্যাপ্লাই করি। তবে এখনি পারব না; তুমি শিখিয়ে দিলে একসময় অবশ্যই পারব। দিচ্ছি। তবে তার আগে আপনার জাতীয় পরিচয়পত্র আমাকে দেন। আপনার ফোন নম্বরও লাগবে, কিন্তু তা আমার মুখস্থ আছে। আপনি আইডি কার্ডটা নিয়ে আসুন, ওতে জন্মতারিখও আছে।

রফিক সাহেব তক্ষুনি এনআইডি কার্ড নিয়ে এলেন। এবার সুলতান রফিক সাহেবের কম্পিউটার ওপেন করে, তারপর www.ldtax.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট বক্সে রফিক সাহেবের মোবাইল নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও জন্মতারিখ লেখে। এর পরপরই রফিক সাহেবের মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে ৬ ডিজিটের একটি ওটিপি (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড– মাত্র একবার ব্যবহারযোগ্য সুরক্ষা কোড) কোড ভেসে ওঠে। সেই কোড লিখে পরবর্তী বাটনে ক্লিক করলে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়। তখন সুলতান বলে : দাদু, রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। এখন আপনার প্রোফাইলের জন্য একটি পাসওয়ার্ড দরকার; সেটি আপনি নিজে লিখুন, গোপন তো– সেজন্য।

রফিক সাহেব একটু ভেবে একটা পাসওয়ার্ড লেখেন তারপর সুলতানকে বলেন : ভায়া, লিখেছি। এখন? এখন এই পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার আইডিতে লগইন করুন। লগইন করার পর খতিয়ান অপশনে গিয়ে খতিয়ানের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি দিলেই কম্ম কাবার। এখন খতিয়ানটা আনুন এবং খতিয়ানের তথ্যাবলি লিপিবদ্ধ করুন। এরপর এ পর্যায়ের কাজ শেষ হবে।

রফিক সাহেব রাশেদাকে বলেন, খতিয়ানের ফাইলটা দাও। ঘরে টেলিভিশনের পাশেই রেখেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিসেস রফিক ফাইলটা নিয়ে আসেন। রফিক সাহেব উৎসাহের সাথে নির্ধারিত ঘরে খতিয়ানের তথ্যাবলি লিপিবদ্ধ করেন। তারপর বলেন : কমপ্লিট, ভায়া। এরপর? এরপর মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে খাজনার টাকা বিকাশ করুন– খাজনার পরিমাণ তো আগেই জেনেছি, তাই না? আচ্ছা উঠুন, এ কাজটি না হয় প্রথমবার আমিই করে দিচ্ছি; এর পর থেকে আপনি করবেন–বলেই সুলতান কম্পিউটারের দখল নেয় এবং বলে মোবাইলে পর্যাপ্ত টাকা আছে তো? আছে। ও. কে। যা রে যা টাকা ছাইড়া দিলাম তোরে; উইড়া উইড়া জমা হয়ে যা সরকারের ঘরে। হা-হা-হা, দাদু হয়ে গেছে! খাজনার টাকা জমা হয়ে গেছে। মজার জাদু, না দাদু?

হ্যাঁ, মজার জাদু-ই; তবে ডিজিটাল জাদু। সত্যি ভায়া, চিন্তাই করা যায় না–বাংলাদেশ ইনফরমেশন টেকনোলজিতে এত বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করেছে! ভবিষ্যতে আরো কত 'জাদু' অপেক্ষা করছে, কে জানে! জীবনটা এখন কত সহজ আর সুন্দর হয়েছে বিজ্ঞানের আশীর্বাদে– নির্দিষ্ট করে বললে, তথ্য-প্রযুক্তির স্বর্ণালি স্পর্শে! সুলতান ভায়া, আমার মনটা আজ ভারি খুশি– হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে/ ময়ূরের মতো নাচেরে!' জয়তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা! জয়তু ভূমি মন্ত্রণালয়। এভাবেই আমার প্রিয় দেশটা পৌঁছে যাক উন্নতি-অগ্রগতি আর সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে–এই কামনা করি।

লেখক : উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

Ensure Safe Food For All

Professor Tamanna Sarkar

One of the basic needs of human survival is food. Basically our existence depends on food. Generally, the foods that increase the body's growth, produce energy, prevent disease and replenish damage, i.e. nourish the body, are called food. Food is all the ingredients that are needed to keep the body healthy and functional by running the body's functions properly. Food safety is one or more steps taken to protect the health of the consumer by protecting food from various contaminants or hazards such as: physAnything that can contaminate food and is harmful to human health is called a food hazard. Therefore, food safety and nutrition is an important issue for us to build a healthy and strong nation. Food handlers have an important role to play in controlling food-related hazards.

Article 25(1) of the United Nations Universal Declaration of Human Rights in 1948 states that everyone has the right to food. According to Article 15(a) and 18(1) of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, the basic needs of food must be met for all citizens of the state. Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman said in a conference organized by Bangladesh National Cooperative Union on June 3, 1972, "Every person in my country will get food, get shelter, get education, have a better life - this is my dream." In order to realize the dream of the father of the nation, according to the definition adopted at the World Food Summit in 1996, the Government of Bangladesh is committed to ensuring the ability of all citizens to obtain food necessary for active and healthy living at all times. In 2000, consolidation of the country's food security began with the formulation of a comprehensive food security policy for Bangladesh. The food system in Bangladesh has undergone major changes in the last decade, where rice and wheat are readily available to poor and disadvantaged families, increased food grain production and awareness programs on nutritious safe food.

Bangladesh has already achieved food security. But ensuring safe and nutritious food is now a new challenge. In order to meet this challenge, the Safe Food Act, 2013 has been enacted by the Hon'ble Prime Minister's unilateral and visionary decision to ensure the right to access to safe food for the protection of life and health of the people. Along with this, Bangladesh Safe Food Authority was established on February 2, 2015 to fulfill the purpose of the Act. The main task of the authority is to ensure the right to safe food by coordinating related activities in

food production, import, processing, storage, supply, marketing and sale process through proper practice of scientific methods. The main task of the authority is to ensure the right to safe food by coordinating related activities in food production, import, processing, storage, supply, marketing and sale process through proper practice of scientific methods. The authorities have already formulated several rules and regulations to complete their activities. The safety and nutritional quality of food depends largely on the preparation of food by skilled and careful hands. Food safety is a multidimensional issue. Therefore, everyone at the family level should have an idea about how to keep food safe at every stage of food purchase, preparation, cooking, serving and storage. It is very important for everyone to have a proper understanding of various food hazards and proper knowledge of their control measures.

Every day countless people are getting sick by eating contaminated food and many of them are getting seriously ill. Some remain diseased for life and are passed down through generations. Children, the elderly, pregnant and lactating women and those who are already ill for other reasons are the most affected by food borne diseases. The signs of unsafe food are the final stages of contamination, which can be understood by changing the color, smell, and texture of the food. The reason for food being unsafe is due to chemical and enzyme structural reasons, due to external moisture, light, heat, germs, oxygen etc. infection of microorganisms like bacteria, yeast, mold and virus that help decomposition, eggs and milk etc become unfit for consumption, from which Increases the risk of developing various types of food borne diseases.

Natural and our habitual and careless causes also make food unsafe. Contamination during the production and preparation stages can also make food unsafe. Food is generally unsafe in four ways: Physical – in the presence of dust, dirt, hair, stone particles and debris, etc., Chemical – in the presence of excessive amounts of chemicals hazardous to human health, Biological – bacteria, viruses, resulting from the presence of fungi and other microbes; And allergens – due to the presence of certain substances such as gluten, lactose etc.

Perishable items such as milk, eggs, fish, meat or other frozen foods should be bought last when shopping, otherwise there is a risk of food spoilage. After buying food suitable for keeping in the refrigerator, bring it home quickly and put it in the refrigerator or freezer on an urgent basis. If the packaging says ‘keep in refrigerator’ or ‘keep in freezer’ or ‘keep in cold’, check that the food is properly frozen before buying.

Dos and Don’ts while selecting and buying food: Check production date,

expiry date or best before date when buying packaged rice, pulses, flour and flour; Buy by looking at the approved seal of BSTI. Buy packaged milk and milk products from trusted and recognized companies. Yogurt should be made at home if possible. Check the best before date when buying packaged milk and milk products. Purchase by looking at the approved seal of the Standards Institution (BSTI). Do not buy expired milk and dairy products unless the production date, expiry date and best before date are clearly stated on the packaging. Buy locally produced, fresh, seasonal, ripe fruits and vegetables. Buy fresh, green or colorful vegetables. While buying fruits, check whether the fruits are firm, fresh, perfect and clean; Buy juicy fruits as much as possible. Don't buy overripe, rotten, black-spotted, bruised or bugged fruits and vegetables. Buy clean and perfectly shelled eggs. Do not buy eggs that are discolored and dirty or have dirty shells.

Some techniques to keep food safe are to keep food dry away from moisture. Do not store food in non-food grade plastic containers. Use glass jars or jars or containers if possible; Keeping food storage areas clean with utmost importance, keeping non-food products (eg: washing-up products, washing powder, soap, detergents etc.) at a safe distance from food.

The government has already taken various steps to ensure the food security of the people. The process of capacity building of safe food authorities has already started. There are five important guidelines to keep families and communities healthy by ensuring safe food. These are: keeping food preparation areas clean, keeping raw and cooked food separate, cooking food properly, storing food at safe and appropriate temperatures, and using safe water and raw materials in food preparation. Approximate five lac people died, including more than one lac children under the age of five. What is unsafe, what is dangerous to eat - that is not food. Dishonest people have made food unsafe. So everyone should be aware. No development will be sustainable unless a safe diet of essential nutrients is ensured.

Writer: Nutritionist

পদ্মা সেতু ও রেল সড়কের দু'পাশে মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে 'সবুজ বলয়'

মোতাহার হোসেন

স্বপ্নের পদ্মা সেতু ও পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে নির্মিত রেললাইনে পরীক্ষামূলক রেল চলাচলের মধ্য দিয়ে বাঙালির বিশ্বজয়ে নতুন মাত্রা সংযোজন হচ্ছে দেশের ইতিহাসে অনন্য মাইল ফলক। আর এই অনন্য মাইল ফলকের সাথে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে এই সেতু ও রেললাইনকে ঘিরে পদ্মার দুই তীরে গড়ে ওঠা বৃক্ষরাজির মনোমুগ্ধকর ও নয়নাভিরাম 'সবুজ বলয়।'

এই সেতু ও রেল দিয়ে চলাচল করার সময় চোখে পড়বে নানা প্রজাতির গাছগাছালিতে শোভিত বৃক্ষরাজি। এই দৃশ্য দেখে মনে হবে এ যেন কোনো বৃক্ষ নয়, সবুজের অনন্য সমাহার, এসব বাহারি গাছগাছালির অনাবিল মুগ্ধতা ছাড়াছে সেতুর চারদিকে। সকালের সূর্যদ্বয়ে আর বিকেলের সূর্যাস্তের দৃশ্য মানুষকে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের অন্যজগতে নিয়ে যায়। শরীয়তপুরের জাজিরার নাওডোবায় পদ্মা সেতুর টোল প্লাজা থেকে মাদারীপুরের শিবচরের পাচ্চর পর্যন্ত সাড়ে ১০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক। এবং পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্ত শুরুতে সেতুর উভয় প্রান্তে বিস্তৃর্ণ সবুজ প্রান্তর, মাঝে ধানক্ষেত সড়কের দুই পাশে নানা জাতের ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগানো হয়েছে। আর সড়ক বিভাজকের ওপর লাগানো হয়েছে নানা জাতের ফুলের গাছ। সেখানে সারা বছরই ফুল ফোটে। শুধু ফলজ, বনজ, ঔষধি গাছ নয়, এসব স্থানে রয়েছে নানা জাতের ফুল, নানা জাতের দেশি-বিদেশি ফলের গাছ।

এই সড়কের পাশাপাশি পদ্মা সেতুর চারটি পুনর্বাসন কেন্দ্র, দুটি সার্ভিস এরিয়া, কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড ও শেখ রাসেল সেনানিবাস এলাকায় বনায়ন করেছে শরীয়তপুর বন বিভাগ। পদ্মা সেতু প্রকল্প ও এক্সপ্রেস এলাকা বনায়ন প্রকল্পের আওতায় আম, জাম, কাঁঠাল, তেঁতুল, নারিকেল, পেয়ারা, লিচু, সেগুন, জারুল, শিলকড়ই, রাজকড়ই, গামার, তেজপাতা, দারুচিনি, নিম, বহেড়া, অর্জুন, হরীতকী, বকুল, পলাশ, দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া, শিমুলসহ ৬১ ধরনের ফলদ, বনজ, ঔষধি গাছসহ বিভিন্ন ফুলের গাছ রয়েছে। সরকারের ৫টি সংস্থা পৃথক পৃথকভাবে পদ্মা সেতু ও রেললাইনের পাশে, পদ্মা নদীর তীরে নির্মিত বাঁধের পাশে প্রায় বিভিন্ন প্রজাতির ১০ লক্ষাধিক গাছ রোপণের উদ্যোগ নিয়েছে। আসন্ন বর্ষা মৌসুমে এসব সংস্থার এই উদ্যোগ শতভাগ বাস্তবায়ন করা হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বাঙালির সাহস, গর্ব, সক্ষমতা, বিশ্বে মর্যাদা বৃদ্ধির অনন্য বিস্ময়ের প্রতীক পদ্মা সেতুকে ঘিরে 'সবুজ বলয়' সৃষ্টির এই উদ্যোগ গ্রহণ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পদ্মা সেতুর টোল প্লাজা পার হওয়ার পরই চোখে পড়বে এসব ফুল-ফলের গাছ। পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজ শুরুর সময় লাগানো এসব গাছ এখন চারদিকে মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে। দেশের অন্য কোনো প্রকল্পে এত বনায়ন হয়নি। বনায়ন প্রকল্পের আওতায় দুই লক্ষাধিক বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রোপণ করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে স্থানীয় জনসাধারণকে রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এই বনায়ন প্রকল্প।

২০০৭-০৮ সালে যখন পদ্মা সেতুর জন্য জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়, তখন এ এলাকা ছিল ফসলের জমি আর লোকালয়। জমি অধিগ্রহণের পরে নিচু জায়গা বালু দিয়ে ভরাট করা হয়। তারপর সড়কসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এরপর ২০১২-১৩ সাল থেকে এসব স্থানে বনায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়। খুলনা-ঢাকা সড়কের বাসচালক মোক্তার হোসেন জানান, দেশের অনেক অঞ্চলের বিভিন্ন সড়কে গাড়ি চালিয়েছেন। পাহাড়ি অঞ্চল ছাড়া এমন সবুজে ঘেরা ও ফুলের সৌন্দর্যবর্ধিত সড়ক কোথাও পাননি তিনি। শরীয়তপুর বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, ১০ বছর ধরে নিয়মিত পরিচর্যা আর রক্ষণাবেক্ষণ করে গাছগুলো পরিপক্ব করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার রেখেছে বন বিভাগ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বনায়ন প্রকল্পটি। পদ্মা সেতু প্রকল্পের (সেতু বিভাগের) সহকারী প্রকৌশলী পার্থ সারথি বিশ্বাস বলেন, পদ্মা সেতু প্রকল্পের অর্থায়নে বনায়ন করা হয়েছে। সেতু এলাকার সব অবকাঠামো ধরে বনায়ন করা হয়। বিভিন্ন প্রজাতির সবুজ গাছে ও বাহারি ফুলে এখন এলাকাটিতে অন্য রকম মুগ্ধতা সৃষ্টি করছে। এখানে আসা মানুষ ক্ষণিকের জন্য প্রকৃতির অপার স্নিগ্ধতার পরশ পাবে। পদ্মা সেতু প্রকল্প ঘিরে আশপাশের এলাকায় সবুজায়নও এগিয়েছে সমান তালে। নদীর দুই পার ও এক্সপ্রেসওয়ের দুই পাশে রোপণ করা হয়েছে লাখো গাছের চারা। কয়েক বছরে এসব চারা বড় হয়ে সবুজের আবহ তৈরি করেছে পুরো এলাকায়।

পদ্মাপারের জনপদ ছিল অনেকটা রুক্ষ। সেখানে এখন শোভা পাচ্ছে নানা প্রকারের বনজ, ফলদ, ঔষধি আর সৌন্দর্যবর্ধক বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের গাছ। শরীয়তপুরে পদ্মা সেতু প্রকল্পের আওতায় বনায়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সংযোগ সড়কের পাচ্চর থেকে টোল প্লাজা পর্যন্ত রোপণ করা হয়েছে ৪৪ হাজার ৯৫০টি বনজ ও সৌন্দর্যবর্ধক ফুলের গাছ। এই জেলার দুটি পুনর্বাসন কেন্দ্রে রোপণ করা হয়েছে দুই লক্ষাধিক ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছ। এ ছাড়া সার্ভিস এরিয়া, কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড, শেখ রাসেল সেনানিবাসসহ প্রকল্প এলাকায় রোপণ করা হয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির আরো তিন লাখ গাছের চারা। পদ্মা সেতু প্রকল্প ও এক্সপ্রেস এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, বনায়ন প্রকল্পের আওতায় আম, জাম, কাঁঠাল, তেঁতুল, নারিকেল, পেয়ারা, লিচু, সেগুন, জারুল, শিলকড়ই, রাজকড়ই, গামার, তেজপাতা, দারুচিনি, নিম, বহেড়া, অর্জুন, হরীতকী, বকুল, পলাশ, দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া, শিমুলসহ আরো বিপুল

পরিমাণ ফলদ, বনজ, ঔষধি গাছসহ বিভিন্ন ফুলের গাছ রয়েছে। ইতোমধ্যে সার্ভিস এরিয়া ও পুনর্বাসন (আরএস) এলাকায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে কৃষ্ণচূড়া, বকুল, কাঞ্চন, সোনালু, মহুয়া, বহেড়া, অর্জুন, পলাশ, শিমুলসহ অন্তত দেড় লাখ ফলদ ও ঔষধি গাছ। পদ্মা সেতুর দক্ষিণ প্রান্তের মহাসড়কের দুই পাশজুড়েও দৃষ্টিনন্দন ফুল-ফলগাছ চোখে প্রশান্তি এনে দেয়।

'পদ্মা সেতুর সংযোগ সড়কের শরীয়তপুরের জাজিরা থেকে মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার পাচ্চর গোলচত্বর পর্যন্ত ছয় লেনের এক্সপ্রেস হাইওয়ের মাঝখানের অংশে নানা ধরনের গাছ রোপণ করা হয়েছে। 'এর মধ্যে রয়েছে পাতাবাহার, মসুন্ডা, সোনালু, বোতল ব্রাশ, এরিকা পাম্প, উইপিং দেবদারু, রঙ্গনসহ বিভিন্ন ধরনের বাহারি ফুলের ছয় হাজারসহ ৫৬ প্রজাতির প্রায় দেড় লাখ গাছ। বন বিভাগের কর্মীদের পরিচর্যা আর প্রকৃতির মহিমায় সড়কের ঢালে ফলদ ও বনজ গাছের চারাও বেড়ে উঠছে।' 'গাছ যেমন একদিকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনে। অন্যদিকে মানুষের মনের খোরাকও মেটায়। পদ্মা সেতুর সংযোগ সড়কে গেলে মনটা ভরে যায়। চোখধাঁধানো ফুলের সমারোহ। তবে রাস্তার ক্ষতি যেন না হয়, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। ছোট ছোট গাছ, ফুল ও হালকা ফলের গাছ থাকলে তেমন ক্ষতি হবে না, বরং এতে মন জুড়িয়ে যাবে।'

'পদ্মা সেতুর অ্যাপ্রোচ সড়কের আইল্যান্ডে যে গাছ লাগানো হয়েছে, তা সত্যি অসাধারণ। মহাসড়কের এই ১০ কিলোমিটার পথে চলার সময় মনে হয় না বাংলাদেশে আছি। মহাসড়কের মাঝে আইল্যান্ডে ফুলের গাছ, দুই পাশে ফলের গাছ। এমন সৌন্দর্যময় প্রকৃতি দেশে আর কোথাও চোখে পড়েনি। তবে পরিচর্যার অভাবে অনেক স্থানে গাছ মরে গেছে। 'পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ পদ্মা সেতুর দক্ষিণ শিবচর প্রান্তে বন বিভাগের মাধ্যমে গত দুই বছরে সবুজায়নের প্রকল্প হাতে নেয়। এরই অংশ হিসেবে ফুল, ফল ও ঔষধি গাছের চারা লাগানো হয়েছে। ইতোমধ্যে এটি পর্যটন এলাকায় পরিণত হয়েছে। ভ্রমণপিয়াসু দর্শনার্থীর ভিড় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

সড়ক ও জনপদ বিভাগের মাদারীপুর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, 'সড়কের মাঝে ছোট গাছ লাগালে তেমন ক্ষতি হয় না। ফুল ও চোটো ফল গাছের শাখা-প্রশাখা তেমন বাড়ে না। পদ্মা সেতুর সংযোগ সড়কের মাঝে প্রায় ১২ ফুট চওড়া জায়গা আছে, সেখানে কোন ধরনের গাছ লাগানো উচিত তা গবেষণা করেই বন বিভাগ লাগিয়েছে।' আমাদের প্রত্যাশা, পদ্মা সেতু ও রেল সংযোগকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই অপরূপ নয়নাভিরাম দৃশ্য তথা প্রকৃতির আঁধার 'সবুজ বলয়' রক্ষা ও সম্প্রসারণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। তাহলে প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার এই মহতী উদ্যোগ স্থায়ী রূপ পাবে।

লেখক : উপদেষ্টা সম্পাদক, দৈনিক ভোরের আকাশ এবং সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম।

Corruption Must Be Stopped for Social Justice

Sajal Mahmud

Bangladesh has achieved enviable success in economic progress. Not only the economy, Bangladesh's achievements in various social indicators such as infant mortality, maternal mortality, average life expectancy, etc. have been praised globally. In order to continue this trend of success, corruption and irregularities must be prevented and honesty and justice must be established at all levels of the state.

Corruption is considered as one of the main obstacles to the socio-economic progress of Bangladesh. The reality is that corruption is a crime that undermines all development. Goal number 16 of the United Nations Sustainable Development Goals is to create peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective accountable and inclusive institutions at all levels. It can be understood from this that it is not possible to build effective accountability institutions without eradicating corruption. Corruption is considered as a global problem. Because there is a prevalence of corruption in all developed, developing and underdeveloped countries. Corruption deprives people of the benefits of democracy and the rule of law. Through this, human rights are violated, market management is distorted, organized crime increases. The impact of corruption is more pronounced in developing countries. Corruption gradually cripples the economic capacity of the state. Bangladesh Anti-Corruption Commission is continuously conducting multi-dimensional activities to combat this all-encompassing crime. The Commission is carrying out its duties in an integrated manner in anti-corruption, control, prevention and development of anti-corruption social values by following the existing laws and regulations. The Commission is constantly conducting numerous preventive operations to prevent corruption before it takes place. Due to these operations it has been possible to prevent corruption in some cases before it takes place. Government assets have been recovered, numerous citizens have received their desired services without harassment, service providers have become aware. Again, as soon as the incident of corruption occurs, action is also taken to investigate the complaint. Criminals are prosecuted. They were investigated and handed over to the law. In other words, prevention, investigation,

investigation and prosecution are carried out with equal importance from the Anti-Corruption Commission. Again, the commission is arranging interaction between government officials and service-seeking people through activities like public hearings. Through this, on the one hand, local government officials have to be held accountable, and citizens are becoming aware of their rights. Overall, anti-corruption awareness is developing at the grassroots level.

Through the commission's own outreach program, the country's city, metropolis, district, upazila, and even the union level, through the anti-corruption committee, which consists of citizens with a clean image, is implementing various programs with the aim of instilling honesty and loyalty in the society. It is also annual with students of educational institutions. Conducting various cultural activities including debate competition, essay competition. These activities are being conducted from the country's villages to the capital's educational institutions. The youth will rise against corruption. It is the son who will restrain the father from corruption. In anticipation of this, the Commission on Youth is working on a long-term strategy. However, it is not yet time to say that the level of corruption has decreased as per public demand. But it may be true that public awareness against corruption has increased. It may have broken the idea that the law will not touch me. The mindset of the criminal to think himself above the law has also changed. Yet the reality is that it is difficult for the ACC as a single institution to control a multidimensional criminal offense like corruption with limited resources. It is natural that strong protests will come from every level of society to control corruption. Teachers-students, mass media, civil society, bureaucracy, politicians, professionals together with all come forward from their own position against corruption will end the ugly culture of corruption. A pure society of pure people will be built. The realization of the constitutional promise will come when the state will block all avenues to enjoy unearned income. Bangladesh will emerge in the light by cutting the darkness.

Social power can play the biggest role in preventing these few corrupt greedy people from corruption. People's intense hatred of the socially corrupt can be the most powerful weapon in controlling corruption. There is no alternative to economic development and education for the development of self-esteem of people. Many say that the beauty of education is to acquire the ability to judge what is right and what is wrong. The Anti-Corruption Commission is working relentlessly to prevent corruption as a major obstacle to economic development and education of the people. If we deeply analyze the Sustainable Development Goals

declared by the United Nations, then the essence is to educate the youth with quality education to build a sustainable future. Anti-Corruption Commission is conducting multi-dimensional activities as a small effort to inculcate moral values in the minds of young students. According to various studies, it is very difficult to change the thinking and mentality of mature people. However, to build a corruption-free society, it is essential to change the mindset of people. Anti-Corruption Commission is implementing various programs for this purpose. However, priority is being given to the youth in the implementation of these programs. Strategies have been adopted to prevent corruption by instilling moral values in their minds. As part of this strategy, debate competitions are being organized for the students of most of the secondary education institutions in the country to develop their moral values. One of ACC's objectives is to create anti-corruption social movement through the active participation of teachers-students, parents and local dignitaries through these creative programs. In 2017, the commission formed 25 government institution-based institutional teams to ensure good governance, institutional capacity building and harassment-free government services of the country's government institutions. The institutional team identifies the sources and causes of corruption, irregularities, mismanagement, public harassment in the concerned institutions and formulates clear recommendations to prevent them. The members of this institutional team prepare recommendations by discussing with various stakeholders, reviewing various documents, analyzing the existing laws and regulations of all those institutions, inspecting various activities on the ground, reviewing information received from the media and information received from intelligence sources of the commission. In 2019, the monitoring report of 08 institutional teams has been sent by the commission through the cabinet department to the concerned ministries for taking necessary measures.

Corruption is one of the main obstacles to the socio-economic progress of Bangladesh. Many of our progress is destroyed due to corruption. No country in the world has been able to completely stop corruption, but many countries have succeeded in controlling corruption.

Wrter: Teacher and Researcher

স্টেম : শিক্ষা ২০৪১-এর রূপকল্প উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণকে গতিশীল করবে

মো. রেজুয়ান খান

সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যাথমেটিকস–এ চারটি বিষয়ের আদ্যক্ষর মিলিয়ে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে স্টেম (STEM)। বিশ্বজুড়ে বর্তমানে শিক্ষার সবচেয়ে বেশি আলোচিত ধরন স্টেম এডুকেশন। যেসব দেশ স্টেম এডুকেশনের ওপর জোর দেবে তারাই ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

স্টেম এডুকেশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এবং একুশ শতকের জন্য সুশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা। স্টেম শিক্ষা মানুষের মনের সৃজনশীলতাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মানুষের মধ্যে টিম ওয়ার্ক, উন্নত যোগাযোগ, কোনো কিছু খুঁজে বের করার দক্ষতা, কোনো কিছু বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, যেকোনো সমস্যার সমাধান করা, সর্বোপরি ডিজিটাল জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলাই হচ্ছে স্টেম শিক্ষার মূল কাজ।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত স্টেম শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য অনন্যভাবে উপযুক্ত। স্টেম শিক্ষা দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেসব শিক্ষার্থী মানসম্পন্ন স্টেম শিক্ষা গ্রহণ করে, তারাই পরবর্তী প্রজন্মের উদ্ভাবক হয়ে ওঠে। স্টেম শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা শিখে, কীভাবে তাদের সময় পরিচালনা করতে হয় এবং কীভাবে বড় প্রকল্পগুলোকে ছোট ছোট ধাপে ভাগ করতে হয়। এটি এমন একটি পদ্ধতি, যা তাদের সারা জীবন উন্নতির জন্য সাহায্য করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্টেম শিক্ষায় যারা শিক্ষিত তাদের জন্য প্রতিবছর ১৭ শতাংশ হারে কাজের সুযোগ বাড়ছে। আর অন্য ডিগ্রিধারীদের জন্য কর্মসংস্থান বাড়ছে প্রায় ১০ শতাংশ হারে। মানুষের মনে নানা জিজ্ঞাসা, কৌতূহল এবং অনুসন্ধান শুরু হয় মাধ্যমিক কাল থেকেই। শুধু পশ্চিমা দেশগুলোতেই নয়, ভারত ও চীনের মতো দেশগুলোও তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় স্টেমকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দনীয় তৃতীয় শিক্ষায় সঠিক পথ বেছে নিতে পারে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান, গণিত ও প্রকৌশল ছাড়া সভ্যতা অচল। জীবন চলার পথে প্রতিটি স্তরে রয়েছে বিজ্ঞানের প্রভাব। মানবসভ্যতায় প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ একটি জাতিকে বিকশিত করে।

স্টেম শিক্ষা এক সময়কার সনাতনী নিয়মে পাঠ্যবই মুখস্থ করার প্রবণতাকে কমিয়ে এনেছে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পাঠ্যবই মুখস্থ করার প্রবণতা এখনো লক্ষ করা যায়। স্টেম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হলে এর প্রভাব অনেকটা কমে আসবে। যেমন আমাদের দেশের সব বিভাগের শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে এখনকার শিক্ষার্থীরা আগেকার সনাতনী শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আধুনিক শিক্ষার সুফল ভোগ করতে পারছে। স্টেম শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। স্টেম সৃজনশীল সমস্যাগুলোর সমাধান করে। স্টেম অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের নতুন কিছু জানার আগ্রহকে বাড়িয়ে দেয়। স্টেম শিক্ষা একজনের সঙ্গে অন্যজনের যোগাযোগ দক্ষতাকে বাড়িয়ে তোলে। শিক্ষার্থীদের মনে আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ জোগায় এবং অতিমাত্রা আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি যৌক্তিক চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে।

বাংলাদেশের শিক্ষার মান আগের তুলনায় অধিকাংশে আধুনিকায়ন হয়েছে। ইনোভেশন কর্মসূচি, শিক্ষার নতুন নতুন প্রযুক্তি, গণমাধ্যমে শিক্ষা প্রদান কর্মসূচি, ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুতকরণ এবং মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পরিচালনা এর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের স্টেম নিয়ে পড়াশোনার আগ্রহকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে এসএসসি এবং এইচএসসি উভয় স্তরের জন্য বিজ্ঞান গ্রুপে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বছরের পর বছর কমে আসছিল। কারণ হিসেবে দেখা গেল শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞান ও গণিতভীতি। সরকার গণিত বিষয়কে শিক্ষার্থীদের মাঝে আরো আকর্ষণীয় করতে আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পরিবেশ গড়ে তুলেছে। মেধাবী শিক্ষার্থীরা গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। প্রেক্ষিতে গণিত বিষয়ে ভালো গ্রেড পেতে গণিত শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীরা বেশি বেশি উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এভাবে গণিতের প্রতি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের ভীতি অনেকটা কমে এসেছে। শিক্ষার্থীদের চিন্তা-ভাবনা বিকশিত হতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর নতুন উদ্ভাবনী শিক্ষাব্যবস্থা সহায়তা করছে।

বাংলাদেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের কাছে স্টেম এডুকেশন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে ৪৩৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও ২১৬টি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে হাতে-কলমে স্টেম শিক্ষা দেয়া হয়। এ ছাড়া সরকারি বেসরকারি প্রকৌশল, ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস) প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্টেম শিক্ষাদানে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ স্টেম ফাউন্ডেশন ২০২০ সালে সারাদেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে গবেষণামূলক কনসেপ্ট ও প্রজেক্ট আহ্বান করে।

এ আহ্বানে শতাধিক টিমের মধ্যে ২৩৮টি প্রজেক্ট জমা পড়ে। ২০৩০ সালের ১৭টি গোলের মধ্যে ১৩টি গোল বা লক্ষ্যমাত্রাকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছিল ন্যাশনাল স্টেম কম্পিটিশন। শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, পয়ঃনিষ্কাশন, বিশুদ্ধ পানির অভাব, জলবায়ু সমস্যা সমাধান, শিল্পায়ন, পরিকল্পিত নগরায়ণ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে করণীয় ইত্যাদি বিষয়ক কনসেপ্ট পেপার ও প্রজেক্ট উপস্থাপন করে। বিজ্ঞানভিত্তিক আইডিয়াসহ প্রজেক্ট জমাদানকারীদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করে বিজয়ী দল বুয়েট টিম, প্রথম রানার আপ রুয়েট টিম এবং দ্বিতীয় রানার আপ অর্জন করে চুয়েট টিম। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা স্টেম প্রতিযোগিতায় সফলতার স্বাক্ষর রাখছে।

স্টেম শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলতে 'ফার্স্ট গ্লোবাল চ্যালেঞ্জ' নামের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান ২০১৭ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ আকর্ষণীয় রোবোটিক্স প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ২০১৭ সাল থেকে এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশও অংশ নিয়ে আসছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ রোবোটিক্স অলিম্পিকে সপ্তম স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এবারই অতিমারি করোনাভাইরাসের কারণে ফার্স্ট গ্লোবাল চ্যালেঞ্জ শীর্ষক প্রতিযোগিতাটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এ রোবোটিক্স প্রতিযোগিতায় এবার বাংলাদেশসহ ১৭৩টি দেশ অংশগ্রহণ করে। আনন্দের বিষয় হলো, বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রোবোটিক্সের অলিম্পিক হিসেবে খ্যাত আন্তর্জাতিক এ খেলায় ১৭৩টি দেশের নামকরা সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বাংলাদেশে স্টেম এডুকেশনকে অগ্রাধিকার বিবেচনা করা হচ্ছে। এর ফলে আগের তুলনায় এখনকার শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠছে।

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আশ্রয়ণ প্রকল্প কেন শেখ হাসিনার মেধাসম্পদ

মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

আশ্রয়ণ প্রকল্পের স্বত্বাধিকারী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি মেধাসম্পদের স্বীকৃতি পেয়েছেন। সাধারণ অর্থে মেধাকর্ম এবং মেধাসম্পদের প্রচলিত ধারণায় আমরা সৃজনশীল কর্ম হিসেবে সংগীত, সাহিত্য, শিল্পকর্ম, গান, নাটক, লিখিত বই, চলচ্চিত্র, শব্দ, রেকর্ডিং, মাল্টিমিডিয়া, সফটওয়্যার ইত্যাদি সৃজনশীল কর্মকে মেধাজাত কর্ম হিসেবে বিবেচনা করে থাকি। তাহলে সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্প কীভাবে মেধাসম্পদ এবং শেখ হাসিনা কীভাবে সেই মেধাসম্পদের অধিকারী? সংগত কারণেই এ প্রশ্নের অবতারণা স্বাভাবিক। এ প্রশ্নের উত্তর জানার আগে দেখা যাক মেধাসম্পদ কী?

মেধাসম্পদের ধারণাটি মূলত ১৬০০ শতাব্দীতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন তথা শিল্পবিপ্লবের সাথে সাথে পরিচিতি পেতে থাকে। অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে যার উপযোগিতা রয়েছে এবং চাহিদা মেটাতে সক্ষম সেটিই সম্পদ। কিন্তু মেধাসম্পদের ধারণাটি ব্যাপক এবং বিস্তৃত। সময়ের বিবর্তনে এর ধারণা ও আওতা পরিবর্তিত হতে থাকে। সাধারণ অর্থে মেধাসম্পদ হলো, এমন সব বস্তুর ওপর আইনগত অধিকার, যা বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকরণের ফলে সৃষ্ট। মূলত মানুষ তার সৃষ্টিশীলতা, বিবেক, বুদ্ধি অনুশীলন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে যে সম্পদ তৈরি করে তাই মেধাসম্পদ। এই সম্পদকে অনেকেই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বা ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি হিসেবেও আখ্যায়িত করেন।

নির্মাণের চেয়ে সৃষ্টিকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষ যা রচনা করে তাকে বলা হয় ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি বা বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ। মেধাসম্পদ বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে অস্থাবর যা অন্য একটি স্থাবর সম্পদে নিহিত থাকে। অর্থাৎ মেধাসম্পদের অধিকার ওই দ্রব্য বা কপি নয় বরং দ্রব্যসামগ্রীকে মূল্যবান সম্পদে রূপান্তরকারী উদ্ভাবনী তথ্য বা কৌশল। আমরা জানি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন বিরোধী দলে ছিলেন তখন থেকেই তিনি ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা নিরন্ন মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য নান কর্মসূচি ঘোষণা করছিলেন। তাঁর বক্তৃতা, লেখা এবং গণমাধ্যমে এসবের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর এই কল্যাণমুখী চিন্তা থেকেই উৎসারিত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি, যা দৃশ্যমান হচ্ছে ক্রমাগত। তন্মধ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প ছিল মহতী এবং নব উদ্ভাবিত কল্যাণমূলক চিন্তাজাত উদ্ভাবনী এক কর্ম।

১৯৯৭ সাল থেকে এই প্রকল্পের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় এসেছে ৫ কোটি মানুষ। শুরু থেকে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য দূরীকরণ, জীবনমানের

উন্নয়ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা। ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ২৮ লাখ মানুষ পুনর্বাসিত হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সহযোগিতায় একই মডেল অনুসরণের মাধ্যমে কমবেশি ৩৬ লাখ ৫০ হাজার মানুষ আশ্রয় পেয়েছে। আশ্রয় পাওয়ার পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহের স্বাধীনতা, নারীর কর্মসংস্থান, জমি ও ঘরের নিজস্ব মালিকানা নিশ্চিত হয়েছে। একটি ভাসমান পরিবার, একজন বিধবা, সহায়-সম্বলহীন নারীকে স্বাবলম্বী করে তোলার এই মহতী কর্ম একেবারেই শেখ হাসিনার মৌলিক চিন্তাপ্রসূত। বাস করার জন্য শুধু দুটি কক্ষই নয়, সাথে রয়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিদ্যুৎ, স্যানিটেশন সুবিধা ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা। প্রকল্পের নাম বিবেচনায় নিলে শুধু দুটি কক্ষবিশিষ্ট ঘরই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সামগ্রিকভাবে একটি পরিবারের জীবনযাপনের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টির এই উদ্ভাবন শেখ হাসিনার মেধাজাত। খুব স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, এটি আর দশটি প্রকল্পের মতো গতানুগতিক প্রকল্প নয়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি সুস্বাস্থ্য, খাদ্যনিরাপত্তা অনুকূল পরিবেশ, সুশিক্ষা, তথ্য ও সাংস্কৃতির সমুন্নত বিকাশ নিশ্চিত করা না যায়। মেধাসম্পদ এ সকল সুযোগ আর অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। আশ্রয়ণ প্রকল্পের দর্শন ব্যক্তি স্বাধীনতায় অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। সর্বশেষ রাষ্ট্রীয় সমীক্ষায় আমরা দেখছি আরো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা শতকরা ১০.৫ থেকে ৫.৬-এ নেমে এসেছে, যা মূলত আশ্রয়ণের নানামুখী উদ্যোগের কারণে। কেন কপিরাইটের আওতায় এই আশ্রয়ণ প্রকল্পের মডেল কে নিবন্ধিত করতে হলো? এ ক্ষেত্রে বলা যায়, মেধা বিকাশের স্বার্থে মেধাসম্পদ সুরক্ষা অপরিহার্য এবং মেধাসম্পদ সুরক্ষার ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বহুপক্ষীয় ও বহুমাত্রিক। যার সুবিন্যস্ত রূপরেখাই কপিরাইট আইন, ট্রেডমার্কস আইন, পেটেন্ট আইন, ট্রেডসিক্রেট আইন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন ও ভৌগোলিক নির্দেশক আইন ইত্যাদি। দেশে দেশে যার প্রকাশ এবং প্রয়োগে ভিন্নতা থাকলেও উদ্দেশ্য একই মেধাসম্পদের অধিকার নিশ্চিত করা।

মূলত কপিরাইট আইনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো যেকোনো মৌলিক সৃজনশীল কর্মের স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা করা, দ্বিতীয়ত, যেকোনো মৌলিক সৃষ্টিকর্ম ও তার প্রণেতার আইনগত সুরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তৃতীয়ত, কোনো সৃষ্টিকর্মের মূল প্রণেতার মালিকানা স্বত্ব বা সৃষ্টিকর্মের ওপর একচেটিয়া অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মৌলিক সৃষ্টিকর্ম একটি মেধাস্বত্ব বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি, এই সম্পত্তি রক্ষার জন্য কপিরাইট আইনের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশে প্রচলিত কপিরাইট আইনের বিধান অনুযায়ী মূল প্রণেতা জীবিত অবস্থায় প্রকাশিত সৃষ্টিকর্মটির কপিরাইট বা মালিকানা স্বত্ব তার মৃত্যু-পরবর্তী বছর থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

লেখকের অনুমতি ছাড়াই গল্পের বই বের করা, কোনো অনুষ্ঠানের উপস্থাপিত নাচ বা গান রেকর্ড করে বাইরে বিক্রি করা, কোনো বিখ্যাত শিল্পীর চিত্রকর্ম অনুমতি ছাড়াই বইতে ছাপানো, প্রতিষ্ঠিত কোনো ব্র্যান্ডের পণ্যের নকল বাজারজাতকরণের মাধ্যমে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীর অধিকার ক্ষুণ্ন ঘটছে অহরহ। কিন্তু কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন ছাড়া এই নকল প্রবণতার বিরুদ্ধে আইনগত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় না। অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে একটি উদ্ভাবন বা ধারণা মেধাসম্পদ, তবে যখন তা কপিরাইট বা অন্য কোনো অবয়বে নিবন্ধিত হয় তখন তা মেধাসম্পদ অধিকার। উদাহরণস্বরূপ একটি মৌলিক গ্রন্থ মেধাকর্ম আর কপিরাইট হচ্ছে মেধাসম্পদের রচয়িতার আইনগত অধিকার। এখানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মডেল বা কর্মসূচি শেখ হাসিনার মেধাসম্পদ এবং যখন তা মেধাসম্পদ আইনের আওতায় নিবন্ধিত হলো, তখন এটি তাঁর আইনগত অধিকার।

কপিরাইটভুক্ত সম্পদটির মালিক এটিকে আইনের আওতায় নিজে ব্যবহার করতে পারবেন একই সাথে অন্যকেও ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সম্পদের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় সম্পদটির মালিক যেভাবে ইচ্ছা তার সম্পদটি ব্যবহার করতে পারেন, অন্য কেউ সম্পদের স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত তা ব্যবহার করতে পারেন না। কপিরাইট অফিস থেকে নিবন্ধিত হওয়ার পর শেখ হাসিনা এখন আশ্রয়ণ প্রকল্পের স্বত্বাধিকারী। এটি সৃজনশীল কর্মের প্রণেতার বা স্বত্বাধিকারীর সৃজনশীল কর্মের স্বত্বের অংশ। বাংলাদেশ বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার সদস্য হওয়ায় কপিরাইট সনদ বিশ্বের যেকোনো দেশে উক্ত দেশের প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও নৈতিক অধিকার সংরক্ষণ করে। মেধাবী মানুষের মেধাজাত এ সকল কর্ম আইনসম্মতভাবে প্রাপ্ত অধিকারসমূহ ভোগ এ অধিকার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এই কারণে বিদেশি বই-পুস্তক দেশে পুনঃপ্রদর্শন, পুনঃমুদ্রণ পুনরুৎপাদন, চলচ্চিত্র ও ভিডিও ফিল্মের পুনঃপ্রচার, পুনঃপ্রদর্শন, কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার ব্যবহার, হস্তান্তর ইত্যাদি কার্যাবলি কপিরাইট আইনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই অধিকার যদি অন্য কেউ অবৈধভাবে ভোগ করে, তাহলে কপিরাইট আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন মডেল এখন দেশ-বিদেশে বহুল আলোচিত এবং প্রশংসিত। এমনকি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব কয়েকটি দেশে অনুসরণের জন্য সক্রিয়ভাবে বিবেচিত হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আশ্রয়ণ প্রকল্পের মডেল অনুসরণে যেকোনো দেশের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদন প্রয়োজন হবে। সে বিবেচনায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে মেধাসম্পদের এহেন স্বীকৃতি হবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ব্যতিক্রমী মাইলফলক।

লেখক : সাবেক পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

Nutrition Improvement with Zinc-Rich Rice in Bangladesh

A H M Masum Billah

Rice is the primary grain in Bangladesh and the country has achieved food self-sufficiency as a result of favorable agricultural policies and incentives provided by the government. Through the development of rice varieties that are enriched with vitamins and minerals, the government is working to improve nutrition for all citizens, particularly for the poor. The government fully supports agricultural research, allowing rice scientists to develop rice varieties that are rich in vitamins and minerals. To celebrate the Golden Jubilee of Bangladesh's Independence and to mark the Mujibujib Centenary, scientists at the Bangladesh Rice Research Institute have released a high-grade zinc-enriched variety, namely, BRRI-100 variety. With this new variety, there are now six varieties of rice that are zinc-rich.

After independence, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman called for a green revolution to increase food production in the country. It was in response to his call that scientists at the Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) invented the BR3 or Biplab rice variety. The discovery of this variety of rice brought about a real revolution in the country's food production. Later, Bangabandhu nationalized BRRI and institutionalized rice research in the country by passing an act in 1973 in the parliament.

The government of Prime Minister Sheikh Hasina, the privileged daughter of the Father of the Nation, is making outstanding contributions to ensuring the food security of the growing population of this country along the path indicated by Bangabandhu. Bangladesh now ranks third in the world in rice production. Bangladesh has achieved this success despite facing various hostile environments caused by a growing population, diminishing agricultural land and natural resources and the impacts of climate change. In addition to excellence in rice production, it has also achieved third place in vegetable production, and seventh place in potato production. Clearly, this is an outstanding achievement in the history of our nation.

According to the USAID Nutrition Database, per 100 grams of rice we get approximately 129 kcal of energy, 78.09 grams of carbohydrates, 7.12 grams of protein, 0.28 grams of fat, 1.30 grams of fiber, 0.07 milligrams of thiamine, 0.015 milligrams riboflavin, 1.09 milligrams of zinc, 28 milligrams of calcium, 0.80 milligrams Iron, 25 milligrams magnesium and other essential nutrients.

Since zinc is very necessary for the human body, rice researchers in the country have focused on developing rice varieties with high zinc content. Zinc acts as an antioxidant in the body to increase immunity, body growth and immunity. It can also prevent hair loss and boost appetite. Doctors say zinc deficiencies can cause diarrhea and allergies. Zinc is required in the human body for bone formation, wound healing, etc. Therefore, during the corona epidemic, doctors advised people suffering from Covid-19 to consume zinc tablets.

Zinc needs in the country can be met by newly developed variety BRRI-100 rice. It is estimated that 44 percent of children and 57 percent of adult women in Bangladesh suffer from zinc deficiency diseases. Adolescents of growing age are more likely to be deficient in zinc. The daily zinc requirement for adults is 8-12 mg, whereas the requirement for children is 3-5 mg. So, it is possible to meet the body's zinc requirements to a large extent by eating zinc-rich BRRI-100 rice, as this variety contains more zinc than other varieties. Having 25.7 mg of zinc per 100 kg, this can meet a large part of the human body's zinc requirements.

The rice of this modern high-yielding variety is thin and crisp. Yields can reach 6.9-8.8 tons per hectare with this variety. Disease and insect attack on BRRI-100 is much less than on conventional varieties. Meanwhile, zinc-rich rice has been given incentives to encourage its cultivation in the country. It has been announced by the Bangladesh Agricultural Bank that farmers can get a collateral-free loan if they grow nutritious rice that contains zinc in their fields.

There is a possibility of cultivating this type of rice in almost all parts of Bangladesh, according to agricultural researchers. Zinc-rich high-yielding rice varieties have already become popular in different parts of the country. Due to its economic efficiency and high nutritional value, it is a very popular food among farmers and consumers alike. Currently, one-fourth of the country's zinc-rich rice comes from the south.

To ensure food security and nutrition, we should be aware of what we eat. It is necessary to develop a long-term plan in order to accomplish this. The public should be made aware of the benefits of eating rice that contains zinc and other nutrients. It should be ensured that zinc-rich varieties are rapidly expanded among farmers. In conjunction with the relevant government authorities, civil society should come forward. To get these rice seeds to every corner of the country, public-private and commercial initiatives need to be taken. Media outlets in the country should participate actively in creating public opinion on this issue along with the government and private institutions. It is only then that Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's vision of improving the nutritional level of the people can be realized.

Writer: Deputy Principal Information Officer, PID

খাদ্য নিরাপত্তা : বাংলাদেশের প্রস্তুতি

কামাল হোসেন

চালের দাম হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা আর সমালোচনা হাত ধরাধরি করে চলে। একটি পক্ষ মনে করে, যে করেই হোক চালের দাম কম হতে হবে। আর একটি পক্ষ মনে করে, সব কিছুর দাম বাড়লে চালের দামও বাড়া উচিত। প্রথম পক্ষের যুক্তি, চাল এ দেশের মানুষের প্রধান খাবার। প্রয়োজনে প্রণোদনা দিয়ে হলেও তা ভোক্তার কাছে কম দামে পৌঁছে দিতে হবে। দ্বিতীয় পক্ষের যুক্তি, কৃষক যদি ধান চাষাবাদের মাধ্যমে লাভবান না হন তাহলে কৃষক চাষাবাদ কমিয়ে বিকল্প চাষাবাদে ঝুঁকবেন। ফলে ধানের উৎপাদন কমে যাবে আমাদের দেশের চাল আমদানি বা পরনির্ভরতা বাড়বে। দুই পক্ষের যুক্তিগুলোকে সমন্বয় করে সরকার পরিকল্পনা সাজায় কীভাবে কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা যায়, আবার ভোক্তাকেও স্বস্তি দেওয়া যায়।

সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে দেশের বাজারেও চালের মূল্য প্রতিনিয়ত বেড়েছে। কারণ হিসেবে বিশ্লেষকরা বলছেন, পৃথিবীজুড়ে জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব ও যুদ্ধাবস্থায় উৎপাদন কমে যাওয়া ও সরবরাহ চেইন সঠিকভাবে কাজ না করা। এ অবস্থায় সকলের মাঝে ভীতি কাজ করছে। চাল উৎপাদনকারী দেশ দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে কোনো কোনো দেশ আবার অতিরিক্ত মজুদের পথে হাঁটছে। ফলে নিত্য ভোগ্যপণ্যের বাজারে অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি বিশ্ব অর্থনীতির সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছে জাতিসংঘ। আন্তর্জাতিক সংস্থাটি বলছে, বিশ্ব 'মন্দার দ্বারপ্রান্তে'। এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলো মন্দার ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সংস্থা (আংকটাড) এক প্রতিবেদনে বলেছে, উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি, সুদের হার বাড়ানোসহ নানা কারণ বিশ্বকে একটি বৈশ্বিক মন্দা ও স্থবিরতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। এর আগে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংক কয়েক মাস ধরেই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কা প্রকাশ করে আসছে। সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সর্বশেষ সংবাদ সম্মেলনেও গুরুত্ব পেয়েছে এ প্রসঙ্গ। তিনিও এ বিষয়ে দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে বলেছেন।

খাদ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, দুই বছরের করোনা মহামারির পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জের ধরেই বিশ্বে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর প্রভাবে বাংলাদেশের সামনে কয়েকটি বিষয় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আসবে। আর তাই মন্দা মোকাবিলায় খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকির মাত্রা ভয়ানকভাবে বেড়ে

গেছে। এ কারণে বিশ্বব্যাপী অভুক্ত মানুষের সংখ্যা বেড়ছে। একই সঙ্গে আগামী দুই বছর বিশ্বের প্রায় সব দেশে দারিদ্র্যের সংখ্যাও বেড়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। খাদ্য দুষ্পাপ্য হওয়ায় অপুষ্টিজনিত রোগব্যাধি যেমন বাড়বে, তেমনি মানুষের মধ্যে পুষ্টিহীনতাও বাড়বে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা খাদ্য নিরাপত্তার বড় ঝুঁকিতে পড়েছে। তবে এই ঝুঁকিতে বাংলাদেশ নেই। কিন্তু বাংলাদেশসহ অনেক দেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত 'হালনাগাদ খাদ্য নিরাপত্তা সূচক' প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে সংস্থাটি। এতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোন দেশ কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, সেগুলোও তুলে ধরেছে। ঝুঁকির মুখে থাকা দেশগুলো যাতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে পারে সেজন্য তারা কিছু সুপারিশও করেছে প্রতিবেদনে।

ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও গম আমদানিতে সংকটে পড়ে। এরই মধ্যে গত মে মাসে বাংলাদেশ গমের সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী দেশ ভারত রফতানি বন্ধ করে দিলে সংকট আরো ঘনীভূত হয়। এমন পরিস্থিতিতে জিটুজি পদ্ধতিতে রাশিয়া থেকে পাঁচ লাখ টন গম আমদানির সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বন্দরে ইতোমধ্যে প্রথম চালানের ৫০ হাজার টন গম এসে পৌঁছেছে। পর্যায়ক্রমে দেশে অবশিষ্ট গম পৌঁছাবে। এছাড়া ভিয়েতনাম থেকে ২ লাখ ৩০ হাজার টন চাল, মিয়ানমার থেকে ২ লাখ টন চাল এবং ভারত থেকে এক লাখ টন চাল কেনা হচ্ছে। ভিয়েতনাম, ভারত ও রাশিয়া থেকে চাল আমদানিতে ইতোমধ্যে ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন দিয়েছে। ইতোমধ্যে এলসি খোলা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, আমদানি করা চালও সময়মতো দেশে চলে আসবে। এই গম ও চাল কিন্তু আমাদের এখনই প্রয়োজন হচ্ছে না। আগাম সতর্কতা হিসেবেই এটা সংগ্রহ করে মজুদ শক্তিশালী করা হচ্ছে।

বিগত বোরো মৌসুমে ১১ লাখ ২১ হাজার ৯১০ টন সিদ্ধ চাল এবং ৫৫ হাজার ২০৮ টন আতপ চাল সংগ্রহ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি। তবে ধান কেনায় সরকার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। ৬ লাখ টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও কেনা হয়েছে ২ লাখ ৬৮ হাজার ২৪৮ টন। তবে এতে কৃষকের লাভ হয়েছে। বাজারে ধানের মূল্য বেশি হওয়ায় সরকারি পর্যায়ে ধান সংগ্রহ কম হলেও সরকারের একটি উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। সেটা হচ্ছে কৃষকের ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি। সরকার ধানের দাম নির্ধারণ করে এবং বাজারে ক্রেতা হিসেবে থাকায় ফড়িয়া শ্রেণি কৃষককে ঠকাতে পারেনি। তা ছাড়া সরকারি খাদ্য গুদামে মজুদের পরিমাণও অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর বেশি আছে। আগস্টের শুরুতে মোট মজুদের পরিমাণ ছিল প্রায় কুড়ি লাখ মেট্রিক টন।

দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিরাপদ খাদ্য ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার

নানা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিপালন করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষিজমি কমে যাওয়ায় সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে সারের একাধিকবার মূল্য হ্রাসে করেছে। একই সঙ্গে কৃষিঋণ বিতরণ, গবেষণায় অগ্রাধিকার ও প্রণোদনা দেওয়ার ফলে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পথে দেশ। জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা, ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক কারণে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে ষষ্ঠ স্থানে। তাপমাত্রা ও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে দেশে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদির কারণে শুধু কৃষিই নয়, মানুষের চিরচেনা স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহই আজ ব্যাহত। এ দেশের দেশের ৪০ শতাংশ লোক কৃষির সঙ্গে সরাসরি জড়িত। তাই সমস্যার সরাসরি ভুক্তভোগীর সংখ্যাও এখানে বেশি।

ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পরাশক্তিগুলোর নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞাকেই কারণে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকরি মুখে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশের মানুষকে প্রতি ইঞ্চি জমিতে শস্য আবাদের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সামনে আরো কঠিন সময় আসতে পারে জানিয়ে তিনি জনগণকে মিতব্যয়ী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সাথে আশ্বস্ত করে বলেছেন, বাংলাদেশের এই মুহূর্তে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও ভালো যা দিয়ে পাঁচ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে। মানুষের কষ্ট লাঘবে যা করা দরকার তার সব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত খাদ্য আমদানি করার নির্দেশও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

করোনার অভিঘাতের পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বে খাবার ও জ্বালানির দাম বেড়েছে। বাড়তি মূল্যস্ফীতির কারণে অনেক দেশই হিমশিম খাচ্ছে। ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিলাসী পণ্য আমদানি কমানোর পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদনও কমাতে হয়েছে বাংলাদেশ সরকারকে। এই সংকটের মধ্যে নিত্যপণ্যের দাম যেন আরো বেশি অস্থির না হয়, সে জন্যই খাদ্য মজুদ ঠিক রাখার ওপর জোর দিচ্ছে সরকার। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবে কাঁচাবাজারে প্রায় সব ধরনের সবজি, চালসহ বেশির ভাগ নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে। চালের দাম বৃদ্ধির জন্য আমাদের দেশে খুচরা বিক্রেতারা পাইকারদের দোষ দেন। আর পাইকারি বিক্রেতেরা মিলারদের দোষারোপ করেন। চালের বাজারে কারসাজি রোধে মিলগেট ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের দৈনিক দাম ঘোষণার জন্য ওয়েবসাইট তৈরির জন্য বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোনো স্থানে কে কত দামে চাল ক্রয় বিক্রয় করছেন তা সহজেই জানা যাবে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, সারা বিশ্বে চাল ও গমের মূল্য ইচ্ছা করলে যেকোনো প্রান্তে বসে তা জানার সুযোগ আছে। কিন্তু আমাদের দেশের চাল ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্যের সঠিক তথ্য গোপন করা হয়। উদ্দেশ্য থাকে অতি মুনাফা লাভ।

পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের (পিএফডিএস) আওতায় খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। খাদ্যশস্যের বাজারমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রবণতা রোধ করে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে মূল্য সহায়তা দেওয়া এবং বাজারদর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ওএমএস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। চালের বাজার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একযোগে ওএমএস এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে মাসে ১০ কেজি করে চাল দেওয়া হচ্ছে। ওএমএস কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মোট ৪ হাজার টনের বেশি চাল বিক্রি করা হচ্ছে।

১ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের বিভিন্ন শহরে একযোগে ২৩৭৩টি ডিলারের মাধ্যমে ওএমএসের কার্যক্রম চলছে। প্রতি ডিলার দিনে দুই টন করে চাল বরাদ্দ পাবেন। একজন ডিলার দিনে ৪০০ পরিবারের কাছে এই চাল বিক্রি করবেন। এতে দিনে মোট ১৬ লাখ ১০ হাজার ৪০০ পরিবার ৩০ টাকা কেজি দরে ৫ কেজি করে চাল কিনতে পারছেন এই কর্মসূচির মাধ্যমে। এই কর্মসূচির আওতায় দিনে মোট ৪ হাজার ৭৬৫ মেট্রিক টন চাল খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় সারা দেশে মোট ৫০ লাখ পরিবার সুবিধা পাচ্ছে। দেশের ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। ১৫ টাকা কেজি দরে তারা এই চাল সংগ্রহ করতে পারছে। এই কর্মসূচির আওতায় এক পরিবার মাসে ৩০ কেজি করে চাল সংগ্রহ করতে পারবে। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় বছরের কর্মাভাবকালীন ৫ মাস (মার্চ-এপ্রিল, সেপ্টেম্বর-নবেম্বর) পরিবার প্রতি ১৫ টাকা কেজি দরে মাসে ৩০ কেজি করে চাল দেওয়া হয়। অন্যদিকে ওএমএস কর্মসূচির আওতায় যে কেউ ডিলারের কাছ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে সর্বোচ্চ ৫ কেজি চাল কিনতে পারে।

সরকারের এই কর্মসূচির দৃশ্যমান প্রভাব পড়েছে চালের বাজারে। তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে অযৌক্তিকভাবে বাড়ানো চালের দাম নিয়ন্ত্রণে যেমন এসেছে যেমন, তেমনি স্বস্তিতে আছে স্বল্প আয়ের মানুষ। এ ছাড়া বাজারে ঊর্ধ্বগতির লাগাম টানতে আমদানি শুল্ক উঠিয়ে দিয়েছে সরকার। চাল আমদানিতে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। ফলে বাজারে চালের দাম কমতির দিকে। সব মিলিয়ে বৈশ্বিক খাদ্য সংকট মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতি বেশ ভালো এতে সন্দেহ নেই।

লেখক : জনসংযোগ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের একমাত্র উপায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

রেজাউল করিম সিদ্দিকী

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদি এমন কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেই, যা এই ভূখণ্ডে হয় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানই একটি দুর্যোগপ্রবণ এলাকায়। কর্কট ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থান হওয়ায় এখানকার আবহাওয়া কিছুটা চরম ভাবাপন্ন। ফলে ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডো এখানে বেশি হয়ে থাকে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলবর্তী জেলাগুলোতে স্থলভাগের আকৃতি অনেকটা উল্টানো ফানেল আকৃতির হওয়ায় বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী জেলাগুলোর ওপর দিয়ে অগ্রসর হয়। ফলে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় এ অঞ্চলে বেশি হয়ে থাকে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে এ দেশের মানুষ প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই পরিচিত এবং অনেকটা গা সওয়া হওয়া হয়ে গেছে। এসব দুর্যোগ মোকাবিলা করতে মানুষ অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং এতে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে এতদঞ্চলের মানুষের অ্যাডাপটেশনের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে।

সম্ভাব্য ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ করে রাজধানী ঢাকার জন্য ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক তুরস্ক-সিরিয়া সীমান্তের ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং তাতে বিপুল প্রাণহানি এ দেশের জন্য বড় সতর্কবার্তা হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিশেষ করে ভারী অবকাঠামো, অতীতের অপরিকল্পিত উন্নয়ন ও দুর্বল অবকাঠামো এই ভাবনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

দেশের রাজধানী ঢাকা বিশ্বের অন্যতম একটি জনবহুল শহর। এখানে দুই কোটির বেশি লোকের বসবাস। দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক। রাজধানী ঢাকার সুরক্ষা ও ঝুঁকি সর্বাগ্রে বিবেচ্য। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে এখানে বহুতল ভবন নির্মিত হয়েছে প্রচুর। এসব ভারী অবকাঠামো রাজধানীতে ভূমিকম্প দুর্যোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছে। সেই সাথে অতীতের গড়ে ওঠা দুর্বল অবকাঠামো এবং অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ শহরের ভূমিকম্প দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি আরো বৃদ্ধি করেছে। দেশের অন্য বড় শহরগুলোরও প্রায় একই অবস্থা।

ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে টেকটোনিক প্লেটের সঞ্চালনের ফলে ভূমিকম্প হয়ে থাকে। এই টেকটোনিক প্লেটের সঞ্চালন একাধিক প্লেটের সংযোগস্থলে তীব্র মাত্রার ভূমিকম্প

সৃষ্টি করতে পার। টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলকে বলা হয় টেকটোনিক ফল্ট। এ ছাড়া টেকটোনিক প্লেটের বিভিন্ন স্থানে ফাটল থাকলে তাকে সাব ফল্ট বলা হয়ে থাকে। টেকটোনিক ফল্টে বড় মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কা থাকলেও সাব ফল্টে বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা কম থাকে। বাংলাদেশ ইউরেশিয়ান টেকটোনিক প্লেট, ইন্ডিয়ান প্লেট এবং বার্মিজ সাব প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এসব প্লেটের সংযোগস্থল দেশের উত্তর-পূর্ব, পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের ভূগর্ভে অবস্থিত। এ কারণে সিলেট এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা থাকলেও দেশের মধ্যাঞ্চল বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা একেবারেই কম। মধুপুর এবং ডাউকি ফল্টের কারণে দেশের মধ্যাঞ্চলে মৃদু বা মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পের কিছুটা আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু এ দুটি ফল্ট সাব ফল্ট হওয়ার কারণে এখানে বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা অনেক কম। উল্লেখ্য, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল থেকে ২০০ কিলোমিটারের বাইরে তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পায় এবং ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা অনেকটাই কমে আসে। বড় ধরনের ভূমিকম্পের সম্ভাব্য অঞ্চল রাজধানী ঢাকা থেকে এই দূরত্বের বাইরে হওয়ায় ভূমিকম্পের প্রত্যক্ষ ক্ষয়ক্ষতি থেকে রাজধানী ঢাকা অনেকটাই নিরাপদ অবস্থানে রয়েছে।

কিন্তু আশঙ্কার জায়গা ভিন্ন। অপরিকল্পিত অবকাঠামো, অপর্যাপ্ত রাস্তাঘাট, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের বিন্যাস শহরকে ভূমিকম্প দুর্যোগের জন্য অতিমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। রাজধানী ঢাকায় ভূমিকম্পে প্রত্যক্ষ ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে পরোক্ষ ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা অতিমাত্রায় বেশি। এখানে ভবনধসে যত প্রাণহানি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাণহানির আশঙ্কা বিদ্যমান ভূমিকম্পজনিত অগ্নিকাণ্ডের কারণে। এ ছাড়া অপর্যাপ্ত রাস্তাঘাটের ফলে সম্ভাব্য দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রম ব্যাহত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সবচেয়ে বেশি মাত্রায় প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে উদ্ধার কার্যক্রম বিলম্বিত হওয়ার কারণে। কিন্তু রাজধানী ঢাকায় কতসংখ্যক ভবন ভূমিকম্প দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ তার সঠিক কোনো হিসাব সরকারি কিংবা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কাছে নেই এবং এসংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ কোনো সমীক্ষা বা গবেষণাও পরিচালিত হয়নি। সীমিত আকারে যেসব সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে তার ভিত্তিতে সঠিকভাবে বলা যাবে না যে প্রকৃতপক্ষে কতটি ভবন ঝুঁকিপূর্ণ। ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের সংখ্যা নিরূপণ ও চিহ্নিত করতে হলে শহরের প্রতিটি ভবন পৃথকভাবে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কাজটি যথেষ্ট ব্যয়বহুল, সময়সাপেক্ষ এবং অত্যন্ত জটিল। কিন্তু দেশের, বিশেষ করে নগরবাসীর জীবনের নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে যত ব্যয়বহুল, সময়সাপেক্ষ এবং যত জটিলই হোক না কেন, অতি শীঘ্রই তা করা উচিত।

আশার কথা হলো, ভূমিকম্প দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকার যথেষ্ট প্রো-অ্যাকটিভ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড হালনাগাদ করা হয়েছে এবং তা যথাযথ বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজধানী ঢাকার

সমন্বিত ও পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা ড্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্থায়ী আদেশাবলিসহ সকল জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় ভূমিকম্প দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। রাজধানী ঢাকার ভূমিকম্প দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক ও জাইকার অর্থায়নে আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ভূমিকম্প সহনীয় অবকাঠামো নির্মাণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে Bangladesh Structural Risk and Resilience Institute সংক্ষেপে BSRRI নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভূমিকম্প এমন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যার সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া এখন পর্যন্ত সম্ভব নয়। ভূমিকম্প দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার একমাত্র উপায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সম্ভাব্য দুর্যোগ সম্পর্কে প্রস্তুতি। এ জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি প্রয়োজন সর্বস্তরে সচেতনতা।

লেখক : জনসংযোগ কর্মকর্তা, গৃহায়ণ ও পূর্ত মন্ত্রণালয়

দারিদ্র্যমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়নে প্রযুক্তি

ইমদাদ ইসলাম

মার্টিন কুপার ১৯৭৩ সালের ৩ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে মানুষের মাঝে হইচই ফেলে দেন। তিনি ৯ ইঞ্চি লম্বা এবং ১.১ কিলোগ্রাম ওজনের একটি মোবাইল ফোনসেট তৈরি করে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দেন। মার্টিন কুপার ছিলেন মটোরোলা কোম্পানির একজন গবেষক। সে সময় তাঁর এ আবিষ্কারকে বিবেচনা করা হতো প্রযুক্তির উৎকর্ষতার চূড়ান্ত রূপ হিসেবে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে এটি কোনো উল্লেখ করার মতো প্রযুক্তি নয়। এটা ইতিহাস, বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে বর্তমান প্রজন্মের কাছে এর আর্থিক, ব্যবহারিক ও সামাজিক কোনো মূল্য নেই। অথচ একটি প্রজন্মের কাছে এ মোবাইলটি ছিল কত গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি আদিম সভ্যতার প্রেক্ষাপটে আদিম মানুষরা যে লোহার হাতুড়ি এবং গাছের পাতা ও ছালবাকল ব্যবহার করত এগুলোও ছিল তাদের জন্য প্রযুক্তি। সময়ের পরিক্রমায় এগুলো আমাদের কাছে কোনো অর্থ বহন করে না; কিন্তু কোনো একটি প্রজন্মের কাছে এটাই ছিল ইনোভেশন। সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে, চাহিদারও পরিবর্তন হচ্ছে, পেশাগত দক্ষতার প্রয়োজনীয়তারও পরিবর্তন হচ্ছে। ভবিষ্যতের বিষয়গুলো আমাদের বর্তমানের ওপর দাঁড়িয়েই ভাবতে হবে। মনে রাখা দরকার, অগ্রজ প্রজন্ম পথ তৈরি করে দিচ্ছে বলেই নতুন প্রজন্ম সেই মসৃণ পথে হাঁটতে পারছে।

প্রযুক্তি সব সময়ই পরিবর্তনশীল। এটি শুধু পরিবর্তনশীলই নয়, প্রগতিশীলও। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি বদলে যাচ্ছে এবং নতুনভাবে বিকশিত হচ্ছে। প্রযুক্তি আসলে কী? প্রযুক্তি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ, যার মাধ্যমে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে আরো সহজ, দ্রুত ও মসৃণ করে তোলার লক্ষ্যে ব্যবহার করে থাকে। টেকনোলজি শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক শব্দ 'টেকনো', যা শিল্প ও নৈপুণ্যে সঙ্গে সম্পর্কিত এবং 'লগিয়া', যা অধ্যয়নের সঙ্গে যুক্ত। এ দুই শব্দের মাধ্যমেই হয়েছে 'টেকনোলজি', যার অর্থ মনে করা হতো পদ্ধতিগত চিকিৎসা। বিগত দুই শতাব্দীতে প্রযুক্তি শব্দটি নানাভাবে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বদলেছে। বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ফলে আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তির দেখা পাচ্ছি। আর এসব প্রযুক্তি মানবকল্যাণে ব্যবহার করে মানুষের জীবনমানকে আরো উন্নত করেছে, জীবনযাত্রাকে দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলেছে। গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের মধ্যে প্রযুক্তি কেবল শিল্পের উন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার পরিবর্তে যন্তপাতি, সরঞ্জাম, অস্ত্র, যোগাযোগ ও পরিবহন যন্তগুলোকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রযুক্তি মানুষকে বিপদমুক্ত করছে। নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন নিশ্চিত করছে। বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি ব্যবহারের কিছু সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। সুবিধাগুলো সবই মানবকল্যাণে ব্যবহার করা হয়। আর অসুবিধাগুলোর

বেশির ভাগই মানবসৃষ্ট। অসৎ উদ্দেশ্যে এগুলো ব্যবহার করা হয়। প্রযুক্তি মানুষকে তথ্যের সহজ অ্যাক্সেস দিয়েছে। এ ছাড়া প্রযুক্তি ব্যবহার সময়সাশ্রয়ী, কম খরচ, সহজ যোগাযোগব্যবস্থা এবং গতিশীলতা নিশ্চিত করেছে। স্মার্ট প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা আমাদের চিরায়ত সংস্কৃতিকে হারাতে বসেছি। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি কোনো নীতি-নৈতিকতা দিয়ে চলে না। এটা চলে গাণিতিক নিয়মে। ফলে আমাদের সমাজের দীর্ঘদিনের সামাজিক মূল্যবোধের এখানে কোনো গুরুত্ব নেই, এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলো ব্যবসা। আমাদের অজান্তেই ঘটে গেছে এক ভয়াবহ ঘটনা। আর তা হলো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সমাজের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটছে খুব দ্রুত। আমরা এখন এক মুহূর্তও প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া কোনো কিছু চিন্তা করতে পারি না। আমরা নিজেদের অজান্তেই প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়েছি। আজকে জন্ম নেওয়া শিশুটি তার আগের প্রজন্মে জন্ম নেওয়া শিশুর থেকে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা এবং সম্ভাবনা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

এখন আমরা জানার চেষ্টা করব দারিদ্র্য কী? যখন মানুষ তার মৌলিক চাহিদা বা অপরিহার্য বস্তুগত চাহিদা পূরণ করতে পারে না, অর্থাৎ মানুষ যখন তার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো ন্যূনতম চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয় সে রকম পরিস্থিতিকে দারিদ্র্য হিসেবে গণ্য করা হয়। দেশ স্বাধীনের সময়, অর্থাৎ '৭২ সালে মোট জনসংখ্যার ৮২ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত। ২০০৫ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০ শতাংশ। আর এখন দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ১০.৫ শতাংশ। ১৯৯০ সালের পর থেকে বিশ্বে চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশি কমেছে। ইতিপূর্বে এত কম সময়ে এত বেশি মানুষ আর কখনো দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। দারিদ্র্য নিরসনে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। বিশেষ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে সচেতন এবং শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারলে খুব সহজেই দারিদ্র্য নিরসন করা সম্ভব। তাই বর্তমান সরকার সমাজের অন্যান্য সব শ্রেণিসহ নারীশিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। নারী উন্নয়ন বিশেষত নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করছে। সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন ও কর্মবান্ধব পরিবেশ আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে। তবে এখনো আমরা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারিনি। এ সমাজের সব মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আমাদের নারীদের অবস্থান প্রশংসিত। একজন অযোগ্য মানুষ সে যত সুযোগসন্ধানীই হোক না কেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে না পারে তাহলে তার অযোগ্যতা ও অদক্ষতা প্রকাশ পাবেই। আমরা এখন গ্লোবাল ভিলেজে বাস করি। বিশ্বে কোনো দেশ কীভাবে তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা কিন্তু আমরা খুব সহজেই জানতে পারছি এই প্রযুক্তির উৎকর্ষতার কারণে।

বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনার দেশ। এ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর সম্ভাবনাময় মানুষকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে আগামীর চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। এক সময় মনে করা হতো যারা প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা এলিট সমাজের মানুষ। এ ধারণা এখন ভেঙে গেছে। প্রযুক্তি সবার জন্য এটা এখন স্বীকৃত। প্রযুক্তি ছাড়া কোনো কিছুই সামনের দিকে এগোবে না। করোনা অতিমারি আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমরা প্রযুক্তির আশীর্বাদকে দেখেছি। প্রযুক্তির কল্যাণে ঘরে বসেই সব কাজ করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের নারীরা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে এফ কমার্স ও ফ্রিল্যান্সিং নিজেদের অবস্থান করে নিয়েছে। আগের তুলনায় কয়েক বছরে প্রযুক্তি বিষয়ে পড়াশোনায় নারীদের অংশগ্রহণ কমবেশি ১০ শতাংশ বেড়েছে। প্রায় ১২ শতাংশের মতো নারী প্রযুক্তিকে পেশা হিসেবে নিয়েছে। এখন প্রযুক্তিকে সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে এর সুফল সমাজের সব মানুষ নিতে পারে। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ বিশেষ করে নারীদের প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ দিতে হবে। আমাদের সমাজের নারীরা পারিবারিক বৈষম্যের শিকার। পরিবারের ছেলেকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়। আর মেয়েকে পড়াশোনার জন্য সামান্য একটা ল্যাপটপ বা মোবাইল ফোনসেটও কিনে দিতে অনীহা দেখা যায়। আমরা বুঝতে চাই না যে একটি ল্যাপটপ বা একটি স্মার্টফোন এক ধরনের বিনিয়োগ।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যত প্রযুক্তি এসেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বিস্তৃত হয়েছে মোবাইল ফিন্যানশিয়াল সার্ভিস। এর কারণ হচ্ছে আর্থিক প্রয়োজন। এটি মানুষকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সাহায্য করে। এটি আর্থিক স্বাধীনতা দেয়, যা নারীদের জন্য ভীষণ প্রাসঙ্গিক। প্রযুক্তিতে মেয়েদের একটু সুযোগ দিলেই তারা পরিবারের জন্য অনেক কিছু করতে পারে। নারীর জন্য নিরাপদ প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি পরিবারেই প্রযুক্তি বৈষম্য দূর করে নারীর জন্য প্রযুক্তিবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে অন্তর্ভুক্তমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারলে খুব সহজেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তৈরি করা সম্ভব হবে। আর এর মাধ্যমে বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

বাল্যবিয়ে বন্ধে প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা

ফারিহা হোসেন

দেশকে বাল্যবিয়েমুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নের্তৃত্বে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাল্যবিয়ে বন্ধে দেশে রয়েছে আইন, রয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। এ জন্য রয়েছে মনিটরিং ব্যবস্থা। তবু বিভিন্ন সময়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাল্যবিয়ের ঘটনা ঘটছে। কিন্তু বাল্যবিয়ে শূন্যের কোটায় নিয়ে আসতে কাজ করছে সরকার।

প্রসঙ্গত, বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে ২০১৮ সালে সরকার জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। তাতে ২০২১ সালের মধ্যে বাল্যবিয়ে এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনার লক্ষ্য ঠিক করে নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের জরিপেও এ রকম তথ্য প্রকাশ করেছে। গত নভেম্বরে ইনস্টিটিউটের প্রকাশিত বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে অনুযায়ী, দেশে ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের ৩৬ শতাংশেরই ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ে হয়। এর আগে ২০১৪ সালে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল প্রতিষ্ঠানটি, তাতে বাল্যবিয়ের হার ছিল ৫৫ শতাংশ। এ হিসেবে বাল্যবিয়ের হার অনেক কমে এসেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১২-১৩ সালের মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার জরিপে দেশে ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ৫২.৩ শতাংশেরই বাল্যবিয়ে। অর্ধযুগ পর ২০১৯ সালে সেই জরিপে বাল্যবিয়ের হার কিছুটা কমে দাঁড়ায় ৪০.৪ শতাংশে। সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে ইউনিসেফ সম্প্রতি এ প্রতিবেদনে বলেছে, দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি বাল্যবিয়ে হচ্ছে বাংলাদেশে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে বাল্যবিয়ে বন্ধ এবং সরকারের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিয়ে নির্মূলে গত দশকের তুলনায় যথাক্রমে কমপক্ষে ১৭ গুণ ও আট গুণ বেশি কাজ করতে হবে বলে প্রতিবেদনে জানায় ইউনিসেফ। ফরাসি দার্শনিক নেপোলিয়ান বোনাপার্টের উক্তি, 'তুমি আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি দেব।' তিনি এও বলেছেন, 'একটি সুস্থ জাতি পেতে প্রয়োজন একজন শিক্ষিত মা।' অথচ এ সকল মাকে শিক্ষিত করার পরিবর্তে অল্প বয়সে বিয়ে হচ্ছে। বাল্যবিবাহ সমাজে এখনো একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে রয়েছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ আইন যথ াযথ বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যমকর্মী এবং প্রতিটি পরিবারকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

প্রতিবছর ৮ মার্চ আমরা আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করে আসছি। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে দেশের পুরুষদের তুলনায় নারীদের সার্বিকভাবে

অংশগ্রহণ ও সচ্ছলতা ব্যাপকভাবে প্রদর্শিত হয়। একটি দেশ ও জাতি গঠনের পেছনে নারী-পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন থাকে সমভাবে। কারণ দুটি জেন্ডারের সমান অংশগ্রহণ ও উপস্থিতিতে যেকোনো কর্মপ্রচেষ্টা সফলতা এনে দিতে পারে। এ রকম অসংখ্য নজির রয়েছে সমাজে।

শিশু বিবাহ একটি প্রথা, যা নারীদের ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামাজিক মূল্যবোধ ও অসম অবস্থানকে প্রতিফলিত করে। কিন্তু বহুদিন আগের এই প্রথা ও মানসিকতা এখন অনেকটাই বদলেছে। বাংলাদেশে নারীদের প্রায়ই আর্থিক বোঝা হিসেবে দেখা হলেও শিশু ও বাল্যবিয়ে ধীরে ধীরে কমেছে। দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতিতে সন্তানদের বিয়ের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা মূল প্রভাব বিস্তার করেন। একজন মেয়েশিশু যখন যৌবনপ্রাপ্ত হয়, তাদের পিতা-মাতা তখন তাদের সতীত্ব রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ পুরোপুরি বন্ধ করার কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রসঙ্গত, বাল্যবিবাহে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভূমিকা বর্ণনাতীত। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত ও জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। এসব দুর্যোগ অনেক পরিবারকেই গভীর দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়, যা তাদের মেয়েদের কম বা ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ের ঝুঁকি বাড়ায়। বিশেষ করে নদীভাঙনে ক্রমাগত ধ্বংসযজ্ঞের ফলে যারা ঘরবাড়ি, জমিজমা হারায় তাদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়।

বাল্যবিবাহ রোধের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও দারিদ্র্যতা হলো মূল বাধা। কারণ সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, যেসব পিতা-মাতা মেয়েশিশুদের বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তাঁরা মেয়েশিশুর বয়ঃসন্ধির শুরুতে যৌন নির্যাতনের ভয় অনুভব করেন। কিন্তু অনেক বিবাহিত কিশোরী দৈহিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয় বা এসবের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। যদিও শিশুদের বিয়ে দেওয়া এক ধরনের যৌন নির্যাতনের মধ্যে পড়ে বলে দেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলো মনে করে।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ও শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে নারী ও শিশুর অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু বাল্যবিয়ের ফলে এসব অধিকারের বাস্তবায়ন ও সুরক্ষা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সত্যি কথা "বাল্যবিবাহ" করোনাভাইরাসের মতো ভয়ংকর। এ সমস্যা শুধু জীবনকেই নয় বরং সমাজ এবং অর্থনীতিকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। মূলত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় অনেক দরিদ্র পরিবারই মেয়েশিশুদের বাল্যবিয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বাল্যবিয়ে দেশের উন্নয়নে একটি বড় বাধা। পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে পরিস্থিতির অবনতি হয়। বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের চিন্তা, তাদের কন্যাসন্তানকে বিয়ে দিতে হবে আগেভাগে। কারণ কন্যার সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও সুন্দর ভবিষ্যৎ চিন্তা থেকেই এসব চিন্তা তাদের মনে আসে। এ ক্ষেত্রে

বাল্যবিয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাদের কন্যাশিশুকে। তা ছাড়া রয়েছে দারিদ্র্যতা, কুসংস্কার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শিক্ষায় অধিকারের অভাব, সামাজিক চাপ, হয়রানি প্রভৃতি। যেমন মাধ্যমিক পর্যায়েই পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়া, গুরুতর স্বাস্থ্যগত সমস্যা, আগাম গর্ভধারণ যা মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে, স্বামী পরিত্যক্ত হওয়া, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের হাতে পারিবারিক সহিংসতার শিকার হওয়ার মতো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয় পরিবার এবং মেয়েকে।

জাতিসংঘ বলছে, সারা বিশ্বে বাল্যবিবাহের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমছে, কমছে বাংলাদেশেও, তবে সে হার কম। জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ এক প্রতিবেদনে বলেছে, গত এক দশকে সারা পৃথিবীতে আড়াই কোটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে প্রতি পাঁচজন নারীর মধ্যে একজনের বিয়ে হয় ১৮ বছর হওয়ার আগেই। কিন্তু এক দশক আগে এই সংখ্যা ছিল প্রতি চারজনে একজন। ইউনিসেফ বলেছে, বিশ্বজুড়ে গত এক দশকে বাল্যবিয়ে ১৫ শতাংশ কমে এসেছে।

সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে। রিপোর্টে বলা হচ্ছে, সেখানে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ের হার প্রায় ৫০ শতাংশ থেকে এখন ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে। অল্পবয়সী মেয়েরাও এখন তাদের বিয়ে প্রতিরোধে এগিয়ে আসছে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, দেশে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার শূন্যের কোটায় নেমেছে। ২০১০ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩৪-৪১ শতাংশ স্কুল বন্ধ থাকায় মেয়েদের নিরাপত্তা সংকট, অভিভাবকদের কাজ হারানো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়া। তা ছাড়া বাল্যবিয়ের যেহেতু একটি ট্র্যাডিশন আছে তাই করোনার সময়কে বিয়ে দেওয়ার সুযোগ হিসেবে নিয়েছে অনেকেই। যারা এই বাল্যবিয়ের শিকার হয়েছে তারা সবাই স্কুলের ছাত্রী। আর বিয়েগুলো হয়েছে শুক্র-শনিবার বন্ধের দিন বা রাতে। বাল্যবিয়ে বন্ধে সরকারের কঠোর পদক্ষেপের কারণে অনেক মেয়ে বাল্যবিয়ের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে হয়েছেন ডাক্তার, প্রকৌশলী, প্রভাষক, আইনবিদ, পুলিশ কর্মকর্তা, ইউএনও, ডিসি ও বিচারক। এই ধারা অব্যাহত থাকলে দেশ, সমাজ ও জাতি এগিয়ে যাবে। প্রত্যাশা থাকবে মানুষের সচেতনতা, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, অভিভাবকদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় বাল্যবিয়ের অভিশাপ থেকে সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষ নিষ্কৃতি পাবে।

লেখক : ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এবং নারী-শিশু, বায়োকেমিস্ট্রি ও পরিবেশবিজ্ঞানে অধ্যয়নরত

তাৎপর্যময় মার্চ মাস

মাহাফুজুর রহমান

বাংলাদেশের ইতিহাসে মার্চ মাসটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই মাসটি বাংলাদেশের জন্ম মাস। এই মাসের ৭, ১৭, ২৫ ও ২৬ তারিখ বাংলাদেশের স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের এক সম্মিলন।

৭ মার্চ বাঙালির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭০ সালের ৭ এবং ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তৎকালীন পাকিস্তানের উভয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানকে অনতিবিলম্বে পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকার আহ্বান জানান এবং অধিবেশন হতে হবে ঢাকায় তাও জানিয়ে দেন। ৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের দলীয় সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। এরপর ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে দফায় দফায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে ঢাকা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান শিগগিরই পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। জাতীয় সংসদ অধিবেশনের বিষয়ে বলেন, সংসদ অধিবেশনের তারিখ এখনো ঠিক হয়নি, তবে শিগগিরই অধিবেশন আহ্বান করা হবে। এরপর শুরু হয় পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র। এরই ধারাবাহিকতায় বিমানে ও জাহাজে পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত সৈন্য ও অস্ত্র পাঠাতে থাকে। ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে বিশাল সৈন্য সমাবেশ, ইয়াহিয়া খানের ১ মার্চের পার্লামেন্ট অধিবেশন স্থগিত করাসহ সকল ষড়যন্ত্রের বিষয় বঙ্গবন্ধুর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। তাই তিনি ১ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন এবং হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ২ মার্চের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং অবাঙালিরা বিভিন্ন স্থানে বাঙালিদের ওপর হামলা চালায়। সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে একত্র করে ভবিষ্যতের সংগ্রামের প্রস্তুতি ও দিকনির্দেশনার জন্য ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই ভাষণের বিষয় ৩ ও ৪ মার্চ থেকে তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। আগেই জানানো হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ রেসকোর্স ময়দান থেকে সরাসরি রেডিওতে সম্প্রচার করা হবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ ৭ মার্চ দুপুর আড়াইটা থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য অপেক্ষায় আছে। রেডিওতে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত ঘোষণা আসছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করা হবে। কিন্তু ভাষণ যখন শুরু হলো তখন দেশের মানুষ হতভাগ হয়ে লক্ষ করল রেডিও ডেড সাইলেন্ট। কোনো সাড়াশব্দ নেই। মফস্বল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়ল। কী হলো?, রেডিও বন্ধ কেন? তাহলে কি জনসভা হয়নি। বঙ্গবন্ধুর ওপর কি আক্রমণ হলো ইত্যাদি। এদিকে রেসকোর্স ময়দানে লাখো মানুষের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু দিলেন ১৯

মিনিটের এক ঐতিহাসিক ভাষণ। উপস্থিত জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল সেই ভাষণ। তিনি শুরু করলেন, 'আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই জানেন ও বোঝেন।' এরপর পাকিস্তানি শাসকদের হত্যার বর্ণনা দেন, বাংলার মানুষ কী চায়, তাও স্পষ্ট করে দিলেন। পাকিস্তানিদের দীর্ঘ ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস, অত্যাচার-অবিচার, শোষণ-নিপীড়নের বর্ণনা দিয়ে বঙ্গবন্ধু ভবিষ্যতে দেশের মানুষকে কী করতে হবে সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিলেন। সর্বশেষে তিনি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।' এটাই ছিল একজন কুশলী রাষ্ট্রনায়কের স্বাধীনতার ডাক। যে ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালিরা ৯ মাসে দেশ স্বাধীন করেছিল। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আজ বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। এটি ইউনেস্কো স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৪২৭টি প্রামাণ্য ঐতিহ্যের মধ্যে অলিখিত ভাষণ। ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বাঙালির প্রেরণার উৎস।

১৭ মার্চ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ রাত ৮টায় গোপালগঞ্জ জেলার বাইগার নদীর তীরবর্তী টুঙ্গিপাড়া গ্রামে শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের ঘর আলোকরে জন্ম নেয় এক খোকা। কালের পরিক্রমায় সেই খোকাই হয়ে ওঠে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এই অকুতোভয় বীর, বাঙালির জন্য এনে দেন একটি পতাকা, একটি স্বাধীন দেশ। স্থানীয় গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু হয় তাঁর শিক্ষাজীবন। এরপর পর্যায়ক্রমে গোপালগঞ্জ পাবলিক বিদ্যালয়, মাদারীপুর ইসলামিয়া বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জের মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল শেষ করে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ এবং সেখান থেকেই ১৯৪৭ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। একই বছর ২৩ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে বঙ্গবন্ধু তার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করেন। এ সময় তিনি মাতৃভাষার অধিকার আদায়ে আন্দোলন জড়িয়ে পড়েন এবং একাধিকবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ গঠিত হয়। জেলে থাকা অবস্থায় তিনি যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি বাংলা ভাষার দাবিতে কারাগারে অনশন শুরু করেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি টানা অনশনে অসুস্থ হয়ে পড়লে স্বাস্থ্যগত কারণে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। ২১ ফেব্রয়ারি রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদ মিছিলে গুলি করা হয়। এতে শহিদ হন শফিক, সালাম, রফিক, বরকতসহ অনেকে। জেল থেকে বঙ্গবন্ধু এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেন। ১৯৫৩ সালে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে তিনি গোপালগঞ্জ আসন থেকে বিজয়ী হন এবং যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় কনিষ্ঠ মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে তিনি ৬ দফা পেশ করেন এবং এর পক্ষে দেশব্যাপী জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক জনসংযোগ শুরু

করেন। এ সময় তাঁকে তিন মাসে ৮ বার গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি তাঁকে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামি করা হয়। ১৯৬৯-এর তীব্র গণ-আন্দোলনের মুখে তৎকালীন সরকার মিথ্যা মামলাটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে সব কিছু। ১৯৭০-এর নির্বাচন, আওয়ামী লীগের ভূমিধস জয়, ইয়াহিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্র, বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, এ সবই আমাদের ইতিহাসের অংশ। ১৭ মার্চ বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশের সাথে অভিন্ন সত্তায় পরিণত হওয়া বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানের জন্মদিন। এবার পালিত হবে জাতির পিতার ১০৩তম জন্মবার্ষিকী। জাতি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে জাতির পিতাকে। এ দিনটি ১৯৯৬ সাল থেকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। পৃথিবীর ইতিহাসের এক নৃশংসতম কাল রাত্রি। এদিন সন্ধ্যায় খবর ছড়িয়ে পড়ে ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেছেন। সকাল থেকে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাসায় মানুষের ঢল নামে। বঙ্গবন্ধু দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। রাত সাড়ে ১১টায় শুরু হয় অপারেশন সার্চলাইট। ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা। মার্কিন সাংবাদিক রবার্ট পেইন ২৫ মার্চ রাত সম্পর্কে তাঁর প্রতিবেদনে লেখেন, 'সেই রাতে ৭০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়, আর গ্রফতার করা হয় ৩ হাজার মানুষকে।' এই গণহত্যার স্বীকৃতি পাকিস্তান সরকারের দলিলেও আছে। পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে যে শ্বেতপত্র পাকিস্তান সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রকাশ করেছিল তাতে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৭১ সালের ১ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত এক লাখেরও বেশি মানুষের জীবননাশ হয়েছিল। ২৫ মার্চে নৃশংস হত্যাযজ্ঞের শিকার সকলের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা। তাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ রাত ১২টা ৩০ মিনিট, অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরীর নিকট প্রেরণ করেন। চট্টগ্রাম বেতার থেকে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তাটি আওয়ামী লীগ নেতা জনাব হান্নান স্বকণ্ঠে প্রচার করেন। শুরু হয় আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ। দীর্ঘ ৯ মাসের অনেক ত্যাগ আর রক্তের বিনিময়ে অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

বাঙালি জাতির জীবনে মার্চ মাস তাই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কালের পরিক্রমায় জাতির জীবনে এবার এসেছে ৫৩তম স্বাধীনতা দিবস। অন্যান্যবারের মতো এবারেও জাতীয় স্মৃতিসৌধে লাখো মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় সিক্ত হবেন স্বাধীনতাযুদ্ধের বীর শহিদরা। এই শুভক্ষণে প্রত্যাশা–আগামীর বাংলাদেশ হোক শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধময়।

লেখক : মুক্তিযোদ্ধা ও শিক্ষাবিদ

কন্যাশিশুর অধিকার

গাজী শরীফা ইয়াছমিন

আরিফ ও নিশির পাঁচ দিনের মেয়ে অহনা। অহনাকে দেখতে বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের ভিড়। নিশিকে এক আত্মীয় ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'মেয়ে হওয়ার জন্য বাড়ির লোক সবাই খুশি? কথা শোনায়নি?' নিশি প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে বুঝতে পারে প্রশ্ন করার অর্থ। দৃঢ়ভাবে জানায়, অহনাকে নিয়ে সবাই খুব খুশি।

আসলে শিশু তো শিশুই। ভেদাভেদ করে মানুষ। প্রায় পরিবারে মেয়েশিশুর প্রতি অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈষম্যমূলক আচরণ দেখা যায়। অনেক শিক্ষিত মানুষ বলে থাকে যে ছেলে বা মেয়েসন্তানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু তারা আদতে পুত্রসন্তানই চেয়ে থাকে। বংশরক্ষা কিংবা বৃদ্ধ বয়সে দেখাশোনা করার মতো খোঁড়া যুক্তি দিয়ে থাকে। এমনকি মেয়েসন্তান হওয়ার জন্য পুরুষ দায়ী, এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি মাঝে মাঝে শিক্ষিত সমাজ মানতে নারাজ। তাই এই আধুনিক সমাজেও কোনো অন্যায় না করেও অনেক নারীকে কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। বিশ্বে মোট জনসংখ্যার ১৫ ভাগ কন্যাশিশু। বাংলাদেশে শিশুর সংখ্যা প্রায় ৬০ মিলিয়ন। এই শিশুদের অর্ধেকই কন্যাশিশু। শিশুর অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ। স্বাধীন বাংলাদেশে শিশুদের সুরক্ষা ও তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম শিশু অধিকার আইন প্রণয়ন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই আইনকে যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে শিশু আইন-২০১১ রূপে প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি), ১৯৮৯-এ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনকারী প্রথম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, নীতিমালাসহ সব ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েশিশুকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কন্যাশিশুদের যথাযথ শিক্ষা, অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। বর্তমান সরকার সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কন্যাশিশুদের যথাযথ শিক্ষা, অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। কন্যাশিশুদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা গেলে, তারা যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হয়ে উঠবে। এই লক্ষ্যে কন্যাশিশুদের কল্যাণে অবৈতনিক শিক্ষার প্রচলন, উপবৃত্তি প্রবর্তন, বিনামূল্যে বই বিতরণ, নারী শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকার জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছে। নারী ও শিশু

নির্যাতন (দমন) আইন-২০০০-এ নতুন ধারা সংযোজন এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রণয়ন করেছে। বর্তমান সরকার দেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ শিশুর উন্নয়ন, সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। এই শিশুদের মধ্যে অন্তত ১৫ শতাংশ কন্যাশিশু। বাংলাদেশে কন্যাশিশুদের শিক্ষার অধিকার, খাদ্য ও পুষ্টির সুরক্ষা, আইনি সহায়তা, ন্যায়বিচারের অধিকার, চিকিৎসা সুবিধা, বৈষম্য থেকে সুরক্ষা, নারীর বিরুদ্ধে হিংসা ও বলপূর্বক বাল্যবিবাহ বন্ধের লক্ষ্যে প্রতিবছর ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়। গত বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'সময়ের অঙ্গীকার, কন্যাশিশুর অধিকার'। করোনাকালে কন্যাশিশুর ওপর বঞ্চনা বেড়ে যাওয়ায় দিবসটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহে ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছর ১১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়।

২০১৪ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত গার্ল সামিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে বাল্যবিবাহমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) নিয়েছে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো, সার্বিক বাল্যবিবাহের হার এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা। শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম চাবিকাঠি। শিক্ষা কন্যাশিশুর উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং শিশুমৃত্যুর হার কমানোর প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং প্ল্যান বাংলাদেশের এক যৌথ জরিপ মতে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করা ২৬ শতাংশ নারীর বিয়ে হয়েছে ১৮ বছরের আগে। নিরক্ষর নারীদের বেলায় এই সংখ্যা ৮৬ শতাংশ। বর্তমান সরকার ছাত্রী ও নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য নারীবান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর ফলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলগুলোতে ছাত্রী অনুপ্রবেশ এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণে পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে।

জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর একটি। বাংলাদেশে ১৮ শতাংশ মেয়ের ১৫ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে হয়। ১৮ বছর বয়সের মধ্যে ৫২ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়।

গত দুই দশকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিপুলসংখ্যক মেয়ে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণসহ নারী ও কন্যাশিশু উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে বাংলাদেশ। তথ্যানুযায়ী, করোনা বাস্তবতায় সারা বিশ্বের ৬৫০ মিলিয়ন বাল্যবিবাহের শিকার হওয়া নারীর সঙ্গে নতুনভাবে বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে পড়েছে আরো ১০ মিলিয়ন কন্যাশিশু। বাল্যবিবাহ নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানতম অন্তরায়। বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কন্যাশিশুরা অনেক বেশি মাত্রায় ঝুঁকির মধ্যে আছে। করোনাপূর্ববর্তী সময়েই বাংলাদেশের ৫২ শতাংশ মেয়েশিশুই ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বাল্যবিবাহের শিকার হতো। করোনাকালে সারাদেশে প্রাথমিক ও

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২০২০ সালের মার্চ থেকে টানা দেড় বছর বন্ধ থাকার পর ২০২১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর খুলে দেওয়া হয়। মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা ও তথ্য-উপাত্ত বলছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার পর অনেক মেয়ে শিক্ষার্থীই আর ফিরে আসেনি। যারা ফিরে আসেনি, তাদের উল্লেখযোগ্য অংশই বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছে। এ ছাড়া আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে শিশু ধর্ষণ ও শিশুর প্রতি যৌন নির্যাতন। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, শুধু ২০২১ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৭৭৪ জন কন্যাশিশু। বিভিন্ন সংস্থার জরিপে দেখা যায়, ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহারকারী নারীদের প্রায় ৫৩ শতাংশই এ দেশে সাইবার অপরাধের শিকার হচ্ছে এবং এই নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ কন্যাশিশু। অর্থাৎ ভার্চুয়াল দুনিয়াতেও নিরাপদে নেই কন্যাশিশু।

সরকার সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে কন্যাশিশুদের অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সরকার সমাজে বৈসম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০১৫-২০২৫ মেয়াদে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা তৈরি করেছে। যা ইতোমধ্যে ২৪টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরকারের ১২০টি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মধ্যে ১৯টি কর্মসূচি সরাসরি শিশুদের জন্য। কন্যাশিশুদের তথা প্রযুক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে সরকার নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

কন্যাশিশুরা পুষ্টি বৈষম্যের শিকার। যেকোনো কল্যাণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য নারী-পুরুষের অবদান অনস্বীকার্য। পুরুষরাই পৃথিবীর সব সৃষ্টির সাথে জড়িত নয়, নারীদের সুযোগ দিলে তারাও সব কিছু জয় করতে পারে। সে জন্য সব শিশুকেই সমানভাবে বেড়ে ওঠার অধিকার ও সুযোগ দিতে হবে। আদিকাল থেকেই পরিবার ও সমাজে কন্যাশিশুরা বৈষম্যের শিকার। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার এ ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে। সমাজের নানা অসংগতি ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ আজীবন কাজ করে গেছেন। তাঁদের পথ অনুসরণ করে আমাদেরও কন্যাশিশুর সুরক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে দায়িত্ব নেওয়া উচিত। কারণ কন্যাশিশুকে বাদ দিয়ে কখনো টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

লেখক : তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

নদীদূষণ

কামরুন নাহার মুকুল

নদী বাংলাদেশের প্রাণ। আর বাঙালির সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে নদীকেই কেন্দ্র করে। মিসরকে নীল নদের দান বলা হয়; তেমনি বাংলাদেশকে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা নদ-নদীর দান বলা যায়। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে অভিন্ন ৫৭টি নদী। নদীবিধৌত এ দেশে ছোট-বড় মোট ২৩০টি নদী আছে আর শাখা-প্রশাখাসহ নদীর সংখ্যা প্রায় ৮০০টি। এ নদীগুলো সারাদেশে রক্তের শিরা-উপশিরার মতো বহমান। বিআইডব্লিউটিএর মতে, ১৯৭১ সালে দেশে প্রায় ২৪১৪০ কিলোমিটার জায়গা দখল করে ছিল নদ-নদী। আর বর্তমানে সেটি মাত্র ৬ হাজার কিলোমিটারে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটেও দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অভ্যন্তরীণ নৌপথ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। নদীকে ঘিরেই ছিল আদিকালের যাতায়াতের সব ব্যবস্থা।

নদী পরিবেশের বিচিত্র অনুষঙ্গ। আমাদের দেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবীকার সম্পর্ক রয়েছে নদীর সাথে। খরস্রোতা নদীগুলোতে জেলেরা মাছ ধরত, নৌকাবাইচ হতো, উৎসবের আমেজে মেতে উঠত নদীর পাড়ের মানুষগুলো। কৃষি, মৎস্য, জেলেদের পেশা এবং সংস্কৃতির পাশাপাশি মানুষের নিত্যদিনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ সব কিছুর একমাত্র উৎস ছিল নদী। বাংলাদেশের নদীগুলোর বিচিত্র গড়ন, বিচিত্র চরিত্র। সিলেট অঞ্চলের নদীর সাথে রংপুরের তিস্তার মিল পাওয়া যাবে, এমন নয়। নদী আপন বেগে পাগলপারা; নদী তার আপন গতিতে চলতে অভ্যস্ত। বাংলাদেশের নদীগুলো মিঠাপানির প্রধান উৎস এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু আমাদের দায়িত্বহীনতায় নদীগুলো দখল ও দূষণের শিকার। গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত সর্বত্রই ময়লা-আবর্জনা নদীতে ফেলছি আমরা। উজান থেকে নেমে আসা পলিও এসে পড়ছে নদীতে। কিন্তু সেই নদী আজ দখল, দূষণ আর ভরাটের প্রতিযোগিতায় বিপন্ন; অনেকাংশে বিলুপ্ত। নদীগুলোর নাব্যতা হারানোর নানা কারণের মধ্যে অবৈধ দখলদারি, অপরিকল্পিত নদীশাসন, দূষণ, ভরাট, অপরিকল্পিত ড্রেজিং, ইচ্ছামতো বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি অন্যতম। বিশেষজ্ঞরা শিল্পবর্জ্য, পয়ঃবর্জ্য, শহরের কঠিন বর্জ্য এবং নৌযানের বর্জ্য এই চারটি উৎসকে নদীদূষণের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সব নিয়মনীতি উপেক্ষা করে নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠছে বড় বড় কলকারখানা, শত শত বাঁধ। ঢাকার কোলঘেঁষা বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ আর বালু নদী রাজধানীর প্রান। দূষণ-দখলের কবল থেকে এ নদীগুলোকেও আর বাঁচানো যাচ্ছে না। প্রতিদিনই বাড়ছে দূষণ; বাড়ছে দখলদারদের সংখ্যাও। প্রভাবশালীরা নদী ভরাট করে দখলের উৎসবে মেতেছে।

চার শ বছর আগে ঢাকার নগরায়ণ শুরু হয়েছিল বুড়িগঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে। যে নদীকে লন্ডনের টেমস নদীর সাথ তুলনা করা হতো। এটি রাজধানীর ফুসফুস হিসেবেও বিবেচিত হতো। আর আজ রাজধানীর প্রতিদিনের পয়ঃবর্জ্যের প্রায় সবটুকু উন্মুক্ত খাল, নদ-নদী, নর্দমা হয়ে অপরিশোধিত অবস্থায় বুড়িগঙ্গায় জমা হচ্ছে। বুড়িগঙ্গা নদীকে গিলে খাচ্ছে পলিথিন, ট্যানারিসহ শিল্প-কারখানার বিষাক্ত কেমিক্যাল ও বর্জ্য, হাসপাতাল-ক্লিনিকের পরিত্যক্ত কেমিক্যাল, লঞ্চ-জাহাজের পোড়া তেল, মবিল, ওয়াসার পয়ঃবর্জ্য, গৃহস্থালি বর্জ্য ও নদীর পাড়ে নির্মিত কাঁচা পায়খানা। ঢাকার প্রাণ বুড়িগঙ্গা এখন প্রাণহীন। স্বচ্ছ পানির কলকল শব্দ শোনা যায় না; দেখা যায় না তার বুকে সাপের ফনার মতো ঢেউ। এখন সে শীর্ণকায় ক্ষীণ স্রোতস্বিনী; খরস্রোতা রূপ সে নব্বইয়ের দশকেই হারিয়েছে। এখন তার পানিও আর 'পানি'র সংজ্ঞায় পড়ে না; পরিণত হয়েছে বিষে; রং হয়েছে কালো কুচকুচে। মাছ বিলুপ্ত হয়েছে বহু আগে। জীববৈচিত্র্যও নেই। এ নদীর পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রায় শূন্যের কোঠায়।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও প্রাণিবিজ্ঞানীদের মতে, মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী বসবাসের জন্য প্রতি লিটার পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ ৫ মিলিগ্রাম বা তার বেশি থাকা প্রয়োজন। অন্যদিকে দ্রবীভূত হাইড্রোজেনের মাত্রা কমপক্ষে ৭ মিলিগ্রাম থাকা উচিত। অথচ বুড়িগঙ্গা নদীর পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ মাত্র ২ মিলিগ্রামের মতো। এ অবস্থায় বুড়িগঙ্গায় প্রাণের অস্তিত্ব টিকে থাকার সুযোগ একেবারেই কম। আইন করেও ঠেকানো যাচ্ছে না বুড়িগঙ্গার দূষণ। কর্ণফুলী চট্টগ্রামের প্রাণ আর দেশের অর্থনীতির হৃৎপিণ্ড। দখল-দূষণের শেষ নেই সেই নদীতেও। দু'পাড়ের কলকারখানার দূষিত বর্জ্য, পলিথিন, প্লাস্টিক ও রাবারের বিষে বিষাক্ত কর্ণফুলী। নদীদূষণের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে জীববৈচিত্র্য ও জনজীবনে। ধংস হচ্ছে নদীর জীববৈচিত্র্য, হারিয়ে যাচ্ছে অনেক মাছ ও জলজ প্রাণী। বিজ্ঞানীদের মতে, দূষণের বিষ খাদ্যচক্রের মাধ্যমে মানব শরীরে প্রবেশ করছে। কিডনি বিকল, ক্যান্সারসহ নানা মারণব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ। নদীদূষণের কারণে মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আজ বাংলাদেশের নদীগুলো অস্তিত্ব সংকটে; ক্রমাগত নাব্যতা হারাচ্ছে। অনেক ছোট ছোট নদী বিলুপ্ত হওয়ার পথে। মানুষের অনিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ডই মূলত নদী দূষণের কারণ। কৃষিজমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশক এসে মিশে যাচ্ছে নদীতে। নদীতে গবাদি পশুর গোসল, মৃত পশুপাখি, পরিত্যক্ত আবর্জনা নদীতে ছুড়ে ফেলাসহ, নদীর তীরে অস্বাস্থ্যকর পায়খানা থেকে মলমূত্র নদীতে মিশে যাচ্ছে। মানুষ নির্বিচারে নদীতে ফেলছে দূষিত পদার্থ, শিল্প-কারখানার বর্জ্য, গৃহস্থালির বর্জ্য। এখানে মানবতাও উপেক্ষিত।

নদী জীবন্ত সত্তা, তারও প্রাণ আছে, আছে অনুভূতি এবং সেই অনুভূতির সঙ্গে মানুষেরও একাত্মতা রয়েছে, তা বহু আগেই উপলব্ধি করেছিলেন রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর লেখায় নদীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল। সেই লেখার অনেক বছর পরে, ২০১৯ সালে বাংলাদেশের উচ্চ আদালত রাজধানীর প্রতিবেশী তুরাগসহ দেশের সকল নদীকে 'লিভিং এনটিটি' বা 'জীবন্ত সত্তা' হিসেবে ঘোষণা

করেন। অর্থাৎ দেশের নদীগুলো এখন থেকে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর মতোই আইনি অধিকার পাবে। আদালতের রায় অনুযায়ী নদীগুলো এখন 'জুরিসটিক পারসন' বা 'লিগ্যাল পারসন'। এর মধ্য দিয়ে মানুষের মতো নদীরও মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং নদীকে হত্যা করার অর্থ হলো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে হত্যা করা। আদালত স্পষ্ট করে বলেছেন, তুরাগ নদীসহ বাংলাদেশের সব নদীই মূল্যবান এবং সংবিধান, বিধিবদ্ধ আইন ও পাবলিক ট্রাস্ট মতবাদ দ্বারা সংরক্ষিত। নদী জীবন্ত সত্তা; মানুষের মতো তারও অধিকার আছে। বিষয়টি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। কারণ বাংলাদেশকে নদীমাতৃক বলা হয়। নদী মায়ের মতো; নদী মা হিসেবে স্বীকৃত। নদীদূষণও মাকে হত্যা করার শামিল।

নদীদূষণের উৎস একাধিক, দূষণরোধ ও তদারকি করার কর্তৃপক্ষও একাধিক। নদীর অবৈধ দখল আর পরিবেশদূষণ ঠেকাতে আছে 'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।' ২০১৯ সালে হাইকোর্ট কর্তৃক নদীকে জীবন্ত সত্তা ঘোষণা করে 'নদী রক্ষা কমিশনকে' দেশের সব নদ-নদী-খালের আইনগত অভিভাবক হিসেবেও ঘোষণা দেন। দেশের সব নদ-নদী, খাল-জলাশয় ও সমুদ্রসৈকতের সুরক্ষা এবং বহুমুখী উন্নয়নে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বাধ্য থাকবে বলেও রায়ে উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া নদী রক্ষা কমিশনকে স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেন আদালত। নদীকে 'জীবন্ত সত্তা' হিসেবে ঘোষণা করা যুগান্তকারী রায়টিও একটি মাইলফলক। নদীর পানিপ্রবাহ ঠিক রাখা, দূষণমুক্ত রাখা এবং দখল রোধে জড়িত আছে ২৭টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ। এর পরও নদী রক্ষা পাচ্ছে না। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০২০-এর খসড়ায় বেশ কিছু কঠোর বিধান রাখা হয়েছে।

নদীতীরবর্তী শিল্প-কারখানাগুলোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকা, যত্রতত্র প্লাস্টিকের ব্যবহারসহ পৌরসভাগুলোর ময়লা নদীতে ফেলা দূষণের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এক সময় নদী কৃষিকাজ ও মাছ ধরার উৎস হলেও এখন তা শিল্প-কারখানার বিষাক্ত বর্জ্যে সম্পূর্ণ ব্যবহার-অনুপযোগী। নদীগুলোর আগের রূপে ফিরিয়ে নিতে শিল্প-কারখানা, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দিয়েছেন পরিবেশবিদরা। যে আইনগুলো আছে সেগুলো জরুরি প্রয়োগ; নৌপথকে সচল রাখতে নদীগুলোকে খনন, সব কারখানায় শিল্পবর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) নির্মাণে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। নদী রক্ষায় প্রয়োজনে সামাজিক আন্দোলনও গড়ে তুলতে হবে।

বিবিসির সমীক্ষায় বাংলাদেশের ৪৩৫টি নদী হুমকির মুখে; ৫০ থেকে ৮০টি নদী বিপন্নতার শেষ প্রান্তে। গবেষকদের মতে, এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ২০৫০ সাল নাগাদ নদীমাতৃক বাংলাদেশের নাম শুধু ইতিহাসের পাতায় থাকবে। নদী রক্ষা শুধু সরকারের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেই সব শেষ হয়ে যাবে না। এখানে নাগরিকদের দায়িত্ব নিতে হবে। সকলকে সচেতন হতে হবে। নদী বাঁচলে পরিবেশ বাঁচবে তাহলেই মানুষ বাঁচবে। রক্ষা পাবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম।

লেখক : সাংবাদিক

Bangladesh's Foreign Policy and Importance of FDI

Dr. A K Abdul Momen

Bangladesh, a country situated in South Asia, has been actively pursuing a foreign policy aimed at promoting peace, stability, and economic development both domestically and internationally. Bangladesh always practices the foreign policy dictum of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman - 'Friendship to all, malice towards none'. Bangabandhu's able daughter, our current Prime Minister Sheikh Hasina successfully implemented the vision of Bangabandhu and uphold Bangladesh's global images by becoming a continuous voice on the issues such as climate change, culture of peace, women empowerment, rights of the developing countries, sustainable development goals, equal opportunity for economic development etc. The Ministry of Foreign Affairs actively engage with the countries and international and regional organizations to get the maximum benefit for Bangladesh.

Bangladesh's foreign policy is guided by several key objectives that contribute to the country's overall development. Firstly, Bangladesh aims to safeguard its national interests by ensuring regional stability and security. The country actively engages in diplomatic efforts to build strong bilateral and multilateral relations with neighboring countries and the international community. Secondly, Bangladesh seeks to promote international and regional cooperation through organizations such as United Nations, Organization for Islamic Cooperation (OIC), Commonwealth, World Trade Organization (WTO), the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC), ASEAN Regional Forum (ARF) etc. These platforms provide opportunities for political dialogues, economic integration, trade facilitation, and the exchange of ideas and resources. Additionally, Bangladesh pursues an active role in global affairs, advocating for the interests of developing countries and participating in international forums. The country supports peacekeeping missions and contributes to humanitarian efforts worldwide. Bangladesh's foreign policy objectives aim to establish the nation as a responsible global player while addressing its domestic needs and aspirations.

In the Foreign Ministry, we are actively engaged in two broad areas of diplomacy – Public Diplomacy and Economic Diplomacy. Public

diplomacy works include improving the brand image of Bangladesh in the global sphere, establishing Bangladesh Brand theme, increase people to people contact both in home and abroad, disseminating information about the work of the Foreign Ministry and its 81 Missions, and work against any propaganda activities that are harmful for Bangladesh. In the economic diplomacy part, we are involved with five categories of activities – increase the export earnings of Bangladesh, export product diversification, attract significant amount of foreign direct investment every year, transfer of technology in the Bangladesh's industrial and service sectors and ensure suitable employment for our expert manpower in the global and regional institutions/industries/service sectors and provide quality services. For completing and monitoring the whole gamut of economic diplomacy, we have established a separate International Trade, Investment and Technology Wing in the Ministry. This Wing wholeheartedly work on the economic diplomacy areas to ensure maximum economic benefit for Bangladesh.

One of the key components of economic diplomacy is Foreign Direct Investment (FDI) which plays a pivotal role in Bangladesh's economic growth and development strategy. It serves as a catalyst for job creation, technology transfer, infrastructure development, and the overall enhancement of productive capacities. FDI contributes to the diversification of industries, boosts export potential, and helps attract foreign expertise and knowledge. FDI inflows have a significant impact on the economy by providing a steady source of capital, which can be utilized for investment in critical sectors such as manufacturing, energy, telecommunications, and infrastructure. This inflow of foreign capital strengthens the domestic investment base, stimulates economic activities, and creates employment opportunities. Furthermore, FDI brings along technological advancements and managerial expertise, which can have a transformative effect on local industries. Foreign investors often introduce modern production techniques, research and development capabilities, and efficient management practices, leading to increased productivity and competitiveness. Several factors contribute to the attractiveness of Bangladesh as a destination for foreign direct investment. Understanding these factors helps identify the country's strengths and opportunities for further improvement.

Stable Macroeconomic Environment: A stable macroeconomic environment is a crucial factor for attracting FDI. Bangladesh has demonstrated macroeconomic stability with steady economic growth, low inflation, manageable public debt, and a stable exchange rate in the last 14 years. The Awami League government's prudent fiscal policies

and sound monetary measures have instilled confidence in foreign investors. In the last couple of years, we see an uprising trend of FDI in Bangladesh.

Investment Incentives and Policies: Bangladesh offers a range of investment incentives and policies to attract foreign investors. These include tax holidays, duty exemptions on capital machinery imports, reduced tariffs on raw materials, and repatriation facilities for profits and dividends, avoidance of double taxation, foreign investment guarantee, etc. Additionally, the government has implemented a "One Stop Service" to streamline administrative processes and provide faster approvals for investment projects.

Infrastructure Development: The government has made substantial investments in infrastructure development, including roads, ports, power plants, digitalization, Hi-Tech Parks and special economic zones (SEZs). These initiatives aim to improve connectivity, reduce transportation costs, and provide dedicated areas for foreign investors. We have constructed the Padma Bridge, the Metro Rail network in the mega city Dhaka, the Karnaphuli tunnel under the river, the Nuclear Power Plant, and all the main highways of Bangladesh have been upgraded to four lane capacity. The government also takes many other infrastructure projects to improve the overall connectivity across the country. Bangladesh is well connected with the neighboring countries through roads, rails and air network.

Sheikh Hasina's government already declared to establish 'Smart Bangladesh' by 2041 and take necessary policies to develop Smart Citizen, Smart Economy, Smart Government and Smart Society. To make this vision of Prime Minister successful, we need to upgrade our activities and way of doing work to a new high so that we can be able to compete with the fast-changing world. My Ministry has already work on practicing Smart Foreign Policy which will be more focused on ensuring the national interest of Bangladesh and increasing the trade and business capabilities. Smart Foreign Policy of Bangladesh will use the frontier technology tools to carry forward our diplomatic work. Foreign Ministry and its 81 Missions are well prepared to take the challenges of this time and the time ahead. Together we will achieve our goals to become a developed state by 2041.

Writer: Foreign Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh

বিশ্ব শরণার্থী দিবস ও জলবায়ু শরণার্থী

মো. জাহাঙ্গীর আলম

আধুনিক এই বিশ্বে একটি বিশালসংখ্যক জনগোষ্ঠী এখনো নির্যাতন, সংঘাত, যুদ্ধ বা সহিংসতার কারণে নিজ ঘরবাড়ি ও দেশ থেকে পালিয়ে শরণার্থী জীবন যাপন করছে। ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা, রাজনৈতিক মতাদর্শ অথবা বিশেষ কোনো সামাজিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হওয়ার কারণেই সংঘাত, যুদ্ধ আর সহিংসতা এবং ফলাফল বিরাটসংখ্যক জনগোষ্ঠীর শরণার্থীর জীবনযাপন। সম্প্রতি বছরগুলোতে নতুন করে যোগ হচ্ছে জলবায়ু শরণার্থী। বিশ্বে বেড়ে চলছে জলবায়ু শরণার্থীর সংখ্যা, যদিও জলবায়ু শরণার্থীর ইস্যুটি এখনো অত বড় করে দেখা হচ্ছে না। শরণার্থী ইস্যুটি বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো ও চলমান সমস্যার একটি। নানা কারণেই দিন দিন শরণার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ইউএনএইচসিআর বলেছে, গত এক বছর বিশ্বে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়েছে এক কোটি ৯০ লাখ মানুষ। এর আগে কখনো এক বছরে বাস্তুচ্যুত এত বাড়েনি। গত দুই মাসে সুদান এবং এক বছরের বেশি সময় ধরে ইউক্রেনের সংঘাতের কারণে বর্তমানে বিশ্বে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১১ কোটি হয়েছে।

ইউএনএইচসিআরের বৈশ্বিক বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদনে অনুসারে রুশ আক্রমণের পর প্রায় ১ কোটি ১৪ লাখ ইউক্রেনীয় নাগরিক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। তাদের অনেকেই এখন পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে শরণার্থী হিসেবে বসবাস করছে। বর্তমান বিশ্বে গড়ে প্রতি ৭৪ জনের মধ্যে একজনের বেশি মানুষ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির শিকার। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির মধ্যে একটি বড় অংশ শরণার্থী। এসব শরণার্থী অস্থায়ী ক্যাম্পে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। তাদের নির্দিষ্ট দেশ নেই, নিরাপত্তাহীনতা, অবহেলা আর বঞ্চনায় কাটে জীবন। শরণার্থীদের মৌলিক, মানবিক ও নিরাপত্তা অধিকার নেই বললেই চলে। বিশ্বের অনেক স্থানেই আজ শরণার্থীদের মৌলিক ও মানবিক অধিকার, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা হুমকির মুখে। তাই আন্তর্জাতিক মহলে শরণার্থীদের অধিকার বাস্তবায়নে বহুবিধ আলোচনা হচ্ছে। তবে তাদের অধিকারের পাওয়ার বিষয়টি এখনো পরিপূর্ণতা পায়নি।

সাধারণত নির্যাতন, সংঘাত, যুদ্ধ বা সহিংসতার হাত থেকে বাঁচতে নিজ ঘরবাড়ি ও দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হওয়া মানুষকে শরণার্থী বা উদ্বাস্তু বলে। জাতিসংঘের মতে, কোনো ব্যক্তির বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা, নির্দিষ্ট কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যপদ থাকা অথবা রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকার কারণে যদি তার ওপর নির্যাতনের সমূহ সম্ভাবনা থাকে, তবে নিজ ঘরবাড়ি ও দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া সেসব জনগোষ্ঠী

শরণার্থী হিসেবে গণ্য হয়। এর সাথে নতুন করে যোগ হওয়া জলবায়ু শরণার্থী, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যারা বাস্তুচ্যুত হচ্ছে, তারাই জলবায়ু শরণার্থী।

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের শেষ নাগাদ পর্যন্ত নিপীড়ন, সংঘাত, সহিংসতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বাঁচতে সারা বিশ্বের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতদের সংখ্যা ১০৮.৪ মিলিয়ন অতিক্রম করেছে। এই নতুন রেকর্ড সুদান এবং ইউক্রেন যুদ্ধসহ অন্যান্য সংঘাতের কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা এত বেড়েছে বলে মনে করছে ইউএনএইচসিআর। বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ২০২২ সালের শেষ নাগাদ ১০ কোটির মতো ছিল। ইউক্রেন, ইথিওপিয়া, বুরকিনা ফাসো, মিয়ানমার, নাইজেরিয়া, আফগানিস্তান এবং কঙ্গোতে সংঘাতের কারণে মূলত সংখ্যাটি বাড়ছিল। তবে চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকে সুদানের যুদ্ধ শুরু হলে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। ১০ কোটির বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হওয়ার অর্থ হচ্ছে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশের অধিক মানুষ আর নিজের ঘরে থাকতে পারছে না। এই সংখ্যার মধ্যে শরণার্থী, আশ্রয়প্রার্থী এবং নিজের দেশেই ঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়া ছয় কোটির মতো মানুষও রয়েছে।

ইউএনএইচসিআরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের শেষে সারা বিশ্বে ১০৮.৪ মিলিয়ন মানুষ বলপূর্বক নিজ ভিটামাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ৩৫.৩ মিলিয়ন উদ্বাস্তু বা শরণার্থী, ৬২.৫ মিলিয়ন অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষ, ৫.৪ মিলিয়ন আশ্রয়প্রার্থী এবং ৫.২ মিলিয়ন বিদেশে বাস্তুচ্যুত, যাদের আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রয়োজন। বিশ্বের অর্ধেকের বেশি শরণার্থী এসেছে দক্ষিণ সুদান, আফগানিস্তান এবং সিরিয়া থেকে। দেশগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহসহ নানা সমস্যার কারণে এসব মানুষ বর্তমানে শরণার্থী। এ শরণার্থীদের আশ্রয়দান করেছে তুরস্ক, পাকিস্তান, লেবানন, ইরান, উগান্ডা ও ইথিওপিয়া। বিশ্বে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের এক-তৃতীয়াংশকেই আশ্রয় দিয়েছে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলো।

বাংলাদেশ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয়দানকারী একটি দেশ। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মিয়ানমার তার নাগরিক হিসেবে স্বীকার না করায় বিশ্বসম্প্রদায়ের কাছে তারা স্টেটলেস (রাষ্ট্রহীন)। আশ্রিত রোহিঙ্গাদের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি 'রাষ্ট্রহীন' এখন বাংলাদেশে। ইউএনএইচসিআরের হিসাবে ২০২২ সাল শেষে বাংলাদেশে রাষ্ট্রহীন মানুষের সংখ্যা ৯ লাখ ৫২ হাজার ৩০০। সম্পূর্ণ মানবিক কারণে মিয়ানমারের এই বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশ সাময়িকভাবে আশ্রয় দিয়েছে এবং মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১৬ সালে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বড় অংশকে বাংলাদেশে চলে আসতে বাধ্য করে মিয়ানমার। বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে প্রথম আশ্রয় নিয়েছিল ১৯৭৮ সালে।

শরণার্থীদের অধিকার সুরক্ষায় বড় মাধ্যম হলো ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশন এবং ১৯৬৭ সালের প্রটোকলের সঠিক ব্যবহার। এ ছাড়া ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (The Universal Declaration of Human Right)-এর বাস্তবায়ন। বর্তমানে বিশ্বের ৩৫.৩ মিলিয়ন উদ্বাস্তু বা শরণার্থীদের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত জরুরি। ইউএনএইচসিআর শরণার্থী অধিকার বাস্তবায়নের নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শরণার্থীদের নিরাপত্তা অধিকার ফিরে পাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে নিরাপদ আবাসস্থল, জাতি পরিচয় এবং পাশাপাশি মৌলিক ও মানবাধিকার অধিকার ফিরে পাওয়া। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী, ২০০১ সাল থেকে প্রতিবছর বিশ্ব শরণার্থী দিবসটি পালিত হয় এক একটি প্রতিপাদ্য ধরে। বিশ্ব শরণার্থী দিবস ২০২৩-এর মূল প্রতিপাদ্য : "Hope away from Home. A world where refugees are always included". ঘর হতে সুদূরে আশা, এমন একটি বিশ্বের যেখানে শরণার্থীরা নিয়তই অন্তর্ভুক্ত।

মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিরূপ পরিস্থিতির কারণে কোনো স্থানের মানুষ যখন নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে বাধ্য হয়, তখন তাদের বলা হয় জলবায়ু শরণার্থী। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্থানীয় জনগোষ্ঠীরা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বের বহু অঞ্চল বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। এ সকল অঞ্চলের অনেক পরিবার ঘর ও বসবাসের জায়গা হারাচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের ধারণা অনুযায়ী, আগামী ২৫ বছরের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বে ২০ কোটিরও বেশি মানুষ নিজ বাড়ি ছেড়ে দেশের মধ্যেই অন্য স্থানে যেতে বাধ্য হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি বাস্তুচ্যুতি ঘটেছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি। বাংলাদেশে বেড়ে চলছে জলবায়ু শরণার্থীর সংখ্যা। বাংলাদেশের জলবায়ু শরণার্থীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দারা। বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু শরণার্থীদের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প তৈরি করছে। ২০২০ সালের জুলাই মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজারে জলবায়ু শরণার্থীদের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম পুনর্বাসন প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। বৃহৎ এ প্রকল্পে নির্মিত ২০টি পাঁচতলাবিশিষ্ট ভবনে ৬০০টি জলবায়ু শরণার্থী পরিবার নতুন ফ্ল্যাট পেল। প্রতিটি পাঁচতলা ভবনে থাকছে ৪৫৬ বর্গফুট আয়তনের ৩২টি করে ফ্ল্যাট। পর্যায়ক্রমে ৪ হাজার ৪০৯টি পরিবার এখানে ফ্ল্যাট পাবে।

ইউএনএইচসিআরের প্রধান ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি বলেন, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির নতুন রেকর্ডের জন্য সংঘাত, নিপীড়ন, বৈষম্য, সহিংসতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো কারণগুলো দায়ী। শরণার্থী ও অভিবাসী বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, বর্তমান সময়ে জলবায়ু শরণার্থী বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। কেননা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাব বেড়েই চলছে, তার সাথে জলবায়ু শরণার্থীর

সংখ্যাও। আমরা আশা করি, সংঘাত, নিপীড়ন, বৈষম্য, সহিংসতার মতো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত শরণার্থী বা জলবায়ু শরণার্থী যেন একটি স্থায়ী বিষয় না হয়। বিশ্বের শরণার্থীদের মৌলিক ও মানবাধিকার ফিরিয়ে দিতে রাষ্ট্রসমূহ আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে–এটাই এ বিশ্ব শরণার্থী দিবসের প্রত্যাশা আমাদের। আমরা প্রতিজ্ঞা করব, বিশ্বের সকল শরণার্থী যেন নিরাপত্তার অধিকার পায়। আমরা আরো মানবিক হবো, আর ভাবব, তারাও আমাদের পরিবারের কেউ। প্রতিটি শরণার্থী তাদের ঘরে ফিরে যাক। ১১ কোটির অধিক বাস্তুচ্যুত মানুষের মৌলিক-মানবিক ও নিরাপত্তা অধিকার রক্ষা এবং সুস্বাস্থ্য স্বাভাবিক জীবনযাপনের প্রত্যাশা করি বিশ্ব শরণার্থী দিবসের এই দিনে।

লেখক : সিনিয়র সহকারী সচিব, জনকূটনীতি অনুবিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা

ক্যাশলেস যুগে বাংলাদেশ

এম জসীম উদ্দিন

পাল্টে গেছে লেনদেনব্যবস্থা। ক্যাশলেস দুনিয়ায় জায়গা দখল করে নিচ্ছে বাংলাদেশ। এখন দেশের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ লেনদেনে করছে ক্যাশলেস মাধ্যমে। অ্যাপসভিত্তিক ক্যাশলেস লেনদেন কুইক রেসপন্স (কিউআর) কোড ব্যবহার করে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এ লেনদেন চলছে। এ ক্ষেত্রে সেবা দিচ্ছে মোবাইল ফিন্যানশিয়াল কোম্পানি ও ব্যাংক। ক্যাশলেস সোসাইটি নতুন কিছু নয়, বিনিময়ের অসংখ্য পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে মানবসমাজ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই এটি বিদ্যমান। আজকের প্রেক্ষাপটে ক্যাশলেস সোসাইটি বলতে আমরা বিশেষভাবে সেই সমাজগুলিকে উল্লেখ করি, যেখানে ব্যাংক নোট বা চেকের পরিবর্তে ডিজিটাল তথ্য (সাধারণত অর্থের ইলেকট্রনিক উপস্থাপনা) দিয়ে আর্থিক লেনদেন পরিচালিত হয়।

ক্যাশলেস এই লেনদেন আগের চেয়ে অনেক সহজ ও সাশ্রয়ী হওয়ায় দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে। নগদ অর্থ বহন ও পরিশোধ ঝুঁকিপূর্ণ, চেক পরিশোধ সময়সাপেক্ষ ও জটিল। এই পদ্ধতিতে সেই ঝামেলা নেই। নেই কোনো ভাংতি ও খুচরা টাকার ঝামেলাও। থাকছে না ছেঁড়া-ফাটা বা জাল নোটের আশঙ্কা। অন্যদিকে কার্ড ব্যবহারের জন্য ব্যাংক, ব্যাংকের বুথগুলোকে ডিজিটাল পেমেন্ট অবকাঠামো বিনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে বিপুল বিনিয়োগ করতে হয়।

প্রধানমন্ত্রীর আইসিটিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় ১৩ নভেম্বর ২০২২-এ রাজধানীর একটি হোটেলে ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেশন প্ল্যাটফর্ম (আইডিটিপি) 'বিনিময়'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, শতভাগ মানুষকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সেবার আওতায় নিয়ে আসার অংশ হিসেবে আগামী তিন-চার বছরের মধ্যে ক্যাশলেস সমাজ প্রতিষ্ঠা সরকারের লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে অনেকটা এগিয়েছে দেশ। বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি বছরের জানুয়ারিতে 'সর্বজনীন পরিশোধ সেবায় নিশ্চিত হবে স্মার্ট বাংলাদেশ' স্লোগানকে সামনে রেখে 'ক্যাশলেস বাংলাদেশ' শিরোনামে ক্যাশলেস ক্যাম্পেইন শুরু করে। দশটি ব্যাংক, তিনটি মোবাইল ফিন্যানশিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রদানকারী এবং তিনটি আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (পিএসপি) এই ক্যাম্পেইনে অংশ নেয়। ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য ছিল, ঢাকা শহরে আন্ত পরিচালনাযোগ্য কিউআর কোড পেমেন্ট সিস্টেম জনপ্রিয় করা এবং নিম্ন-আয়ের গোষ্ঠীর মালিকানাধীনসহ লক্ষাধিক ছোট ব্যবসাকে ডিজিটাল লেনদেনব্যবস্থার আওতায় আনা। এর অংশ হিসেবে তারা মতিঝিল

এলাকায় প্রাথমিকভাবে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং রাস্তার বিক্রেতাকে কিউআর কোড পেমেন্ট সিস্টেমের সাথে পরিচিত করেছে, যার মধ্যে চা স্টল, মুদি দোকান এবং হোটেল মালিকদের পাশাপাশি মুচি, ফল বিক্রেতা এবং হকার রয়েছে। মতিঝিলে ক্যাম্পেইন শুরু হলেও এর লক্ষ্য পুরো দেশকে ক্যাশলেস করা। এটি ধীরে ধীরে ঢাকা শহর এবং তারপর সারাদেশে সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। এই সেবা নিতে বা পেতে শুধুমাত্র একটা ব্যাংকের অ্যাপ থাকলেই চলবে। এই উদ্যোগে যুক্ত ব্যাংকগুলো হলো মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, এবি ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, দি সিটি ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, পূবালী ব্যাংক ও ওয়ান ব্যাংক। এ ছাড়া এমএফএস প্রতিষ্ঠান বিকাশ, এমক্যাশ, রকেট ও কার্ড সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান মাস্টারকার্ড, ভিসা ও অ্যামেক্স এ সেবায় যুক্ত হয়েছে। কিছু ব্যাংক এবং MFS প্রদানকারীরা অতীতে মালিকানাধীন কিউআর কোড সরবরাহ করেছিল কিন্তু কোনো সর্বজনীন কিউআর কোড ছিল না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখন বাংলা কিউআর চালু করেছে, যার মাধ্যমে যেকোনো ব্যাংকের গ্রাহকরা অর্থ প্রদানের সুযোগ পাবে। গত শতাব্দীর নব্বই দশকে বিশ্বে কিউআর কোডের প্রচলন শুরু হয়। বাংলাদেশে ২০১৯ সালের ১১ মার্চ বাংলা কিউআর স্ট্যান্ডার্ড ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাংলা কিউআর কোড দিয়ে নির্দিষ্ট যেকোনো ব্যাংকের অ্যাপ ব্যবহার করে কিউআর কোড স্ক্যানের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করা যায়। ফলে ব্যাংকের গ্রাহকদের বিভিন্ন নেটওয়ার্কের একাধিক কিউআর কোড ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

কিউআরের পূর্ণরূপ কুইক রেসপন্স। এটি একটি কন্ট্রাক্টলেস পেমেন্ট পদ্ধতি, যেখানে কিউআর কোডটি মোবাইল অ্যাপে স্ক্যান করে দ্রুত লেনদেন করা যায়। এর জন্য প্রথমে মোবাইলে ব্যাংক বা এমএফএস বা পিএসপির অ্যাপ ডাউনলোড করতে হয়। অ্যাপে পিন টাইপ করে লগ ইন করে যে দোকান বা মার্চেন্ট থেকে কিনতে হবে সেখানে আউটলেট প্রদর্শিত কিউআর কোড স্ক্যান করতে হয়। এরপর পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধ করার জন্য টাকার পরিমাণ লিখলে একটি ওটিপি (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড) আসে। সেই ওটিপি টাইপ করে লেনদেন সম্পন্ন করা যায়। লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার পর পেমেন্টের কনফারমেশন ও ডিজিটাল রিসিট পাওয়া যায়। এখন এক ব্যাংকের কিউআর কোড থাকলে যেকোনো ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে লেনদেন করার সুযোগ রয়েছে। এতদিন একটি ব্যাংকের কিউআর কোডে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের গ্রাহক পেমেন্ট করতে পারত। এটা খুবই সহজ পদ্ধতি। প্রতিবছর কেবল টাকা ছাপতেই সরকারের ৫০০ কোটি টাকার বেশি খরচ হয়। তা ছাড়া এই টাকার ব্যবস্থাপনা, সরবরাহ, লেনদেনের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা এবং তার ফলে যে সম্ভাবনার অপচয় হয় সেটির মূল্য অন্তত ৯ হাজার কোটি টাকা। এই পদ্ধতিতে ছাপা টাকা ব্যবহারের বদলে 'ক্যাশলেস' লেনদেন নিশ্চিত করতে পারলে প্রতিবছর অন্তত ১০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত চার বছরে কার্ডের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এই বছরের জানুয়ারিতে ৪ কোটি ৩৩ লাখ ৪৭ হাজার ১৫৫টি কার্ড ছিল, যা ২০১৯ সালের একই মাসে ছিল ২ কোটির সামান্য বেশি। ই-কমার্স ব্যবসা এবং বিদেশি ভ্রমণের বৃদ্ধির কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কার্ডের লেনদেন বেড়েছে, মহামারির মধ্যে এটি আরো গতি পেয়েছিল। ডেবিট, ক্রেডিট এবং প্রিপেইড কার্ডের সংখ্যার পাশাপাশি কার্ডের মাধ্যমে লেনদেনও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেড়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, ২০১৯ থেকে জানুয়ারি ২০২৩ এই সময়ের মধ্যে, ডেবিট কার্ডে ১৭৭ শতাংশ বেড়ে ৩৬,৭৬৫ কোটি টাকা, ক্রেডিট কার্ডে ১২৫ শতাংশ বেড়ে ২৫০৬ কোটি টাকা এবং প্রিপেইড কার্ডে ২০০ শতাংশ বেড়ে ৩৩০ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে।

ক্যাশলেস ব্যবস্থার অগ্রগতি হিসেবে দেশে ইতোমধ্যে ডিজিটাল ব্যাংক নীতিমালা অনুমোদন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ ব্যাংকের সব সেবাই হবে অ্যাপনির্ভর, মোবাইল ফোন বা ডিজিটাল যন্ত্রে। দিন-রাত ২৪ ঘণ্টাই সেবা মিলবে। এটি গঠনে প্রয়োজন হবে ১২৫ কোটি টাকা, পরিচালক হতে লাগবে কমপক্ষে ৫০ লাখ টাকা। গ্রাহকদের লেনদেনের সুবিধার্থে ডিজিটাল ব্যাংক ভার্চুয়াল কার্ড, কিউআর কোড ও অন্য কোনো উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক পণ্য দিতে পারবে। প্রধান কার্যালয় ছাড়া ডিজিটাল ব্যাংকের কোনো ফিজিক্যাল শাখা থাকবে না। লেনদেনের জন্য কোনো প্লাস্টিক কার্ড দিতে পারবে না। অবশ্য এই ব্যাংকের সেবা নিতে গ্রাহকরা অন্য ব্যাংকের এটিএম, এজেন্টসহ নানা সেবা ব্যবহার করতে পারবেন। ভার্চুয়াল কার্ড কিউআর কোড অন্যান্য প্রযুক্তিভিত্তিক পণ্য দিতে পারবে, রেমিট্যান্স সংগ্রহ করতে পারবে তবে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন বা বাণিজ্য অর্থায়নে যুক্ত হতে পারবে না।

ক্যাশলেসব্যবস্থা হলো নগদহীন বা শূন্য নগদ মাধ্যম যেখানে নগদ টাকার পরিবর্তে ইলেকট্রনিকভাবে লেনদেন সম্পন্ন করা হয়। ক্যাশলেস লেনদেন স্মার্ট বাংলাদেশের পথ প্রশস্ত করছে। আগামী দিনে বাংলাদেশের সব ফিন্যানশিয়াল ট্রানজেকশন ক্যাশলেস হয়ে যাবে, নগদ অর্থে লেনদেন হবে না। এর মাধ্যমে নগদ অর্থের ওপর নির্ভরতা কমে আসবে। উন্নতির ধারাবাহিকতায় এমন পরিবেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

লেখক : তথ্য অফিসার, পিআইডি

‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ হবে জ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র

পাশা মোস্তফা কামাল

তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে পাল্টে যাচ্ছে বিশ্বের চিত্র। দেরিতে হলেও আমরা প্রবেশ করেছি এই জগতে। ১৯৯১ সালে আমাদের বিনা পয়সায় সাইবার সংযোগ প্রদানের প্রস্তাব গ্রহণ করেনি তখনকার সরকার। যার কারণে আমরা অনেক দূর পিছিয়ে পড়েছি। ১৯৯১ থেকে ২০০৯ অনেক সময়। জননেত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিলে একটি বিশেষ মহল এটা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করতেও ছাড়েনি। কিন্তু দমে যাননি বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা। কারণ তাঁর ধমণীতে বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তব ও দৃশ্যমান। ডিজিটাল বাংলাদেশ যখন দৃশ্যমান তখন বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা এবার ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’। তো কেমন হবে সেই স্মার্ট বাংলাদেশ? একটু দেখার চেষ্টা করি।

বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রথম শিল্পবিপ্লবটি হয়েছিল ১৭৬৯ সালে। এরপর ১৮৭০ সালে বিদ্যুৎ ও ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেটের আবিষ্কার শিল্পবিপ্লবের গতিকে বাড়িয়ে দেয় কয়েক গুণ। আবার তিনটি বিপ্লবকে ছাড়িয়ে যেতে পারে ডিজিটাল বিপ্লব। এ নিয়েই এখন সারা দুনিয়ায় তোলপাড় চলছে। এটিকে এখন বলা হচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রযুক্তিনির্ভর গ্লোবাল ভিলেজের এই বিপ্লবে বাংলাদেশও অন্যতম সৈনিক। এই বিপ্লবে জয়ী হওয়ার জন্য এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির। আশার কথা হলো, আমাদের দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির আওতায় নিয়ে এসে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে হবে। এজন্য সবার আগে প্রয়োজন তরুণ সমাজকে প্রশিক্ষিত করা।

কম উপকরণ দিয়ে বেশি উৎপাদনই হলো জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির মূল কথা। বাংলাদেশে জমি কম কিন্তু লোকসংখ্যা বেশি। তাই কম জমিতে বেশি উৎপাদানের যে প্রযুক্তি তা রপ্ত করতে হলে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশ সেই পথে হাঁটছে। সরকারি কেনাকাটায় ২৫ ভাগ পর্যন্ত ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার হচ্ছে। বেসরকারি খাতেও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অনেক বেড়েছে। বাংলাদেশে যেসব প্রকল্প চালু আছে সেখানেও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের উন্নয়নমুখী অর্থনীতি, যা প্রতিবছর ৬ শতাংশ করে বেড়ে চলেছে, সেখানে সবার আগে উচ্চারিত হয় চিরচেনা পোশাক খাতের নাম। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদল ঘটছে ধারণার। ধীরে ধীরে ভবিষ্যৎ উন্নয়নে শ্রমভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর স্থলে ঠাঁই করে নিতে যাচ্ছে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি। আশা করা হচ্ছে

যে, ২০৩০ সালে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ৩০তম অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিশালী দেশ। ওই সময়ের মধ্যে মাথাপিছু আয় দাঁড়াবে ৬ হাজার মার্কিন ডলার এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে বাংলাদেশ।

পৃথিবীজুড়ে এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লব চলছে। সারা পৃথিবীর মতো আমরা এক প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের ভিত্তির ওপর শুরু হওয়া ডিজিটাল বিপ্লবের ফলে সবকিছুর পরিবর্তন হচ্ছে গাণিতিক হারে, যা আগে কখনো হয়নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিটি খাতে এ পরিবর্তন প্রভাব ফেলছে, যার ফলে পাল্টে যাচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা এমনকি রাষ্ট্র চালানোর প্রক্রিয়াও। আর এই বিপ্লবের জন্য এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির। দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি আয়ত্ত করাতে পারলে দ্রুত দেশ এগিয়ে যাবে।"

আধুনিক যুগ হচ্ছে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছাড়া কোনো দেশ তার আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারে না। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে প্রতিটি ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতির স্থলে ডিজিটাল টুলস ব্যবহারের বিকল্প নেই। দেশ থেকে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারি সকল কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ নামের আন্দোলন। এই আন্দোলনে নতুন যুক্ত হচ্ছে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি।"

বর্তমান সময়ে ই-লার্নিং খুবই আলোচিত একটি বিষয়। দেশে কিংবা বিদেশে সবখানেই এর জয়জয়কার। ধরাবাঁধা শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে হওয়ায় দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে শিক্ষা ব্যবস্থাটি। প্রতিদিনই উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে প্রযুক্তি। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। মূলত প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি ক্লাস করা কিংবা কোনো বিষয়ের ওপর জ্ঞানার্জন করার পদ্ধতিই ই-লার্নিং নামে পরিচিত। বর্তমান তরুণ প্রজন্মের কাছে ই-লার্নিংয়ের জনপ্রিয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পদ্ধতিতে ঘরে বসে সুবিধাজনক সময়ে পছন্দমতো বিষয়ে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তোলা সম্ভব। ই-লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই বাংলাদেশও। বর্তমানে আমাদের দেশেও রয়েছে একাধিক ই-লার্নিং কার্যক্রম।ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারবাহিকতায় এসেছে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির দর্শন। দেশের বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠী রয়েছে যাদের হাতে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের অর্থনীতি নির্ভর করছে। আশার কথা হচ্ছে, তরুণ জনগোষ্ঠী তথ্যপ্রযুক্তিকে লুফে নিয়েছে। তবে পুরো কাজটির জন্য সামনে বিশাল চ্যালেঞ্জও রয়েছে। জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির দেশ হিসেবে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

'স্মার্ট বাংলাদেশে' মাথাপিছু আয় হবে কমপক্ষে ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার। এছাড়া আরো কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যেমন : দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকবে ৩ শতাংশের কম মানুষ আর চরম দারিদ্র্য নেমে আসবে শূন্যের কোঠায়;

মূল্যস্ফীতি সীমিত থাকবে ৪-৫ শতাংশের মধ্যে; বাজেট ঘাটতি থাকবে জিডিপির ৫ শতাংশের নিচে; রাজস্ব- জিডিপি অনুপাত হবে ২০ শতাংশের ওপরে; বিনিয়োগ হবে জিডিপির ৪০ শতাংশ। শতভাগ ডিজিটাল অর্থনীতি আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক সাক্ষরতা অর্জিত হবে। সকলের দোড়গোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে যাবে। স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা, টেকসই নগরায়ণসহ নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সকল সেবা থাকবে হাতের নাগালে। তৈরি হবে পেপারলেস ও ক্যাশলেস সোসাইটি। সবচেয়ে বড় কথা, স্মার্ট বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা।

#

লেখক : পিআইডি ফিচার

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসের উদ্বোধনের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গাড়িবহর এলিভেটেড এক্সপ্রেস অতিক্রম করছে

পদ্মা রেলপথ উদ্বোধন

ট্রেনে চড়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ্মা পাড়ি

হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনালের উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

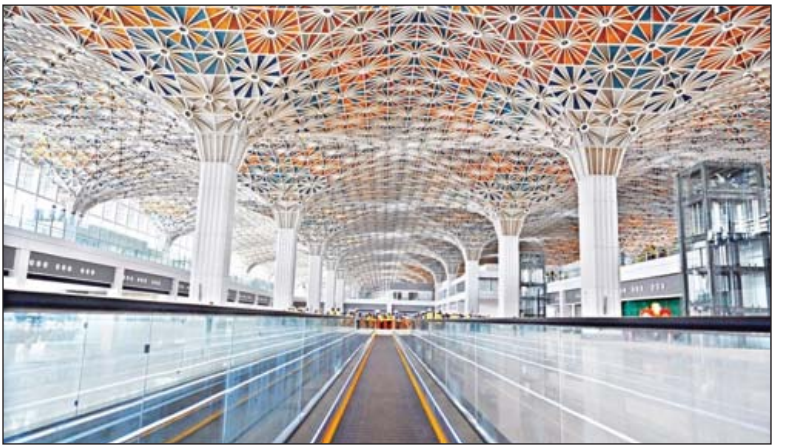

হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল

এক টুকরো আধুনিক বাংলাদেশ, গেড়াখোলা ব্রিজ, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ

চট্টগ্রামের সেলফি রোড, ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম

সাজেক ভ্যালির দৃষ্টিনন্দন সেন্ট্রাল মসজিদ

খুলনার রূপসা নদীর উপর নির্মিত দেশের দীর্ঘতম রেলসেতু

বাংলাবান্দা স্থলবন্দর তেতুলিয়া, পঞ্চগড়

রাজশাহী মহানগরীর দৃষ্টিনন্দন সড়ক

নির্মাণাধীন যমুনা রেলসেতু

পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে

পর্যটনের নতুন সম্ভাবনা 'স্বর্গের সিঁড়ি' খাগড়াছড়ি

উদ্বোধনের অপেক্ষায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল

নির্মাণাধীন ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক

ছুটে চলছে স্বপ্নের মেট্রোরেল

উদ্বোধনের অপেক্ষায় দৃষ্টিনন্দন কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন

দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো পণ্যবাহী জাহাজ নোঙর করছে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরে (২৫ এপ্রিল ২০২৩)